মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক

নীতি বিবৃতি

২০২৬-২৭ হতে ২০২৮-২৯

সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ | ১১ জুন ২০২৬)

নীতি বিবৃতি প্রস্তুতে যারা অবদান রেখেছেন

প্রধান উপদেষ্টা:	**ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার,** অর্থসচিব
সম্পাদক:	**হাসান খালেদ ফয়সাল,** অতিরিক্ত সচিব
প্রণয়নকারী কর্মকর্তাবৃন্দ:	**মুহাম্মদ মনজুরুল হক,** যুগ্মসচিব **ড. এ. কে. এম আতিকুল হক,** যুগ্মসচিব **আনারুল কবির,** যুগ্মসচিব **মোহাম্মদ সাদেকুর রহমান,** যুগ্মসচিব **মুহাম্মদ আনিসুর রহমান,** যুগ্মসচিব **ড. মোঃ রাশেদুর রহমান সরদার,** উপসচিব **মোঃ মশিউর রহমান তালুকদার,** উপসচিব **ড. জয়নাল আবদিন,** উপসচিব **শেখ মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন,** উপসচিব **ড. আসিফ ইকবাল,** উপসচিব **সৈয়দ মাহমুদ হাসান,** উপসচিব **মোঃ ফিরোজ হাসান,** উপসচিব **আশরাফুল আলম,** উপসচিব **আল-ইমরান রুহুল ইসলাম,** উপসচিব **তাসনুভা রহমান,** সিনিয়র সহকারী সচিব **মো: আব্দুল মান্নান,** সিনিয়র সহকারী সচিব **মোঃ ইয়াসির আরাফাত,** সিনিয়র সহকারী সচিব **সাবেরা তাবাসসুম ওয়াহিদ,** সিনিয়র সহকারী সচিব

যোগাযোগের ঠিকানা: যুগ্মসচিব, সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

টেলিফোন: (+৮৮০) -২-২২৩৩৫৬০১৯, ই-মেইল: monzorulh@finance.gov.bd

ওয়েবসাইট: www.mof.gov.bd

ISSN 978-984-35-2579-6

সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯ এর ১১ ধারার বিধান মতে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত

সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন উৎস হতে ১৫ মে ২০২৬ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এখানে ব্যবহৃত কিছু তথ্য সাময়িক, যা পরবর্তীতে পরিবর্তন হতে পারে।

মুখবন্ধ

দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি মন্থর ও নিম্নমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে। আর্থিক খাতে দীর্ঘস্থায়ী অব্যবস্থাপনা ও সুশাসনের অভাব, স্বজনপ্রীতি এবং কেবলমাত্র সরকারি ব্যয় নির্ভর প্রবৃদ্ধি নীতির ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা এই ক্রমাবনতির প্রধান কারণ। বেসরকারি বিনিয়োগ কিংবা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকে প্রাধান্য না দিয়ে এই মডেলটি মূলত বড় বড় মেগা প্রজেক্টের ঋণ আর সরকারি ব্যয়ের ওপর নির্ভর করে টিকে ছিল। পাশাপাশি, ধারাবাহিক নীতি-ব্যর্থতার কারণে রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা মারাত্মকভাবে পর্যুদস্ত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ একদিকে যেমন বহুল প্রচারিত অর্থনৈতিক অগ্রগতির সুফল জনগণকে দিতে ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি সাধারণ মানুষের পকেটের টাকা রাজনৈতিক সুবিধাভোগী আর মুষ্টিমেয় কিছু লুটেরা অলিগার্কদের হাতে কুক্ষিগত করার সুযোগ করে দিয়েছে।

কোভিড-১৯ মহামারি দিয়ে শুরু হওয়া ধারাবাহিক বাহ্যিক অভিঘাত (External Shocks) অর্থনীতির এই কাঠামোগত দুর্বলতাকে আরও প্রকট করে তোলে। অর্থনীতি পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ববাজারে জ্বালানি ও পণ্যের মূল্যে তীব্র ঊর্ধ্বগতি দেখা দেয়, যা সাধারণ মানুষ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান উভয়ের ওপরই অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে। এসব বাহ্যিক অভিঘাত এবং গত দেড় দশকের নীতিগত ব্যর্থতার ফলে অর্থনীতি ইতিমধ্যেই উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও মন্দার কবলে পড়েছিল; ঠিক তেমনই এক নাজুক সময়ে সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যে নতুন সংঘাতের সূত্রপাত ঘটে। উল্লেখ্য, মধ্যপ্রাচ্যের এই সর্বশেষ সংঘাতটি বিএনপি সরকার দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র দশ দিন পর শুরু হয়।

বর্তমান সরকার যে অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে তার বাস্তব চিত্র বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকে প্রতিফলিত হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৪.২ শতাংশে এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩.৪৯ শতাংশে নেমে আসে। ২০২৬ সালের এপ্রিলে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়ায় ৯.০৪ শতাংশ। পাশাপাশি, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়কালে রপ্তানি আয় ৩.৭৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। খেলাপি ঋণ (NPL) উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ শতাংশে পৌঁছানোর পাশাপাশি ব্যাপক মূলধন ঘাটতি তৈরি হওয়ায় ব্যাংকিং খাত আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে। সাম্প্রতিক এক জরিপের তথ্যমতে, চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অনুপাত বেড়ে ২৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এই সূচকগুলো দিয়ে অর্থনীতির বিদ্যমান সামগ্রিক চ্যালেঞ্জের পূর্ণ চিত্র না পাওয়া গেলেও, আমাদের সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সময়কার অর্থনীতির প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অর্থনীতি কাঠামোগতভাবে দুর্বল এবং ধারাবাহিক বাহ্যিক অভিঘাতে জর্জরিত হলেও, এই সরকার তার অবনতি রোধ করতে এবং বাংলাদেশকে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির পথে এগিয়ে নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমাদের এই কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বিনিয়োগ-নির্ভর প্রবৃদ্ধির মডেলের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা নীতি-কাঠামোগত সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদারকরণ এবং টেকসই সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালিত হবে। এই লক্ষ্য অর্জনে আমরা সাহসী ও জনকেন্দ্রিক সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করব— যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহে বিনিয়ন্ত্রণকরণকরণ, একটি ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ বিনির্মাণ এবং অর্থনীতির প্রতিটি স্তরে সুশাসন পুনরুদ্ধার।

এই প্রেক্ষাপটেই আমরা মহান জাতীয় সংসদে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি উপস্থাপন করছি।

এই বিবৃতি অর্থ বিভাগের সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ কর্তৃক হালনাগাদ তথ্য, ব্যাপক পর্যালোচনা এবং শক্তিশালী পূর্বাভাস পদ্ধতির (Forecasting Tools) উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমান সরকার যে কোনো পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখতে অঙ্গীকারবদ্ধ, উপস্থাপিত এই নীতি বিবৃতি সেই অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একটি সমৃদ্ধ, ঘাতসহনশীল এবং ন্যায়ভিত্তিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে আমাদের যে সম্মিলিত প্রয়াস, সেখানে এই বিবৃতি নীতিনির্ধারক, উন্নয়ন সহযোগী এবং সাধারণ নাগরিক—সবার জন্যই একটি কার্যকর দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে।

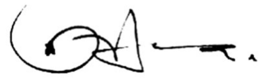

আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, এমপি
মন্ত্রী
অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

অধ্যায় ১ বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার মধ্যে অগ্রযাত্রা.. ১

১.১ ভূমিকা..১
১.২ বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির দৃশ্যকল্প.. ২
১.৩ বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতির দৃশ্যকল্প ৩
১.৪ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দৃশ্যকল্প ৫

১.৪.১ আন্তর্জাতিক রপ্তানির দৃশ্যকল্প.. ৫
১.৪.২ আন্তর্জাতিক আমদানির দৃশ্যকল্প... ৬

১.৫ বৈশ্বিক সুদহার পরিস্থিতি ৭
১.৬ মুদ্রা বিনিময় হার ৭
১.৭ আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য পরিস্থিতি ৮
১.৮ বৈশ্বিক ঝুঁকির নতুন মাত্রা ও নীতিগত করণীয় ১০
১.৯ উপসংহার...১০

অধ্যায় ২ বাংলাদেশের অর্থনীতি: মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প..১৩

২.১ দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য: ট্রিলিয়ন ডলারের জিডিপি.. ১৩
২.২ সরকারের নীতিগত অবস্থান ১৪
২.৩ মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প..১৬

২.৩.১ প্রকৃত খাত...১৬
২.৩.২ রাজস্ব খাত.. ২৬
২.৩.৩ মুদ্রা খাত.. ২৮
২.৩.৪ বহিঃখাত... ৩২

২.৪ মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্পের প্রধান অনুমানসমূহ.. ৩৭
২.৫ এমটিএমএফ: ২০২৬-২৭ থেকে ২০২৮-২৯ অর্থবছর... ৩৯
২.৬ নীতিগত অগ্রাধিকার ও সংস্কার কর্মসূচি...৪০

২.৬.১ বিনিয়ন্ত্রণকরণ (Deregulation):...৪০
২.৬.২ রাজস্ব ও আর্থিক খাতের কাঠামোগত সংস্কার...৪১
২.৬.৩ অর্থনৈতিক গণতন্ত্রায়ণ ও বিনিয়োগনির্ভর অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি...৪২

২.৭ উপসংহার ৪৩

অধ্যায় ৩ রাজস্ব আদায়ের দৃশ্যপট ও আহরণ কৌশল.. ৪৭

৩.১ ভূমিকা ৪৭

৩.২ সার্বিক রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি..৪৮
৩.৩ রাজস্ব আহরণের উৎসভিত্তিক চিত্র..৪৯

৩.৩.১ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর রাজস্ব আহরণ..৫০
৩.৩.২ কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণ.. ৫২
৩.৩.৩ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের চিত্র.. ৫৩

৩.৪ রাজস্ব আদায়ের গতিধারা এবং কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় ৫৫

৩.৪.১ রাজস্ব বয়েন্সি (Revenue Buoyancy) ৫৫
৩.৪.২ রাজস্ব-জিডিপির তুলনামূলক বিশ্লেষণ.. ৫৫
৩.৪.৩ কর পরিপালন (Compliance) পরিস্থিতি.. ৫৬

৩.৫ মধ্যমেয়াদে রাজস্ব আহরণের চিত্র ৫৭
৩.৬ রাজস্ব আহরণ কৌশল ও সংস্কার উদ্যোগ..৫৮
৩.৭ কর ব্যয়ের বর্তমান চিত্র.. ৫৯
৩.৮ বাংলাদেশের রাজস্ব সংস্কার এজেন্ডা ৫৯

৩.৮.১ অর্থনীতি পুনঃকৌশল নির্ধারণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স... ৬০
৩.৮.২ দশ-বছর মেয়াদী কৌশলগত কাঠামো: মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি রাজস্ব কৌশল............................ ৬০
৩.৮.৩ অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (SDRMP) ৬০
৩.৮.৪ কর ব্যয় নীতিমালা ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো...৬১

৩.৯ রাজস্ব আহরণ শক্তিশালীকরণ উদ্যোগ..৬১

৩.৯.১ কর রাজস্ব সংস্কার উদ্যোগসমূহ..৬১
৩.৯.২ কর-বহির্ভূত রাজস্ব সংস্কার উদ্যোগসমূহ.. ৬৪

৩.১০ উপসংহার..৬৬

অধ্যায় ৪ সরকারি ব্যয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা..৬৯

৪.১ ভূমিকা... ৬৯
৪.২ সরকারি ব্যয় সংক্রান্ত নীতি-কাঠামো.. ৬৯
৪.৩ সরকারি ব্যয়ের গতিধারা ও প্রক্ষেপণ ৭১

৪.৩.১ মোট সরকারি ব্যয়.. ৭১
৪.৩.২ পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয়ের গতি-প্রকৃতি.. ৭২
৪.৩.৩ সরকারি ব্যয়ের প্রধান খাতসমূহ... ৭৩

৪.৪ পরিচালন ব্যয়ের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প...৭৪

৪.৪.১ বেতন ও ভাতাদি... ৭৫

৪.৪.২ পণ্য ও সেবা ৭৫
৪.৪.৩ সামাজিক সুরক্ষা, ভর্তুকি ও হস্তান্তর ৭৬

৪.৫ উন্নয়ন ব্যয়ের সাম্প্রতিক গতিধারা ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প ৭৮

৪.৫.১ সরকারি মূলধন ব্যয় ও বিনিয়োগের দৃশ্যকল্প ৭৯
৪.৫.২ এডিপি বরাদ্দ, বাস্তবায়ন ও খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার ৭৯
৪.৫.৩ এডিপি বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ৮১
৪.৫.৪ প্রকল্প বাস্তবায়ন উন্নত করার সংস্কার উদ্যোগ ৮২

৪.৬ সরকারি ব্যয় নীতির মূল্যায়ন ৮২

৪.৬.১ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সরকারি ব্যয়ের চিত্র ৮২
৪.৬.২ বাজেট সম্প্রসারণ ও বরাদ্দের গতিধারা ৮৩
৪.৬.৩ বাজেট বাস্তবায়ন ও বরাদ্দ-ব্যয়ের ব্যবধান ৮৪
৪.৬.৪ বাজেট পরিস্থিতি ও Fiscal Stance ৮৪
৪.৬.৫ Fiscal Impulse ও মধ্যমেয়াদি গতিধারা ৮৫

৪.৭ ঘাটতি অর্থায়ন ও ঋণ ব্যবস্থাপনা ৮৬

৪.৭.১ ঘাটতি অর্থায়ন ৮৬
৪.৭.২ অর্থায়ন ব্যয় ৮৭
৪.৭.৩ অর্থায়ন কৌশল ৮৮
৪.৭.৪ ঋণ প্রোফাইল ৮৯
৪.৭.৫ ঋণ স্থিতির মধ্যমেয়াদী প্রক্ষেপণ ৯০
৪.৭.৬ বৈদেশিক ঋণের পরিশোধসূচি ৯১
৪.৭.৭ বৈদেশিক ঋণের মুদ্রাভিত্তিক চিত্র ৯১
৪.৭.৮ প্রচ্ছন্ন দায় ৯২
৪.৭.৯ ঋণ ধারণ সক্ষমতা যাচাই ৯৩

৪.৮ উপসংহার ৯৩

অধ্যায় ৫ আর্থিক ঝুঁকি বিবৃতি ৯৭

৫.১ ভূমিকা ৯৭
৫.২ মূল প্রক্ষেপণ (Baseline Projection) ৯৮

৫.২.১ মূল সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রক্ষেপণ ৯৮

৫.৩ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ঝুঁকি মূল্যায়ন ১০০

৫.৩.১ তেলের মূল্য বৃদ্ধিজনিত অভিঘাত ১০০
৫.৩.২ মূল্যস্ফীতির আকস্মিক অভিঘাত ঝুঁকি ১০৪

৫.৩.৩ রাজস্ব ঘাটতিজনিত ঝুঁকি ১০৭

৫.৪ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ১১১

৫.৪.১ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ১১১
৫.৪.২ উদ্দেশ্য ১১১
৫.৪.৩ এসওই সমূহের ঋণ ও প্রচ্ছন্ন দায় ১১১
৫.৪.৪ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর (এসওই) ঝুঁকি বিশ্লেষণ ১১২
৫.৪.৫ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার আর্থিক ঝুঁকির শ্রেণিবিন্যাস ১১৩
৫.৪.৬ সামষ্টিক অর্থনীতির ঝুঁকি থেকে উদ্ভুত ঝুঁকি ১১৪
৫.৪.৭ সার্বভৌম গ্যারান্টি ১১৪
৫.৪.৮ প্রশমন কৌশল ১১৪

৫.৫ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সামষ্টিক-আর্থিক ঝুঁকি ১১৪

৫.৫.১ প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিস্থিতি ১১৫
৫.৫.২ প্রাকৃতিক দুর্যোগ অভিঘাতের আলোকে সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রক্ষেপণ ১১৬
৫.৫.৩ প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলকসমূহের ওপর প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব ১১৬

৫.৬ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ঝুঁকি ১১৯
৫.৭ নীতিগত সুপারিশমালা ১১৯
৫.৮ সীমাবদ্ধতাসমূহ ১২০
৫.৯ উপসংহার ১২১
তথ্যসূত্র ১২২

সারণির তালিকা

সারণি ২.১ সরকারের নীতিগত অবস্থান ১৫
সারণি ২.২ এমটিএমএফ প্রক্ষেপণ ২০২৫-২৬ থেকে ২০২৮-২৯ অর্থবছর ৩৯
সারণি ৩.১ রাজস্ব আহরণ ২০২০-২১ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর (বিলিয়ন টাকা) ৪৮
সারণি ৩.২ রাজস্বের প্রধান উৎসসমূহ (বিলিয়ন টাকা) ৫০
সারণি ৩.৩ এনবিআর কর রাজস্বের উৎসসমূহ (বিলিয়ন টাকা) ৫১
সারণি ৩.৪ কর-বহির্ভূত রাজস্বের উৎসসমূহ (বিলিয়ন টাকা) ৫৩
সারণি ৩.৫ রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি ২০২৫-২৬ অর্থবছর (বিলিয়ন টাকা) ৫৪
সারণি ৩.৬ রাজস্ব আহরণের মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ (বিলিয়ন টাকা) ৫৮
সারণি ৪.১ সরকারি ব্যয় (বিলিয়ন টাকা) ৭২
সারণি ৪.২ সরকারি ব্যয়ের বরাদ্দ বিভাজন (জিডিপি'র শতাংশে) ৭৪
সারণি ৪.৩ নগদ ঋণ (বিলিয়ন টাকা) ৭৭
সারণি ৪.৪ ভর্তুকি (বিলিয়ন টাকা) ৭৭
সারণি ৪.৫ নগদ প্রণোদনা (বিলিয়ন টাকা) ৭৮
সারণি ৪.৬ মূলধন ব্যয়ের গতিধারা ও দৃশ্যকল্প (জিডিপি'র শতাংশে) ৭৯
সারণি ৪.৭ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন (বিলিয়ন টাকায়) ৮০
সারণি ৪.৮ রাজস্ব নীতির ধারা ও ফিসক্যাল ইমপাল্স সূচক ৮৫
সারণি ৪.৯ ঘাটতি অর্থায়ন ২০২৪-২৫ হতে ২০২৮-২৯ অর্থবছর (বিলিয়ন টাকা) ৮৭
সারণি ৪.১০ সুদ পরিশোধ ২০২৪-২৫ হতে ২০২৮-২৯ অর্থবছর (বিলিয়ন টাকা) ৮৮
সারণি ৪.১১ ঋণ স্থিতি ২০২৪-২৫ হতে ২০২৮-২৯ অর্থবছর (বিলিয়ন টাকা) ৯০
সারণি ৫.১ মূল সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রক্ষেপণ ৯৯
সারণি ৫.২ স্বতন্ত্র গ্রেডিং সীমামান ১১৩
সারণি ৫.৩ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার আর্থিক ঝুঁকির শ্রেণিবিন্যাস ১১৩
সারণি ৫.৪ প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিস্থিতি ১১৫
সারণি ৫.৫ অভিঘাত প্রভাবের চিত্রকল্প ১১৬

চিত্রের তালিকা

চিত্র ১.১ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%) ২
চিত্র ১.২ বিভিন্ন দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)...... ৩
চিত্র ১.৩ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মূল্যস্ফীতি (%)......৪
চিত্র ১.৪ বিভিন্ন দেশের মূল্যস্ফীতি (%)......৪
চিত্র ১.৫ বিশ্ব এবং বিভিন্ন দেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি (%-পরিমাণগত)...... ৬
চিত্র ১.৬ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল এবং দেশের আমদানি প্রবৃদ্ধি (%-পরিমাণগত)...... ৬
চিত্র ১.৭ বিগত কয়েক বছরের SOFR......৭
চিত্র ১.৮ মার্কিন ডলারের বিপরীতে কতিপয় মুদ্রার বিনিময় হার...... ৮
চিত্র ১.৯ আন্তর্জাতিক বাজারে বিভিন্ন পণ্যের মূল্য......৯
চিত্র ২.১ বিভিন্ন ত্রৈমাসিকে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (%) ১৭
চিত্র ২.২ খাতভিত্তিক ত্রৈমাসিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ১৭
চিত্র ২.৩ প্রকৃত বনাম সম্ভাব্য উৎপাদন (%)......১৮
চিত্র ২.৪ এক নজরে উৎপাদন ব্যবধানের গতিপথ: ২০১৭-১৮ থেকে ২০২৮-২৯ অর্থবছর (শতাংশ পয়েন্ট)......১৯
চিত্র ২.৫ সরবরাহ খাতের প্রবৃদ্ধির গতিপ্রকৃতি ১৯
চিত্র ২.৬ প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে সরবরাহ খাতসমূহের অবদান......২০
চিত্র ২.৭ চাহিদাভিত্তিক খাতসমূহ ও প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির গতিবিধি ২১
চিত্র ২.৮ সাম্প্রতিক মূল্যস্ফীতির গতিবিধি......২২
চিত্র ২.৯ বাৎসরিক গড় মূল্যস্ফীতির গতিবিধি......২২
চিত্র ২.১০ জিডিপিতে বিনিয়োগের অবদানের গতিবিধি......২২
চিত্র ২.১১ জিডিপিতে সঞ্চয়ের অবদানের গতিবিধি (%) ২৩
চিত্র ২.১২ সঞ্চয়-বিনিয়োগ ব্যবধান......২৪
চিত্র ২.১৩ কর্মসংস্থানে খাতভিত্তিক অংশ বনাম জিডিপিতে খাতভিত্তিক অংশ (%) ২৪
চিত্র ২.১৪ লিঙ্গ ও অবস্থানভেদে কর্মসংস্থানের গতিধারা (পরিসংখ্যান শতাংশে)......২৪
চিত্র ২.১৫ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাস ২৬
চিত্র ২.১৬ জিডিপিতে রাজস্ব আয়ের অবদানের গতিবিধি (%)...... ২৬
চিত্র ২.১৭ জিডিপিতে সরকারি ব্যয়ের গতিবিধি ২৭
চিত্র ২.১৮ বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়নের গতিবিধি (%)...... ২৮
চিত্র ২.১৯ বিভিন্ন সুদহার (%) ২৯
চিত্র ২.২০ মুদ্রা খাতের গতি-প্রকৃতি (% পরিবর্তন) ৩০
চিত্র ২.২১ ব্যাপক মুদ্রা, বেসরকারি খাতের ঋণ ও নমিনাল জিডিপির প্রবৃদ্ধির গতিবিধি......৩১
চিত্র ২.২২ মুদ্রা সূচক ও পুঁজিবাজার উন্নয়নের ঐতিহাসিক গতিবিধি...... ৩২
চিত্র ২.২৩ রপ্তানি ও আমদানির গতিবিধি......৩৩
চিত্র ২.২৪ লেনদেন ভারসাম্যের চলতি হিসাবের উপাদানসমূহ......৩৪

চিত্র ২.২৫ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩৫
চিত্র ২.২৬ বিনিময় হারের গতিবিধি ৩৫
চিত্র ২.২৭ REER ও NEER হারের পার্থক্য ৩৬
চিত্র ২.২৮ প্রবাস আয় ও প্রবাসীর সংখ্যা ৩৬
চিত্র ৩.১ রাজস্ব আহরণ (জিডিপি'র %) ৪৯
চিত্র ৩.২ উৎসভিত্তিক রাজস্বের বিন্যাস (মোট রাজস্বের শতাংশ) ৫০
চিত্র ৩.৩ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এনবিআর রাজস্বের উৎসসমূহ (এনবিআর রাজস্বের শতাংশ) ৫০
চিত্র ৩.৪ এনবিআর কর রাজস্বের উৎসসমূহ (এনবিআর কর রাজস্বের শতাংশ) ৫১
চিত্র ৩.৫ এনবিআর কর রাজস্বের প্রবৃদ্ধি (%) ৫২
চিত্র ৩.৬ জুলাই-মার্চ সময়কালে এনবিআর রাজস্ব প্রবৃদ্ধি (%) ৫৪
চিত্র ৩.৭ রাজস্ব বয়েন্সি (Revenue Buoyancy) ৫৫
চিত্র ৩.৮ মোট রাজস্ব (General Government Revenue) (জিডিপির %) ৫৬
চিত্র ৩.৯ টিআইএন ও রিটার্ন দাখিলকারীর সংখ্যা (মিলিয়নে) ৫৭
চিত্র ৩.১০ কর ব্যয় (Tax-Expenditure) (জিডিপির %) ৫৯
চিত্র ৪.১ পটেনশিয়াল জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও প্রকৃত/প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধির তুলনা ৭১
চিত্র ৪.২ মোট সরকারি ব্যয় (জিডিপি'র শতাংশে) ৭১
চিত্র ৪.৩ পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয়ের ধারা ও প্রক্ষেপণ ৭৩
চিত্র ৪.৪ ২০২৫-২৬ এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরে খাতভিত্তিক বরাদ্দ সূত্র: অর্থ বিভাগ ৭৪
চিত্র ৪.৫ পরিচালন ব্যয় (জিডিপির শতাংশ হিসেবে) ৭৫
চিত্র ৪.৬ বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের ধরন (মোট ব্যয়ের শতাংশ হিসেবে) ৭৬
চিত্র ৪.৭ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন ৮০
চিত্র ৪.৮ মোট সরকারি ব্যয় ৮২
চিত্র ৪.৯ বাজেট বরাদ্দের বছরভিত্তিক প্রবৃদ্ধি (%) ৮৩
চিত্র ৪.১০ খাতভিত্তিক বরাদ্দের বছরভিত্তিক প্রবৃদ্ধি (%) ৮৩
চিত্র ৪.১১ বরাদ্দের তুলনায় বাস্তবায়ন বিচ্যুতি ৮৪
চিত্র ৪.১২ চক্র-সমন্বিত প্রাথমিক ভারসাম্য ৮৫
চিত্র ৪.১৩ সরকারের ফিসক্যাল ইমপাল্স ৮৬
চিত্র ৪.১৪ উন্নয়ন ব্যয় ও মূলধন গঠনের দৃশ্যকল্প ৮৬
চিত্র ৪.১৫ ঋণ জিডিপির অনুপাত ৯০
চিত্র ৪.১৬ বৈদেশিক ঋণের পরিশোধ সূচি ৯১
চিত্র ৪.১৭ বৈদেশিক মুদ্রার মিশ্রণ ৯২
চিত্র ৫.১ জ্বালানি মূল্য বৃদ্ধি (এলএনজি) ১০১
চিত্র ৫.২ জ্বালানি তেলের মূল্য বৃধি (ডিজেল) ১০১
চিত্র ৫.৩ মূল্যস্ফীতির উপর সম্ভাব্য প্রভাব ১০২
চিত্র ৫.৪ উৎপাদনের উপর সম্ভাব্য প্রভাব ১০৩

চিত্র ৫.৫ লেনদেন ভারসাম্যের (BoP) ওপর প্রভাব....................১০৩
চিত্র ৫.৬ জিডিপি প্রবৃদ্ধির উপর প্রভাব....................১০৪
চিত্র ৫.৭ ব্যক্তিগত ভোগের উপর সম্ভাব্য প্রভাব....................১০৬
চিত্র ৫.৮ আর্থিক ভারসাম্য ও ঋণের উপর প্রভাব....................১০৬
চিত্র ৫.৯ জিডিপি প্রবৃদ্ধির ওপর প্রভাব....................১০৭
চিত্র ৫.১০ সরকারি ব্যয়ের উপর সম্ভাব্য প্রভাব....................১০৮
চিত্র ৫.১১ আর্থিক ভারসাম্যের উপর প্রভাব....................১০৯
চিত্র ৫.১২ সরকারি ঋণ-জিডিপি অনুপাতের উপর প্রভাব....................১০৯
চিত্র ৫.১৩ বেসরকারি বিনিয়োগের উপর প্রভাব....................১১০
চিত্র ৫.১৪ প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির উপর সম্ভাব্য প্রভাব....................১১০
চিত্র ৫.১৫ জিডিপি প্রবৃদ্ধির উপর প্রভাব....................১১৭
চিত্র ৫.১৬ সরকারি ব্যয়ের উপর প্রভাব....................১১৭
চিত্র ৫.১৭ মূল্যস্ফীতির উপর প্রভাব....................১১৮
চিত্র ৫.১৮ ঋণ জিডিপি অনুপাতের উপর প্রভাব....................১১৮

২০২৬-২৭ হতে ২০২৮-২৯ অর্থবছর মেয়াদের মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি এমন এক সন্ধিক্ষণে প্রণীত হয়েছে, যখন বাংলাদেশ সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সুসংহতকরণের পর্যায় থেকে দ্রুততর, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বিনিয়োগনির্ভর প্রবৃদ্ধির নতুন পর্যায়ে উত্তরণের পথে অগ্রসর হচ্ছে। তবে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিবেশ এখনো অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত জ্বালানি ও পণ্যবাজারে অনিশ্চয়তা আরও বাড়িয়েছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও নৌপরিবহন রুটে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে এবং মূল্যস্ফীতির চাপ, বহিঃখাতের ভারসাম্যহীনতা ও ভর্তুকি ব্যয় বৃদ্ধির ঝুঁকি তীব্রতর করেছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এসব অভিঘাত জ্বালানি তেল, এলএনজি ও সারের আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি, অতিরিক্ত ভর্তুকির চাপ, বিনিময় হারের অস্থিরতা এবং রপ্তানি ও প্রবাস আয়প্রবাহে অনিশ্চয়তার মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

এ বছরের মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতিতে সরকারের উন্নয়ন অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতির একটি কৌশলগত পুনর্বিন্যাস তুলে ধরা হয়েছে। এ নীতিকাঠামোতে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রায়ণ, বিনিয়ন্ত্রণকরণ ও বিধিবিধান সহজীকরণ,, বেসরকারি খাতনির্ভর বিনিয়োগ, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ, অবকাঠামো উন্নয়ন, মানবসম্পদ গঠন, খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা, জলবায়ু সহনশীলতা, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য হ্রাস এবং সুষম আঞ্চলিক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এর বৃহত্তর লক্ষ্য হলো জটিল ও অনমনীয় নিয়ন্ত্রক কাঠামো এবং ক্রমবর্ধমান ঋণ-অর্থায়িত ব্যয়ের ওপর নির্ভরশীল প্রবৃদ্ধির কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে অধিক উৎপাদনশীল, প্রতিযোগিতাসক্ষম ও সহনশীল অর্থনৈতিক কাঠামোর দিকে এগিয়ে নেওয়া, যাতে ২০৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ট্রিলিয়ন-ডলার অর্থনীতিতে উন্নীত করার একটি সুদৃঢ় ভিত্তি তৈরি হয়।

মধ্যমেয়াদে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সুসংহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃদ্ধির গতি ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধার ও বেগবান হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। উৎপাদনশীল সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বেসরকারি খাতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি সঞ্চার, রপ্তানিমুখী বহিঃচাহিদার উন্নতি, মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতির ক্রমান্বয়ে স্বাভাবিকীকরণ এবং ব্যবসা পরিবেশে স্থিতিশীলতা ও নীতিগত ধারাবাহিকতা এ প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে। মধ্যমেয়াদে মূল্যস্ফীতির চাপ ধীরে ধীরে কমে আসবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। তবে এ ধারা বজায় রাখা নির্ভর করবে বৈশ্বিক পণ্যমূল্য ও বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা, নীতি সুদহারের পরিবর্তন বাজার সুদহার ও ঋণপ্রবাহে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হওয়া, অভ্যন্তরীণ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারে কৃত্রিম সংকট, মজুতদারি, বাজার কারসাজি ও অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর।

রাজস্বনীতি (Fiscal Policy) প্রবৃদ্ধি-সহায়ক কিন্তু বাস্তবসম্মত হবে। এ লক্ষ্যে সরকার অবকাঠামো, পরিবহন ও যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, কৃষি, সামাজিক সুরক্ষা এবং জলবায়ু-সহনশীল উন্নয়নে ব্যয়কে অগ্রাধিকার দেবে; পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় ও কম অগ্রাধিকারভুক্ত পরিচালন ব্যয় সীমিত রাখবে। উন্নয়ন ব্যয় ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সম্প্রসারণকে ফলপ্রসূ করতে প্রকল্প যাচাই-বাছাই, ক্রয় প্রক্রিয়ার শৃঙ্খলা, অর্থ ছাড় ও ব্যয় পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং সময়মতো প্রকল্প সমাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে, যাতে সরকারি বিনিয়োগ উৎপাদনশীলতা, কর্মসংস্থান, সেবা প্রদান ও সুষম আঞ্চলিক উন্নয়নে দৃশ্যমান সুফল আনে।

রাজস্ব আহরণ টেকসই সরকারি অর্থব্যবস্থাপনার প্রধান ভিত্তি। উন্নয়ন চাহিদার তুলনায় বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাত এখনো কম; ফলে অবকাঠামো, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে সরকারের অর্থায়নের সুযোগ সীমিত। এ প্রেক্ষাপটে রাজস্ব সংস্কারকে মধ্যমেয়াদি কৌশলের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি অগ্রাধিকারভিত্তিক ব্যয় ব্যবস্থাপনা, সরকারি বিনিয়োগের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং আর্থিক সুশাসন জোরদারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ উদ্যোগের লক্ষ্য শুধু কর বৃদ্ধি নয়; বরং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে আনুষ্ঠানিক খাতে নিয়ে এসে করভিত্তি বিস্তৃত করা এবং বিনিয়োগ, উৎপাদন, কর্মসংস্থান, ভোগ ও রাজস্ব আহরণের পারস্পরিক সহায়ক চক্রকে আরও শক্তিশালী করা।

বহিঃখাতের মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প ইতিবাচক ধারায় অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা দেখালেও উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি রয়ে গেছে। রপ্তানি আয়ের পুনরুদ্ধার, প্রবাস আয়প্রবাহের স্থিতিশীলতা, বাজারভিত্তিক বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পুনর্গঠন, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণ বহিঃখাতের সহনশীলতা (Resilience) জোরদারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তবে বিনিয়োগনির্ভর প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূলধনি যন্ত্রপাতি, জ্বালানি ও উৎপাদন উপকরণের আমদানি চাহিদা বাড়বে; ফলে লেনদেনের ভারসাম্য এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনায় সতর্কতা ও সুসমন্বিত পদক্ষেপ প্রয়োজন হবে।

আর্থিক ঝুঁকি বিবৃতিতে (Fiscal Risk Statement) মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত এবং সম্ভাব্য জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধিকে বাংলাদেশের জন্য তাৎক্ষণিক বহিঃখাতজনিত ঝুঁকির অন্যতম উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি, দীর্ঘস্থায়ী মূল্যস্ফীতি, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার দায়, ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতা, সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দায় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগকেও গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এসব ঝুঁকি মোকাবিলায় নিয়মিত পরিবীক্ষণ, অপ্রত্যাশিত ব্যয় ও রাজস্ব ঘাটতি সামাল দেওয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি, লক্ষ্যভিত্তিক ভর্তুকি প্রদান, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের

পরিচালন ও জবাবদিহি জোরদার, জলবায়ু-সহনশীল বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং রাজস্ব, মুদ্রা ও বহিঃখাত নীতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় অপরিহার্য।

সার্বিকভাবে, ২০২৬-২৭ হতে ২০২৮-২৯ অর্থবছর মেয়াদের মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি বর্তমান বৈশ্বিক অনিশ্চয়তাপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট মোকাবিলায় সংস্কার, অভিঘাত মোকাবিলার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদনশীলতানির্ভর অর্থনৈতিক রূপান্তরকে ভিত্তি করে একটি সুচিন্তিত ও ভারসাম্যপূর্ণ কৌশল উপস্থাপন করেছে। এ কৌশলের সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করবে সুশৃঙ্খল সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, বাস্তবসম্মত রাজস্ব সংস্কার, সরকারি বিনিয়োগের দক্ষ বাস্তবায়ন, আর্থিক খাতে সুশাসন জোরদারকরণ, কার্যকর বিনিয়ন্ত্রণকরণ এবং ফ্যামিলি কার্ড ও কৃষক কার্ডের মতো ব্যবস্থার মাধ্যমে কার্যকর ও লক্ষ্যভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার ওপর।

১

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি

২০২৬-২৭ হতে ২০২৮-২৯

বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার মধ্যে অগ্রযাত্রা

অধ্যায় ১

বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার মধ্যে অগ্রযাত্রা

সংক্ষিপ্তসার

- *ভূরাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে জ্বালানি মূল্যের উর্ধ্বগতি এবং বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার প্রভাবে ২০২৬ সালে বিশ্ব অর্থনীতির গতি কিছুটা শ্লথ হতে পারে।*
- *জ্বালানি পণ্যের উচ্চমূল্য ও সরবরাহ ব্যবস্থার বিঘ্নের কারণে পরিবহন, উৎপাদন ও ভোক্তা পর্যায়ে মূল্যচাপ বাড়লে স্বল্পমেয়াদে মূল্যস্ফীতি কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে।*
- *বিশ্ব বাণিজ্যে পুনরুদ্ধারের ইতিবাচক প্রবণতা লক্ষ করা গেলেও সরবরাহ ব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন ও কঠোর বাণিজ্য নীতির প্রভাবে অঞ্চল ও খাতভেদে এ পুনরুদ্ধারের গতি এখনও সমান নয়।*
- *বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমদানি নির্ভর মূল্যস্ফীতির চাপ কমে আসলে বহিঃখাত পরিস্থিতি কিছুটা অনুকূলে আসতে পারে। তবে এর সুফল অনেকাংশে নির্ভর করবে বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা, অভ্যন্তরীণ বাজার নিয়ন্ত্রণ পরিস্থিতি এবং কার্যকর সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার উপর।*

১.১ ভূমিকা

২০২৬ সালের শুরুর দিকে মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে সংঘাত শুরু হওয়ার প্রেক্ষিতে জ্বালানি পণ্যের বাজার ও বৈশ্বিক অর্থায়ন পরিস্থিতির ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি হয়, ফলে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আরও অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। বিগত বছরে তুলনামূলক সহজ আর্থিক পরিস্থিতি, ডলারের দাম কিছুটা কমে আসা এবং সহায়ক সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতির কারণে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি কিছুটা ইতিবাচক ধারায় ফিরে এসেছিল। সাম্প্রতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি শ্লথ হওয়া এবং মূল্যস্ফীতির চাপ পুনরায় বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে যা বিশ্ব অর্থনীতির সামগ্রিক পরিস্থিতিকে আরও অনিশ্চিত করে তুলেছে। ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা, বাণিজ্যিক অস্থিরতা, সরবরাহ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং নীতিগত অনিশ্চয়তার সম্মিলিত প্রভাবে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে।

কোভিড-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি ইতিবাচকভাবে পুনরুদ্ধার হলেও সামষ্টিক অর্থনীতির বেশ কিছু বড় চ্যালেঞ্জ এখনো রয়ে গেছে। বিশেষ করে ২০২২–২৩ অর্থবছর থেকে মূল্যস্ফীতি উর্ধ্বমুখী রয়েছে। এ সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশে মূল্যস্ফীতির চাপ কিছুটা কমে এলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ পরিস্থিতি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছায়নি। সাম্প্রতিক ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা, বিশেষত জ্বালানি ও আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির কারণে উৎপাদন ব্যয় ও মূল্যচাপ পুনরায় বৃদ্ধি পেতে পারে। একইসঙ্গে অভ্যন্তরীণ সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং বাজার ব্যবস্থাপনার কাঠামোগত সমস্যার কারণে মূল্যস্তর দীর্ঘসময় উর্ধ্বমুখী থাকতে পারে। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় মূল্যস্ফীতি সাময়িকভাবে কমে আসলেও নীতিনির্ধারকদের সতর্ক অবস্থান বজায় রাখতে হবে।

১.২ বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির দৃশ্যকল্প

ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা ও কঠোর আর্থিক পরিস্থিতি অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও ২০২৫ সালে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোই এ প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। তবে ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা, পণ্যমূল্যের অস্থিরতা ও বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিস্থিতির অনিশ্চয়তার কারণে সামনের দিনগুলোতে বিশ্ব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতি কিছুটা শ্লথ হতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ২০২৬ সালে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি কমে ৩.১ শতাংশে নেমে আসতে পারে এবং পরবর্তী বছরগুলোতে তা প্রায় একই পর্যায়ে স্থিতিশীল থাকতে পারে (আইএমএফ, ২০২৬)।

বিভিন্ন দেশের প্রবৃদ্ধির গতি-প্রকৃতিতেও ভিন্নতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উচ্চ আয়ের উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোতে ঋণের উচ্চ ব্যয়, জনসংখ্যার বার্ধক্য এবং বিভিন্ন কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে প্রবৃদ্ধি ২ শতাংশের নিচেই থাকতে পারে। এ সকল দেশে পরবর্তী বছরগুলোতে প্রবৃদ্ধির গতি কিছুটা কমে আসলেও উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলো সামগ্রিকভাবে ৪ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারে (আইএমএফ, ২০২৬)।

আবাসন খাতসহ অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড রপ্তানি খাতের তুলনায় পিছিয়ে থাকার কারণে মধ্যমেয়াদে চীনের প্রবৃদ্ধি ধীরে ধীরে কমে আসতে পারে। অন্যদিকে, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ হ্রাস পাওয়া এবং শ্রমশক্তির সম্প্রসারণ ধীরগতির হলেও স্থিতিশীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে মাঝারি ধরণের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকতে পারে। তবে জাপান ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে তুলনামূলক ধীরগতির প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে।

সামগ্রিকভাবে, বৈশ্বিক অর্থনীতি এখনও তুলনামূলক স্থিতিশীল অবস্থানে থাকলেও মধ্যমেয়াদে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবৃদ্ধির গতি মন্থর ও অসম থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। অব্যাহত ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা, মূল্যস্ফীতির চাপ, বৈশ্বিক বাণিজ্যের কাঠামোগত রূপান্তর এবং আর্থিক বাজারের অস্থিরতা- এ ক্ষেত্রে প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে।

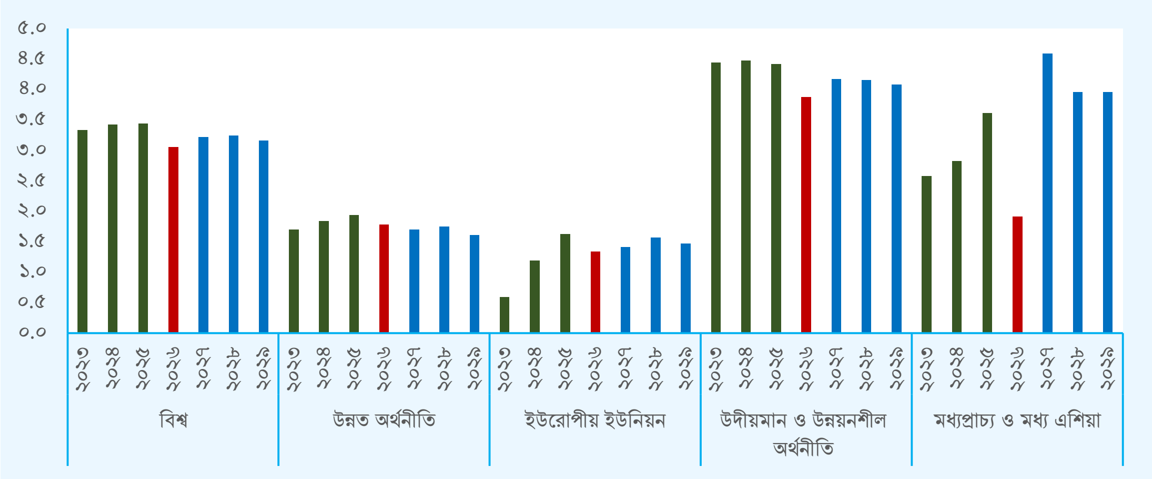

চিত্র ১.১ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৬

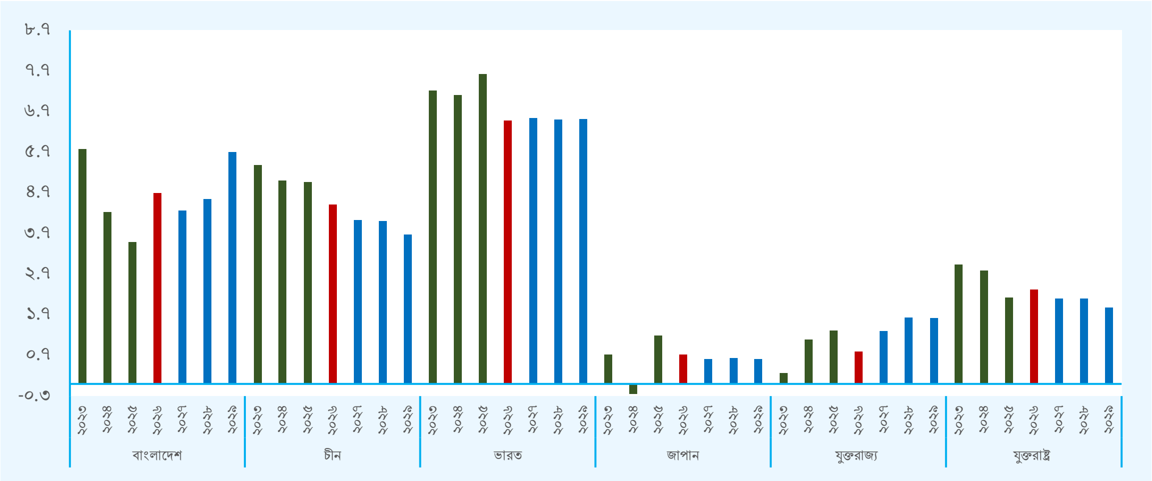

চিত্র ১.২ বিভিন্ন দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৬

১.৩ বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতির দৃশ্যকল্প

জ্বালানি বাজারে নতুন করে অস্থিরতা দেখা দিলে পরিবহন ও উৎপাদন ব্যয় বেড়ে ২০২৬ সালে বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি সাময়িকভাবে কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে মধ্যমেয়াদে তা ধীরে ধীরে কমে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২০২৩ সালের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে কমে আসার পর সামগ্রিক বিশ্ব মূল্যস্ফীতি ২০২৬ সালে সামান্য বেড়ে প্রায় ৪.৪ শতাংশে পৌঁছাতে পারে। তবে পরবর্তী বছরগুলোতে মূল্যস্ফীতির চাপ ধীরে ধীরে কমে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। ২০২৩ সালের পর থেকে মূল্যস্ফীতি কমার যে প্রবণতা দেখা গেছে, তার পেছনে কঠোর মুদ্রানীতি, সরবরাহ ব্যবস্থার বাধা কমে আসা এবং সামগ্রিক চাহিদার শ্লথগতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তবে সার্বিক মূল্যস্তর এখনো কোভিডপূর্ব সময়ের তুলনায় বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

মূল্যস্ফীতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি পৌঁছানোর প্রেক্ষিতে উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোতে মূল্যচাপ কমার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে বেশি দৃশ্যমান হয়েছে (আইএমএফ, ২০২৬)। তবে উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলো এখনো তুলনামূলকভাবে উচ্চ ও দীর্ঘস্থায়ী মূল্যচাপের মধ্যে রয়েছে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ায় ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা এবং জ্বালানি বাজারের অস্থিরতার কারণে অভ্যন্তরীণ দামের উপর প্রভাব পড়ায় মূল্যস্ফীতি তুলনামূলকভাবে ঊর্ধ্বমুখী থাকতে পারে।

দেশভিত্তিক চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০২৪-২০২৫ সময়কালে বাংলাদেশে খাদ্য ও জ্বালানির উচ্চমূল্য, বিনিময় হারজনিত চাপ এবং অভ্যন্তরীণ বাজারের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে মূল্যস্ফীতি দীর্ঘ সময় ধরে ঊর্ধ্বমুখী ছিল। তবে ধারাবাহিক নীতিগত অবস্থান বজায় থাকার প্রেক্ষিতে মধ্যমেয়াদে মূল্যস্ফীতি ধীরে ধীরে কমতে পারে। ভারত তুলনামূলক স্থিতিশীল পর্যায়ে মূল্যস্ফীতি ধরে রাখতে সক্ষম হতে পারে এবং চীনে মূল্যস্ফীতির হার তুলনামূলক নিম্নমুখী থাকতে পারে।

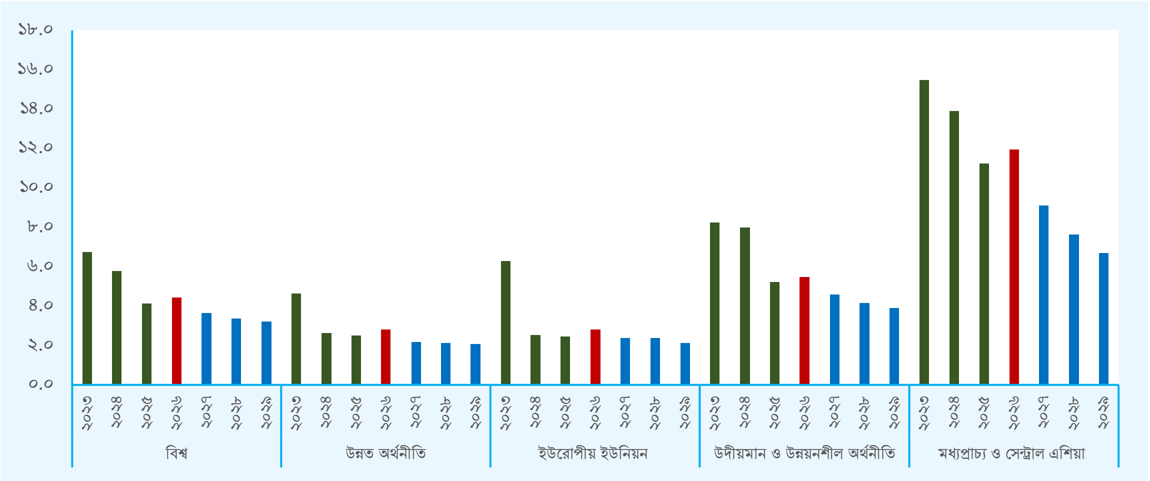

চিত্র ১.৩ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মূল্যস্ফীতি (%)

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৬

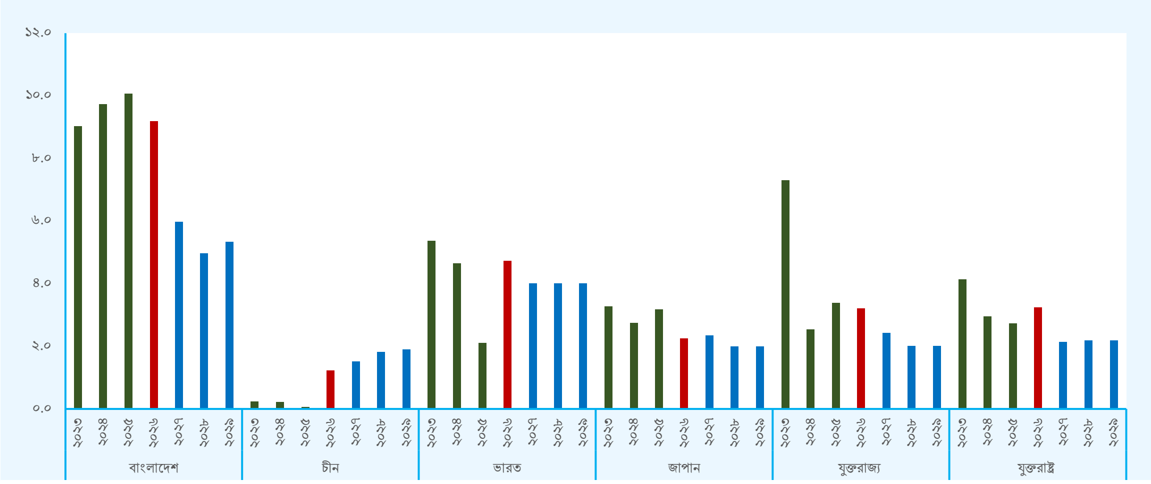

চিত্র ১.৪ বিভিন্ন দেশের মূল্যস্ফীতি (%)

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৬

১.৪ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দৃশ্যকল্প

২০২৩ সালের সংকোচনের পর ২০২৪–২০২৫ সময়কালে বিশ্ব-বাণিজ্যে পুনরুদ্ধারের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। মূল্যস্ফীতি হ্রাস, বৈদেশিক চাহিদা বৃদ্ধি এবং সরবরাহ ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা কমে আসা- বিশ্ব বাণিজ্যের এ পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তবে সকল দেশে এ পুনরুদ্ধারের চিত্র একইভাবে প্রতিফলিত হয়নি। মধ্যমেয়াদে বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি মন্থর গতিতে অব্যাহত থাকতে পারে। স্থিতিশীল সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশ ইতিবাচক ভূমিকা রাখলেও চলমান ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা, নীতিগত অনিশ্চয়তা এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের ঝুঁকি বিশ্ব বাণিজ্য সম্প্রসারণকে সীমিত রাখতে পারে।

একই সঙ্গে নৌপরিবহন ব্যবস্থায় বিঘ্ন এবং শুল্কসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা বিশ্ব বাণিজ্যের স্বাভাবিক কার্যক্রমে নতুন অনিশ্চয়তা তৈরি করছে ও ব্যবসায়িক আস্থার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। পাশাপাশি পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি এবং পণ্য ও জ্বালানির দামের অস্থিরতা বৈশ্বিক বাণিজ্যের গতি আরও শ্লথ করে দিতে পারে। চীনের রপ্তানি প্রবৃদ্ধির মন্থর গতি এবং উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোতে বাণিজ্য সম্প্রসারণ স্তিমিত হওয়ার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মতো উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলো শ্রমঘন উৎপাদন খাতে সরবরাহ ব্যবস্থার পুনঃবিন্যাসের ফলে কিছুটা সুবিধা পেতে পারে। পাশাপাশি, ডিজিটাল বাণিজ্যের ধারাবাহিক সম্প্রসারণ এবং বৈশ্বিক বাণিজ্য নীতির পরিবর্তনের ফলে মধ্যমেয়াদে রপ্তানি প্রতিযোগিতা ও বৈশ্বিক উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়তে পারে।

১.৪.১ আন্তর্জাতিক রপ্তানির দৃশ্যকল্প

বৈদেশিক চাহিদা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে ২০২৬-২০২৯ সময়কালে স্থিতিশীল বৈশ্বিক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হতে পারে। তবে ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা এবং বৈশ্বিক বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান কাঠামোগত পরিবর্তনের ঝুঁকির ফলে এ প্রবৃদ্ধির ধারা নিম্নমুখী হতে পারে।

২০২৩–২০২৪ সময়কালে তুলনামূলক মন্দাভাবের পর সামনের দিনগুলোতে বাংলাদেশের রপ্তানি খাত ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াতে পারে। বৈদেশিক চাহিদা বৃদ্ধি এবং উৎপাদন খাতের ঘুরে দাঁড়ানো এ পুনরুদ্ধারে সহায়তা করবে। এ প্রেক্ষাপটে ২০২৭ সালে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৩ শতাংশে পৌঁছাতে পারে। তবে পরবর্তী বছরগুলোতে তা ধীরে ধীরে কিছুটা কমে আসতে পারে। সামগ্রিকভাবে রপ্তানি খাত তুলনামূলক ইতিবাচক অবস্থানে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। একইসঙ্গে প্রবৃদ্ধির গতি কিছুটা শ্লথ হলেও চীন বৈশ্বিক রপ্তানিতে আধিপত্য ধরে রাখতে পারে। একই সময়ে ভারত ও ভিয়েতনামের রপ্তানি খাতের অবস্থান আরও সুদৃঢ় হতে পারে, যদিও ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ওঠানামা করতে পারে (আইএমএফ, ২০২৬)।

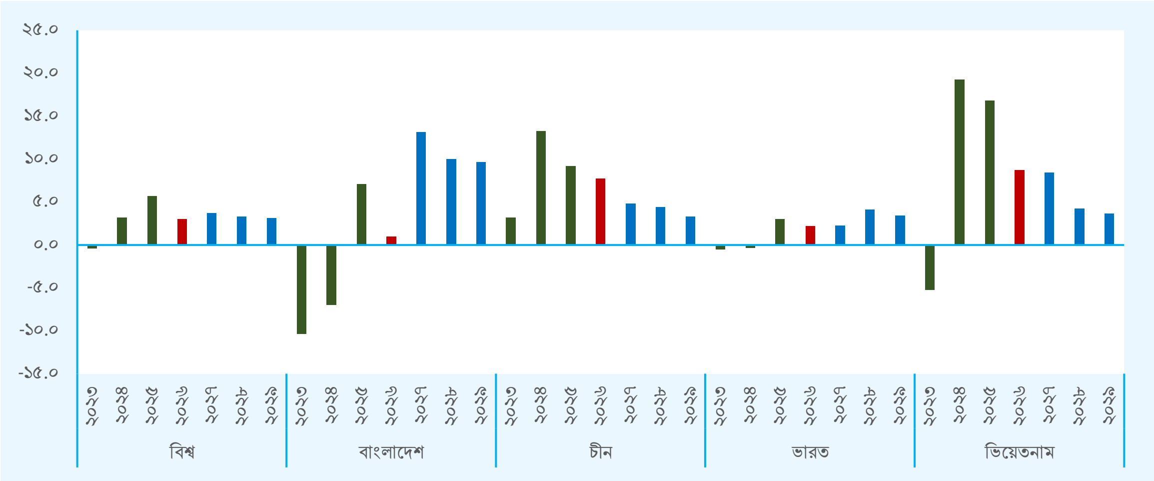

চিত্র ১.৫ বিশ্ব এবং বিভিন্ন দেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি (%-পরিমাণগত)

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৬

১.৪.২ আন্তর্জাতিক আমদানির দৃশ্যকল্প

চিত্র ১.৬ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল এবং দেশের আমদানি প্রবৃদ্ধি (%-পরিমাণগত)

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৬

আইএমএফ-এর পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৬–২০২৯ সময়কালে বৈশ্বিক আমদানির প্রবৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে শ্লথ থাকতে পারে। বৈশ্বিক চাহিদা ধীরে ধীরে স্থিতিশীল হওয়ার প্রবণতা দেখা গেলেও সাম্প্রতিক ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা এবং বাণিজ্য নীতির অনিশ্চয়তা এখনো ঝুঁকি হিসেবে রয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরো অঞ্চলে আমদানির প্রবৃদ্ধি ধীর গতিতে বাড়তে পারে। একইভাবে চীনের আমদানি প্রবৃদ্ধিও মাঝারি পর্যায়ে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে, ভারতে মধ্যমেয়াদে আমদানি ধারাবাহিকভাবে বাড়তে পারে বলে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে রপ্তানি খাতের পুনরুদ্ধার, অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগ কার্যক্রম

সম্প্রসারণের কারণে আমদানি প্রবৃদ্ধি ঊর্ধ্বমুখী থাকতে পারে (আইএমএফ, ২০২৬)।

১.৫ বৈশ্বিক সুদহার পরিস্থিতি

মূল্যস্ফীতির চাপ ধীরে ধীরে কমে আসায় বৈশ্বিক মুদ্রানীতি কঠোর অবস্থান থেকে পর্যায়ক্রমে স্বাভাবিক ধারায় ফিরে আসতে শুরু করেছে। ২০২২ সাল থেকে ২০২৪ সালের মাঝামাঝি সময়কাল পর্যন্ত উন্নত ও উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলো মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নীতি সুদের হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এর ফলে Secured Overnight Financing Rate (SOFR)- এর মত স্বল্পমেয়াদভিত্তিক সুদের হার প্রায় শূন্যের কাছাকাছি অবস্থান থেকে বেড়ে ৫ শতাংশেরও উপরে ওঠে যায়। তবে ২০২৪ সালের শেষ দিকে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি নিম্নমুখী হওয়া এবং মূল্যস্ফীতির চাপ কমে আসার প্রেক্ষিতে ধীরে ধীরে সুদের হার কমানোর প্রবণতা শুরু হয়। এ ধারাবাহিকতায় SOFR-এর হার সর্বোচ্চ ৫.৩–৫.৪ শতাংশ থেকে কমে ২০২৫ সালের শেষ দিকে প্রায় ৪.১ শতাংশে নেমে আসে। ২০২৬ সালে এ হার গড়ে ৩.৬ থেকে ৩.৭ শতাংশের মধ্যে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২০২৬ সালের শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য নীতি সুদের হার যথাক্রমে ৩.৬ শতাংশ এবং ৩.৮ শতাংশে কমিয়ে আনে। অন্যদিকে, চীন ও ভারত তুলনামূলক নমনীয় মুদ্রানীতি অনুসরণ করে যথাক্রমে ৩ শতাংশ ও ৫.৩ শতাংশ সুদের হার বজায় রাখে (দ্য গ্লোবাল ইকোনমি, ২০২৬)। ঋণ ব্যয় কমে আসায় বৈশ্বিক বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কিছুটা গতি ফিরে আসতে পারে, তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো এখনো সতর্ক অবস্থান বজায় রেখেছে। ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা, বাণিজ্যে নানা বাধা এবং পণ্যমূল্যের বাজারে অস্থিরতার মতো ঝুঁকিগুলো আবারও মূল্যস্ফীতির চাপ বাড়াতে পারে। এতে বর্তমানে চলমান শিথিল মুদ্রানীতির ধারাবাহিকতা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে (ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্ক, ২০২৬)।

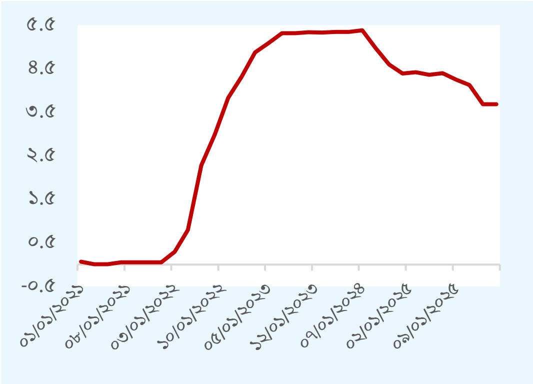

চিত্র ১.৭ বিগত কয়েক বছরের SOFR

উৎস: ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্ক

১.৬ মুদ্রা বিনিময় হার

২০২২ থেকে ২০২৫ সময়কালে বৈশ্বিক মুদ্রাবাজারের গতি-প্রকৃতি মূলত সমন্বিত কঠোর মুদ্রানীতি, উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপ এবং বৈশ্বিক বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাবে পরিচালিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের মুদ্রানীতিতে ভিন্ন অবস্থান এবং সামষ্টিক অর্থনীতিতে বিদ্যমান চাপের প্রভাবে মার্কিন ডলারের বিপরীতে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হারে উল্লেখযোগ্যভাবে ওঠানামা করতে দেখা গেছে। এ সময়কালে কিছুটা ওঠানামার পর ২০২৫ সালে ইউরোর বিনিময় হার তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল অবস্থানে ফিরে আসে। অন্যদিকে, ২০২৪ সাল জুড়ে জাপানি ইয়েনের মান উল্লেখযোগ্যভাবে অবমূল্যায়ন হলেও পরবর্তী সময়ে কিছুটা পুনরুদ্ধার লক্ষ্য করা যায়। একই সময়ে চীনা রেনমিনবির বিনিময় হার তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ছিল। অন্যদিকে, বাংলাদেশের টাকার বিনিময় হার দীর্ঘ সময় ধরে অবমূল্যায়নের চাপে ছিল। ২০২১ সালে প্রতি মার্কিন ডলারের বিপরীতে বিনিময় হার ছিল প্রায় ৮৬ টাকা, যা ২০২৫ সালে বেড়ে ১২০ টাকা ছাড়িয়ে যায়। এর পেছনে মূল কারণ হলো চলতি হিসাব ও সামগ্রিক লেনদেনে ঘাটতি বাড়তে থাকা এবং আমদানি নির্ভর বৈদেশিক খাতে চাপ সৃষ্টি হওয়া। আগামী দিনগুলোতেও

বৈদেশিক মুদ্রাবাজার বেশ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকতে পারে। বিশেষ করে মূলধন প্রবাহের ওঠানামা, সুদের হারের পার্থক্য এবং পণ্য মূল্যের অস্থিরতা আমদানি নির্ভর উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর মুদ্রার ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করতে পারে (ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটলমেন্ট, ২০২৬)।

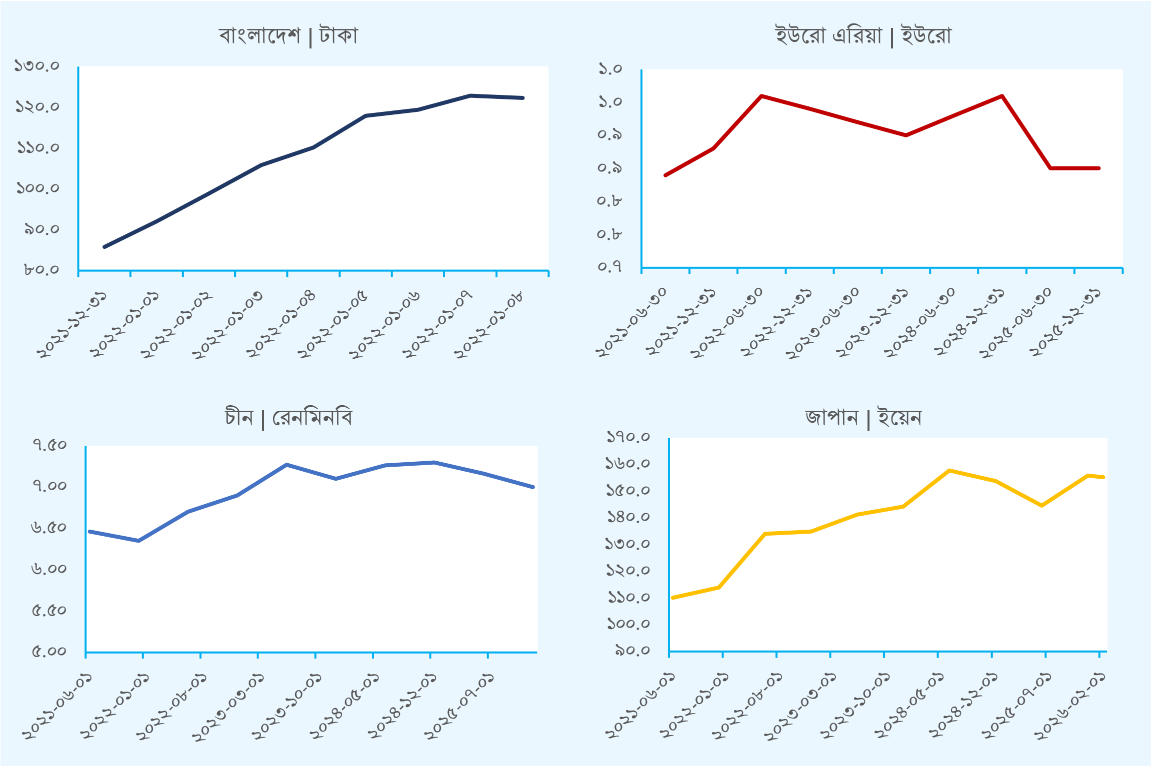

চিত্র ১.৮ মার্কিন ডলারের বিপরীতে কতিপয় মুদ্রার বিনিময় হার

উৎস: ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট (বিআইএস)

১.৭ আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য পরিস্থিতি

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বৈশ্বিক পণ্যমূল্যে উল্লেখযোগ্য অস্থিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর পেছনে বৈশ্বিক চাহিদার ওঠানামা, সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন এবং ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। পূর্বের তুলনায় মূল্যচাপ কিছুটা কমে এলেও সাম্প্রতিক ভূরাজনৈতিক উত্তেজনার ফলে জ্বালানি ও অন্যান্য পণ্যের দামে আবারও উর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা দিয়েছে।

অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের (ব্রেন্ট) দাম ২০২২ সালে ব্যারেল প্রতি ১১০ ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তবে পরে তা ধীরে ধীরে কমে আসে এবং ২০২৩–২০২৫ সময়কালে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল অবস্থায় পৌঁছায় (বিশ্বব্যাংক, ২০২৬খ)। তবে নতুন করে ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা বা সরবরাহ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিলে ২০২৬ সালে তেলের দাম সাময়িকভাবে আবারও ব্যারেলপ্রতি ১০০ ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে। তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) দামেও উল্লেখযোগ্য অস্থিরতা লক্ষ করা যাচ্ছে।

এছাড়াও, খাদ্যপণ্যের বৈশ্বিক দামেও উল্লেখযোগ্য ওঠানামা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০২৪ সালে আন্তর্জাতিক বাজারে চালের দাম প্রতি মেট্রিক টনে ৬০০ ডলার ছাড়িয়ে যায়। তবে সামনের দিনগুলোতে এই দাম কমে ৩৮০ থেকে ৪০০ ডলারে নেমে আসতে পারে। একইভাবে ইউরিয়া সারের দাম ২০২২ সালে প্রতি মেট্রিক টনে প্রায় ৮৫০ মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে এই দাম কমে এলেও তা আবার ৭০০ ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে, কয়েকটি পণ্যের দাম আগের তুলনায় কমে এলেও সরবরাহ ব্যবস্থার অনিশ্চয়তা এবং বৈশ্বিক চাহিদার ওঠানামার কারণে পণ্যমূল্যের বাজারে এখনো অস্থিরতা বিরাজ করছে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি ও খাদ্যপণ্যের দাম কমে আসলে বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির চাপও কিছুটা কমে আসতে পারে। তবে বৈশ্বিক পণ্যমূল্য আবার বেড়ে গেলে বা বিনিময় হার আরও অবমূল্যায়িত হলে সেই সুফল অনেকটাই কমে যেতে পারে এবং অভ্যন্তরীণ মূল্যস্ফীতিও বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

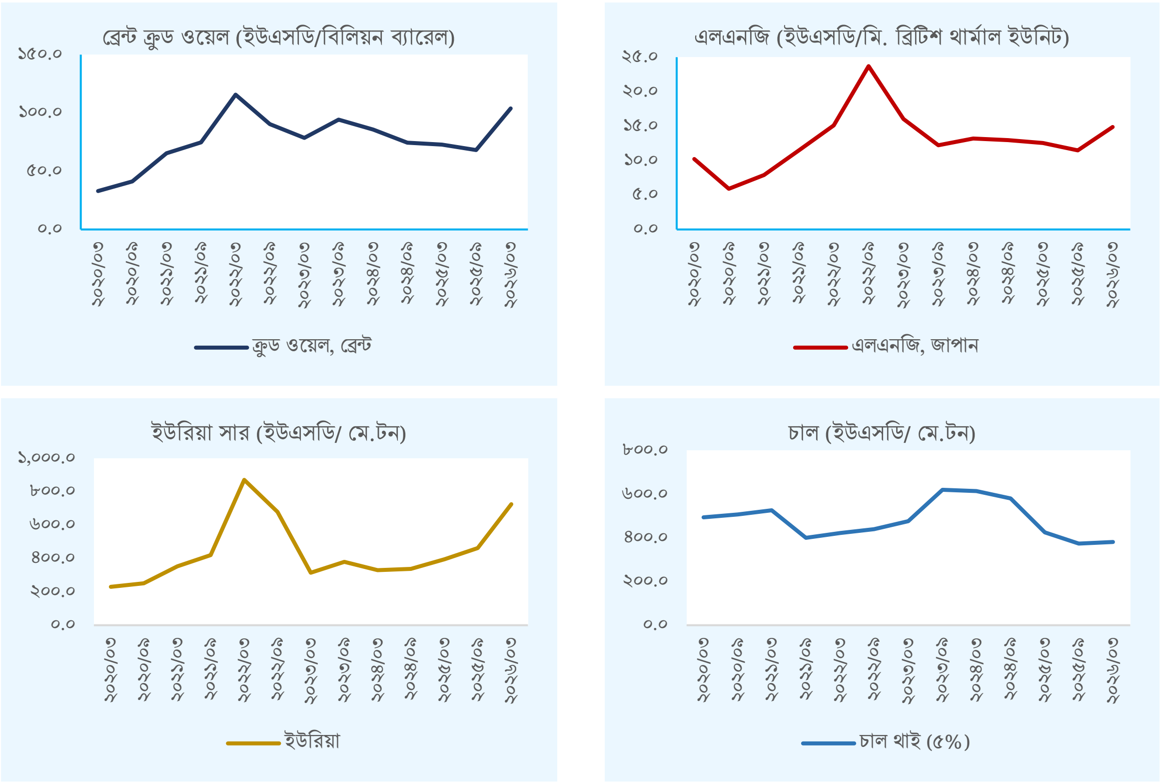

চিত্র ১.৯ আন্তর্জাতিক বাজারে বিভিন্ন পণ্যের মূল্য

উৎস: ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট (বিআইএস)

১.৮ বৈশ্বিক ঝুঁকির নতুন মাত্রা ও নীতিগত করণীয়

ক্রমবর্ধমান ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা, সরবরাহ ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং কঠোর বৈশ্বিক আর্থিক পরিস্থিতি উন্নত ও উন্নয়নশীল- উভয় ধরণের অর্থনীতির ওপরই উল্লেখযোগ্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করছে। মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাত পণ্যমূল্যের অস্থিরতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কাঠামোগত পরিবর্তনের ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। এর ফলে বিশ্বজুড়ে মূল্যস্ফীতির চাপ দীর্ঘ হচ্ছে এবং সরবরাহ ব্যবস্থায়ও নানা প্রতিকূলতা সৃষ্টি হচ্ছে। একই সঙ্গে উচ্চ সরকারি ঋণ এবং ঋণ পুনঃঅর্থায়নের বাড়তি ব্যয় বহিঃখাতের ঝুঁকি আরও বৃদ্ধি করছে। এর প্রভাবে উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলো থেকে মূলধন বেরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা বাড়তে পারে এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও চাপের মুখে পড়তে পারে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এসকল বহিঃখাতজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ধরে রাখতে রাজস্ব ও মুদ্রানীতির মধ্যে আরও কার্যকর সমন্বয় এবং প্রয়োজনীয় কাঠামোগত সংস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসকল প্রাতিষ্ঠানিক ও বহুমাত্রিক ঝুঁকি মোকাবিলায় অভ্যন্তরীণ সরবরাহ ব্যবস্থার সক্ষমতা বাড়ানো, বাজার ব্যবস্থাপনায় সুশাসন জোরদার করা, বাণিজ্য ও জ্বালানি উৎসের বহুমুখীকরণ এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শক্তিশালী রাখা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ভিত্তি আরও স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হবে।

১.৯ উপসংহার

কাঠামোগত স্থিতিশীলতা বজায় থাকলেও ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা, বৈশ্বিক বাণিজ্যের চলমান রূপান্তর এবং আর্থিক খাতে চাপের কারণে বিশ্ব অর্থনীতি বর্তমানে উল্লেখযোগ্য অনিশ্চয়তার আবর্তে রয়েছে। মূল্যস্ফীতির চাপ ধীরে ধীরে কমা এবং বিশ্ব বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার হলে বাংলাদেশের মতো উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর জন্য সরবরাহ ব্যবস্থার বহুমুখীকরণ ও রপ্তানি সম্প্রসারণের নতুন সুযোগ তৈরি করছে। তবে বিনিময় হারের ওঠানামা, পণ্যমূল্যের অস্থিরতা এবং বৈদেশিক চাহিদা কমে যাওয়ার মতো ঝুঁকি সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য এখনো বড় চ্যালেঞ্জ। এ সকল চাপ মোকাবিলার জন্য রাজস্ব ও মুদ্রানীতির মধ্যে কার্যকর সমন্বয়, বহিঃখাতের সক্ষমতা জোরদার এবং শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। সাম্প্রতিক সংকটগুলো এটি আরও স্পষ্ট করে তুলেছে যে, ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে এসকল সংকটের প্রভাব এবং তা মোকাবিলার সক্ষমতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান বিদ্যমান। সাধারণভাবে সুশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাকে এ পার্থক্যের প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে এটি প্রতীয়মান যে, সংকট মোকাবিলা এবং আগাম প্রস্তুতির লক্ষ্যে গড়ে ওঠা আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক ক্ষেত্রেই প্রত্যাশিত দক্ষতা, সমন্বয় ও ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়নি। এই প্রেক্ষিতে, পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক রূপান্তর থেকে উদ্ভূত মধ্যমেয়াদী ঝুঁকি ও সম্ভাবনাগুলো বাংলাদেশের নীতি কাঠামোয় কীভাবে প্রতিফলিত হতে পারে, তার সমন্বিত পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

২

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি

(২০২৬-২৭ হতে ২০২৮-২৯)

বাংলাদেশের অর্থনীতি: মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

অধ্যায় ২

বাংলাদেশের অর্থনীতি: মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

সংক্ষিপ্তসার

- *বাংলাদেশ ২০৩৪ সালের মধ্যে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে উন্নীত হওয়ার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য সামনে রেখে পর্যায়ক্রমে অধিকতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে, যা সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি একটি টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বিনিয়োগবান্ধব অর্থনৈতিক কাঠামোতে উত্তরণ ঘটাবে।*
- *বেসরকারি বিনিয়োগে গতি সঞ্চার, সরকারি উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি এবং একটি অধিকতর স্থিতিশীল ও পূর্বাভাসযোগ্য নীতি-পরিবেশের ওপর ভর করে দেশের প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ক্রমান্বয়ে বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ৫.০ শতাংশ থেকে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৬.৫ শতাংশ, ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ৭.০ শতাংশ এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছরে ৭.৫ শতাংশে উন্নীত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।*
- *মুদ্রানীতির ইতিবাচক প্রভাব, আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্যের স্থিতিশীলতা এবং অভ্যন্তরীণ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি ক্রমান্বয়ে কমে আসবে। মূল্যস্ফীতি কমে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৭.৫ শতাংশে আসবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে এবং মধ্যমেয়াদে ২০২৮-২৯ অর্থবছর নাগাদ আরও কমে ৬.০ শতাংশের দিকে নেমে আসতে পারে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।*
- *বিদ্যুৎ, জ্বালানি, যোগাযোগ অবকাঠামো ও মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারের বিশেষ অগ্রাধিকারের সুবাদে সরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। সরকারি বিনিয়োগ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জিডিপির ৬.৫১ শতাংশ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ১০.৭৫ শতাংশ এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছর নাগাদ আরও বেড়ে ১৫.১৭ শতাংশে উন্নীত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।*
- *রেমিট্যান্স প্রবাহ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩০.৫৯ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৮-২৯ অর্থবছরে প্রায় ৪৯.২৩ বিলিয়ন উন্নীত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এই বাড়তি প্রবাসী আয় দেশের বাণিজ্য ঘাটতি প্রশমনে গুরুত্বপূর্ণ ভারসাম্য বজায় রাখছে।*
- *অর্থনীতির উদারীকরণ, গণতন্ত্রায়ন, বিনিয়ন্ত্রণকরণ, আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, বিশ্ব পরিস্থিতির প্রত্যাশিত স্থিতিশীলতা এবং মুদ্রানীতি পর্যায়ক্রমে শিথিল করার অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই এই মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।*

২.১ দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য: ট্রিলিয়ন ডলারের জিডিপি

বাংলাদেশের মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক দৃশ্যকল্পটি মূলত ২০৩৪ সালের মধ্যে অর্থনীতিকে একটি ট্রিলিয়ন-ডলার অর্থনীতিতে পরিণত করার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে। এই রূপরেখায় সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হলো—মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, বিনিময় হার সমন্বয় এবং আর্থিক খাতের সংস্কার করা; যা চূড়ান্তভাবে বিনিয়োগ-নির্ভর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করবে। সাম্প্রতিক নীতিগত পদক্ষেপগুলোর ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে ইতিবাচক ধারা ফিরে এসেছে এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বেড়েছে। এই অর্জনগুলো দেশের অর্থনীতির টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য একটি মজবুত ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে উত্তরণের কৌশলগত অগ্রাধিকারসমূহের মধ্যে রয়েছে: ১. বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডিরেগুলেশন নিশ্চিত করার মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা, যেখানে বিনিয়োগ-জিডিপি অনুপাত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের আনুমানিক ২৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৮-২৯ অর্থবছর নাগাদ ৩৬ শতাংশ বা তদূর্ধ্বে উন্নীত হবে; ২. কম লাভজনক বা সাধারণ উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে বেশি লাভজনক শিল্প এবং আধুনিক সেবা খাতের দিকে অর্থনৈতিক রূপান্তর; ৩. প্রচলিত পণ্যের বাইরে রপ্তানি পণ্যের তালিকায় বৈচিত্র্য আনা এবং বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থা তথা সাপ্লাই চেইন-এর সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত হওয়া; ৪. দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি করা এবং অনানুষ্ঠানিক খাতকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার মাধ্যমে সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ব্যাংকিং বা আনুষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসা; ৫. নতুন উদ্ভাবন, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে মোট উৎপাদনশীলতা ধাপে ধাপে বাড়ানো; এবং ৬. টেকসই ও সমতাভিত্তিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

বেসরকারি খাতের বিকাশ এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির ওপরই এই রূপান্তর নির্ভর করছে; যা মূলত দক্ষ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। পাশাপাশি, অর্থনৈতিক গণতন্ত্রীকরণের নীতির ভিত্তিতে এই প্রবৃদ্ধির সুফল যেন দেশের প্রতিটি অঞ্চল, খাত এবং সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করা হবে। ২০২৬-২৭ থেকে ২০২৮-২৯ অর্থবছরের সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি-বিবৃতি (MTMPS) সরকারের কৌশলগত অবস্থানকে তুলে ধরে। এর মূল লক্ষ্য হলো—অর্থনীতিকে স্থিতিশীলতা থেকে সম্প্রসারণের দিকে নিয়ে যাওয়া, কেবল উপকরণের ব্যবহার না বাড়িয়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি অর্জন করা এবং প্রবৃদ্ধির সুফল সব মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে সামগ্রিক সমৃদ্ধি অর্জন করা।

২.২ সরকারের নীতিগত অবস্থান

বিনিয়ন্ত্রণকরণ (Deregulation): একটি বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি এবং ব্যবসায়ী ও ভোক্তা উভয়ের স্বার্থ সুরক্ষায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতে ধারাবাহিক কাঠামোগত সংস্কার বাস্তবায়ন করা হবে।

রাজস্ব নীতি: অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি-সহায়ক রাজস্ব নীতি অনুসরণের পাশাপাশি সামষ্টিক আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা হবে। এই লক্ষ্যে অবকাঠামো, মানবসম্পদ উন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা এবং উচ্চ-অগ্রাধিকারযুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। Medium-and Long-Term Revenue Strategy (MLTRS)-এর আওতায় কর ব্যবস্থার বড় ধরণের সংস্কার, পুরোপুরি অটোমেশন, করদাতার সংখ্যা বাড়ানো এবং নিয়ম মেনে কর দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারি রাজস্ব আদায় অনেক বাড়বে। এতে রাজস্ব ঘাটতি জিডিপির ৩.২১ থেকে ৩.৬৮ শতাংশের মধ্যে একটি টেকসই সীমার মধ্যে থাকবে এবং সরকারি ঋণও নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মুদ্রানীতি: মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক স্বল্পমেয়াদে নীতি সুদহার ১০% বজায় রাখবে এবং পরবর্তীতে বিনিয়োগ ও ঋণ প্রবৃদ্ধি বাড়াতে তা শিথিল করবে। মুদ্রানীতির শৃঙ্খলা, বিশ্ববাজারে পণ্যমূল্যের স্বাভাবিক পরিস্থিতি, স্থিতিশীল বিনিময় হার এবং কার্যকর সরবরাহ ব্যবস্থা অর্জিত হলে মূল্যস্ফীতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরে প্রায় ৭.৫% এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছরে আনুমানিক ৬.০%-এ নেমে আসবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

সারণি ২.১ সরকারের নীতিগত অবস্থান

নীতির ক্ষেত্র	২০২৬-২৭ অর্থবছরের অবস্থান	২০২৭-২৮ ও ২০২৮-২৯ অর্থবছর	প্রধান উপকরণসমূহ
রাজস্ব নীতি	আর্থিক শৃঙ্খলা ও রাজস্ব সক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং প্রবৃদ্ধি-সহায়ক উন্নয়ন ব্যয় সম্প্রসারণ	ঋণ বা ঘাটতির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে রেখে অবকাঠামো খাত এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে বড় ধরণের বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ	অগ্রাধিকারভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি; কর সংস্কার; সরকারি ব্যয় যৌক্তিকীকরণ; লক্ষ্যভিত্তিক ভর্তুকি; সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি
মুদ্রানীতি	মূল্যস্ফীতি-বিরোধী শৃঙ্খলা বজায় রেখে সতর্কতার সাথে মুদ্রা নীতি শিথিলকরণ	মূল্যস্ফীতি প্রশমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃদ্ধি-সহায়ক মুদ্রা পরিস্থিতির দিকে ক্রমান্বয়ে উত্তরণ	নীতি সুদহার ব্যবস্থাপনা; রিজার্ভ মুদ্রা লক্ষ্যমাত্রা; সুদহার করিডোর; তারল্য ব্যবস্থাপনা; মূল্যস্ফীতি পর্যবেক্ষণ কাঠামো
বিনিময় হার নীতি	হস্তক্ষেপ সীমিতকরণের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ বাজারভিত্তিক বিনিময় হার ব্যবস্থা পরিচালনা।	বহিঃখাতের উন্নয়ন এবং রিজার্ভ পুনর্গঠনের মাধ্যমে বিনিময় হারে অধিকতর গতিশীলতা আনয়ন ও সুসংহতকরণ	বাজারভিত্তিক বিনিময় হার ব্যবস্থা; রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা; বৈদেশিক মুদ্রা বাজার পর্যবেক্ষণ; রেমিট্যান্স প্রণোদনা
বহিঃখাত নীতি	বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আরও শক্তিশালী করা এবং রপ্তানি বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়ানো।	রপ্তানি বাণিজ্য বহুমুখীকরণ, বহিঃখাতের সহনশীলতা বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ভ্যালু চেইনের সাথে ইন্টিগ্রেশন নিশ্চিতকরণ।	বাণিজ্য সহজীকরণ; রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণ উদ্যোগ; বাণিজ্য আলোচনা; এফডিআই উৎসাহিতকরণ
সামাজিক সুরক্ষা নীতি	সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষার লক্ষ্যে লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসূচিসমূহের কৌশলগত সম্প্রসারণ	একটি সমন্বিত এবং ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ব্যবস্থার পর্যায়ক্রমিক শক্তিশালীকরণ	ফ্যামিলি কার্ড সম্প্রসারণ; কৃষক কার্ড সম্প্রসারণ; ওএমএস কার্যক্রম; ডায়নামিক সোশ্যাল রেজিস্ট্রি; ডিজিটাল জিটুপি পরিশোধ ব্যবস্থা
আর্থিক খাত সংস্কার	ব্যাংকিং খাতের সুশাসন এবং সামগ্রিক আর্থিক খাতের নিয়মতান্ত্রিক শৃঙ্খলা সুসংহতকরণ	আর্থিক মধ্যস্থতা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা এবং উৎপাদনশীল খাতে ঋণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা	ব্যাংকিং-খাত তদারকি; খেলাপি ঋণ হ্রাস; ডিজিটাল আর্থিক সেবা; পুঁজিবাজার উন্নয়ন; সুশাসন ও সংস্কারমূলক বিধিবিধান
বিনিয়োগ ও ব্যবসা-পরিবেশ সংস্কার	বিনিয়ন্ত্রণকরণ এবং বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিতকরণ	বেসরকারি খাত-চালিত প্রবৃদ্ধির পরিধি সম্প্রসারণ এবং পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ ভিত্তিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন সুসংহতকরণ	ওয়ান-স্টপ বিনিয়োগকারী সেবা; পিপিপি কাঠামো শক্তিশালীকরণ; ইকোনমিক জোন উন্নয়ন; ডিজিটাল লাইসেন্সিং ব্যবস্থা; ডিরেগুলেশন
কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার	সুশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার নিশ্চিতকরণ।	প্রতিযোগিতা সক্ষমতা, উৎপাদনশীলতা, সুশাসন নিশ্চিত এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সহনশীলতা সুসংহত করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারসমূহ আরও গভীর করা।	ডিজিটাল সুশাসন সংস্কার; প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ; বিধিগত সংস্কার; অটোমেশন; নীতি সমন্বয় ব্যবস্থা।

বিনিময় হার নীতি: মে ২০২৫-এ প্রবর্তিত বাজারভিত্তিক বিনিময় হার ব্যবস্থা চালু থাকবে। মুদ্রা বাজারে অস্থিরতা ঠেকাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনে সীমিত হস্তক্ষেপ করবে এবং সতর্কতার সাথে রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা করবে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আস্তে আস্তে বাড়লে এবং বাইরের দেশের সাথে লেনদেনের ভারসাম্য ঠিক হলে মুদ্রার বিনিময় হার আরও স্থিতিশীল হবে।

বহিঃখাত নীতি: ব্যবসা-বাণিজ্য সহজ করা, নতুন নতুন পণ্য রপ্তানি এবং সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) বাড়ানোর চেষ্টা চালু থাকবে। এতে আমাদের রপ্তানি সক্ষমতা বাড়বে এবং বাইরের দেশের সাথে বাণিজ্যের ঝুঁকি কমবে। মধ্যমেয়াদে রপ্তানির চেয়ে আমদানি খরচ দ্রুত বাড়বে—কারণ বিনিয়োগ-ভিত্তিক উন্নয়ন কৌশলের কারণে মূলধনী যন্ত্রপাতি, জ্বালানি ও কাঁচামালের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। বিশ্ব বাণিজ্যের অনিশ্চয়তা মোকাবিলা, অর্থনৈতিক পরিবর্তন সহজ করা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান শক্তিশালী করতে সরকার সক্রিয় বাণিজ্য কূটনীতি চালিয়ে যাবে। এছাড়া, প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার

রিজার্ভ ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ধরে রাখার প্রধান ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

সামাজিক সুরক্ষা নীতি: সুনির্দিষ্ট ভর্তুকি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যে সহায়তা বজায় থাকবে। ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচি পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারিত হবে এবং এপ্রিল ২০২৬-এর মাঝামাঝি প্রবর্তিত 'কৃষক কার্ড' ব্যবস্থা আরও বিস্তৃত করা হবে। মধ্যমেয়াদে সামাজিক নিরাপত্তা খাতকে আরও আধুনিক ও ডিজিটাল করা হবে—যার মধ্যে ডিজিটাল G2P ট্রান্সফার ও ডায়নামিক সোশ্যাল রেজিস্ট্রি (DSR) সম্প্রসারণ অন্যতম।

অগ্রাধিকারমূলক সংস্কার উদ্যোগগুলোর লক্ষ্য হলো: ব্যাংকিং খাতে সুশাসন, সুনির্দিষ্ট তদারকি ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা জোরদার করা; খেলাপি ঋণের পরিমাণ কমিয়ে আনা; দক্ষ ঋণ-বন্টন নিশ্চিত করা; এবং ডিজিটাল আর্থিক সেবা ও পুঁজিবাজারের ভিত্তি শক্ত করা। বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে আইনি জটিলতা দূর করা, বিডা (BIDA) ওয়ান-স্টপ সেবা, পিপিপি (PPP) কাঠামোর আধুনিকায়ন, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ) উন্নয়ন ও ডিজিটাল লাইসেন্সিং-এর মাধ্যমে বিনিয়োগের পরিবেশ দ্রুত উন্নত করা হবে। সরকারের মধ্যমেয়াদি প্রধান নীতিসমূহ সারণি ২.১-এ তুলে ধরা হয়েছে।

২.৩ মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

২.৩.১ প্রকৃত খাত

প্রকৃত খাত ধীরে ধীরে তার কাঙ্ক্ষিত মধ্যমেয়াদি প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরে আসছে। মূলত সামষ্টিক সূচকগুলোর উন্নয়ন এবং এক ট্রিলিয়ন ডলারের জিডিপি অর্জনের লক্ষ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ একটি নতুন বিনিয়োগ পরিকল্পনাই এই অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা হ্রাস, মুদ্রা সংকোচন, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে দুর্বলতা এবং বহিঃখাতের অবশিষ্ট প্রতিকূল প্রভাবের কারণে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩.৪৯ শতাংশে শ্লথ হওয়ার পর প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৫.০ শতাংশ[১] , ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৬.৫ শতাংশ, ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ৭.০ শতাংশ এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছরে ৭.৫ শতাংশে ত্বরান্বিত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এই প্রক্ষেপণগুলো মূলত ডিরেগুলেশন, রাজস্ব ও আর্থিক খাতের বড় ধরণের সংস্কার, মূল্যস্ফীতির স্থিতিশীলতা, মুদ্রানীতির ক্রমান্বয় শিথিলকরণ, সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বহিঃখাতের চাহিদা পুনরায় বৃদ্ধি পাওয়ার অনুমানের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে।

২.৩.১.১ সাম্প্রতিক ত্রৈমাসিক প্রবৃদ্ধি

ত্রৈমাসিক আউটপুট ট্রেন্ড বা উৎপাদন গতিপ্রকৃতি সামগ্রিক অর্থনীতিতে একটি ব্রড-বেসড রিকভারি বা বিস্তৃত পুনরুদ্ধারের প্রাথমিক ইঙ্গিত প্রদান করে; যদিও বিভিন্ন খাতের অগ্রগতির চিত্রে এখনও তারতম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রারম্ভিক তথ্য অনুযায়ী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ধীরে ধীরে গতি ফিরে পাচ্ছে। সেবা খাতের কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং রপ্তানি পরিস্থিতির উন্নয়নের ফলে প্রথম প্রান্তিকে (Q1) প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি বেড়ে ৪.৯৬ শতাংশে উন্নীত হয়। অবশ্য পরবর্তীতে কঠোর মুদ্রানীতির কারণে ঋণপ্রবাহ কমে যাওয়া এবং অভ্যন্তরীণ সরবরাহ সংকটের কারণে শিল্প উৎপাদন ব্যাহত হয়। এর ফলে দ্বিতীয় প্রান্তিকে (Q2) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৩.০৩ শতাংশে দাঁড়ায়। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার উন্নয়ন,

[১] অনুচ্ছেদ ২.৫ ও বক্স ১ দ্রষ্টব্য।

বিনিয়োগকারীদের আস্থা পুনরুদ্ধার এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি বৃদ্ধির ফলে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে প্রবৃদ্ধি আরও শক্তিশালী হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

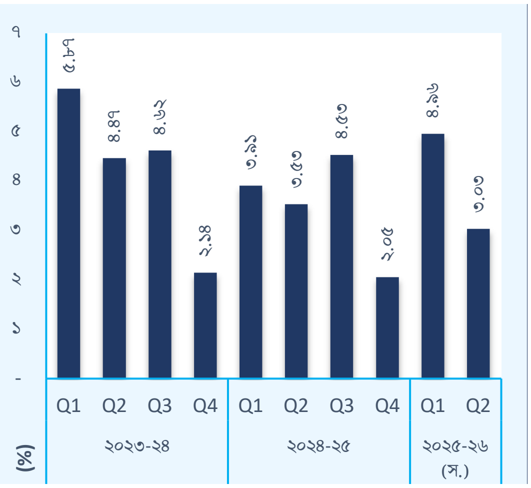

চিত্র ২.১ বিভিন্ন ত্রৈমাসিকে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (%)

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)

বিভিন্ন খাতের পারফরম্যান্স বা কর্মসম্পাদনের সূচকে একটি মিশ্র প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল হলেও তা ছিল সীমিত। তাই দেশের সামগ্রিক উৎপাদন প্রবৃদ্ধিতে এই খাত বড় কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। অন্যদিকে, জ্বালানি সরবরাহে সীমাবদ্ধতা, কঠোর আর্থিক পরিস্থিতি এবং তৈরি পোশাক খাতের দুর্বলতার কারণে শিল্পখাতের কার্যক্রম চাপের মুখে ছিল। এর ফলে কয়েকটি প্রান্তিকে শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধি ১ শতাংশেরও নিচে নেমে আসে। বিপরীতে, সেবাখাত তুলনামূলকভাবে অধিক স্থিতিস্থাপকতা (Resilience) প্রদর্শন করেছে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান সহায়ক শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। অবশ্য ভবিষ্যতের দিকে তাকালে দেখা যায়, দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের এই ধারাটি এখনও বড় ধরণের বৈশ্বিক ঝুঁকির সম্মুখীন। বিশেষ করে, মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংঘাত এবং এর ফলে বৈশ্বিক বাণিজ্য, জ্বালানি বাজার ও বৈদেশিক অর্থায়ন পরিস্থিতির ওপর সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাব অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

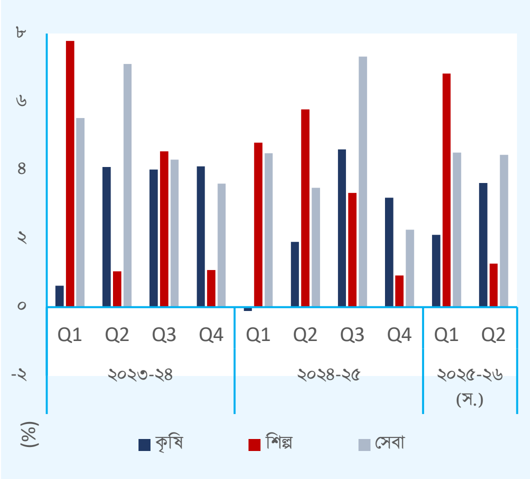

চিত্র ২.২ খাতভিত্তিক ত্রৈমাসিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার

সূত্র: বিবিএস

২.৩.১.২ প্রকৃত বনাম সম্ভাব্য উৎপাদন এবং উৎপাদন ব্যবধান

প্রকৃত ও সম্ভাব্য (পটেনশিয়াল) জিডিপির মধ্যকার ব্যবধান (Output Gap) বিশ্লেষণ করে মধ্যমেয়াদি নীতি-কৌশলগুলো তৈরি করা হয়। এটি সঠিক অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নিতে সহায়তা করে। উচ্চ মূল্যস্ফীতি, কঠোর মুদ্রানীতি, ডলারের বিনিময় হার সমন্বয় এবং সরকারি কাজের ধীরগতির সম্মিলিত প্রভাবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি আশানুরূপ হয়নি। সম্ভাব্য ৫.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধির বিপরীতে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩.৫ শতাংশ। ফলে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে –২.৪ শতাংশ পয়েন্টের একটি ঋণাত্মক ব্যবধান তৈরি হয়, যা কোভিড মহামারির পর সবচেয়ে বড় উৎপাদন ঘাটতি।

সরকারের নীতি কাঠামো অনুযায়ী মধ্যমেয়াদে প্রবৃদ্ধির ব্যবধান ধাপে ধাপে কমে আসবে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এই ঋণাত্মক ব্যবধান কমে আনুমানিক –১.৫ শতাংশ পয়েন্টে নামবে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের মধ্যে প্রকৃত ও সম্ভাব্য উৎপাদন প্রায় ৬.৫ শতাংশে উন্নীত হয়ে এই ঘাটতি পুরোপুরি পূরণ হবে। পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক

প্রবৃদ্ধি দীর্ঘমেয়াদি গড় হারকে ছাড়িয়ে যাবে। ফলে উৎপাদন ব্যবধান ধনাত্মক হয়ে ২০২৭-২৮ অর্থবছরে +০.৪ শতাংশ পয়েন্ট এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছরে +০.৯ শতাংশ পয়েন্টে পৌঁছাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

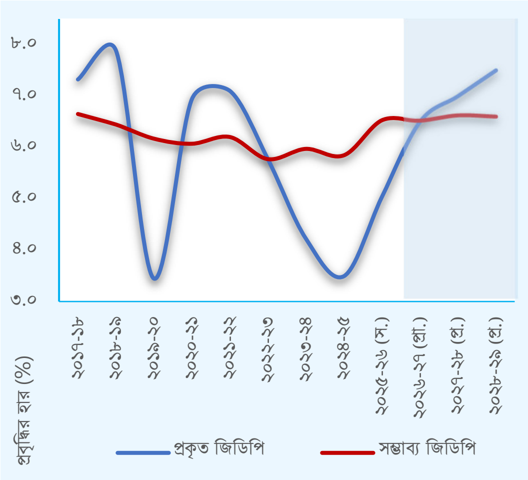

চিত্র ২.৩ প্রকৃত বনাম সম্ভাব্য উৎপাদন (%)

সূত্র: অর্থ বিভাগ ও বিবিএস

সামষ্টিক অর্থনীতির এই গতিপ্রকৃতি বিবেচনায় নিয়েই দেশের রাজস্ব ও মুদ্রানীতি সময় সময় পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ব্যবধান উল্লেখযোগ্যভাবে ঋণাত্মক থাকায় রাজস্ব নীতি একটি প্রবৃদ্ধি-সহায়ক অবস্থান গ্রহণ করবে। এ সময় মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধি, এডিপি সম্প্রসারণ এবং সরকারি বিনিয়োগ বাড়ানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে; যার মূল উদ্দেশ্য হলো অর্থনীতিতে বিদ্যমান মন্দাভাব দূর করা এবং বেসরকারি খাতের কার্যক্রমকে গতিশীল করা। একই সময়ে মূল্যস্ফীতি হ্রাসের ধারা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত মুদ্রানীতিতে নীতি সুদহার ১০ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হবে এবং পরবর্তীতে তা ধীরে ধীরে শিথিল করা হবে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে উৎপাদন ব্যবধান কমে যাওয়ার প্রক্ষেপণের প্রেক্ষিতে মূলধনী ব্যয় সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখতে বাজেট ঘাটতি সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে জিডিপির ৩.৫ শতাংশে উন্নীত হবে। একইসঙ্গে এডিপির আকার জিডিপির ৪.৪ শতাংশে এবং সরকারি বিনিয়োগ ১৩.১ শতাংশে উন্নীত হবে। এ সময় নীতি সুদহার কমিয়ে ৯.৫ শতাংশে আনা হবে এবং বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি পুনরুদ্ধার হয়ে ৯.৪ শতাংশে পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হয়েছে। ২০২৭-২৮ অর্থবছর থেকে উৎপাদন ব্যবধান ধনাত্মক পর্যায়ে প্রবেশ করলে নীতিগত গুরুত্ব ক্রমেই স্থানান্তরিত হবে প্রবৃদ্ধির ঊর্ধ্বমুখী গতি বজায় রাখার দিকে, যাতে পুনরায় মূল্যস্ফীতির চাপ সৃষ্টি না হয়। এ লক্ষ্যে নীতি সুদহার আরও হ্রাস করা হবে এবং এডিপির আকার জিডিপির ৪.৮ শতাংশে উন্নীত করা হবে। পাশাপাশি আর্থিক খাত শক্তিশালীকরণ, বিনিয়োগ পরিবেশ উদারীকরণ এবং মানবসম্পদ উন্নয়নসহ কাঠামোগত সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্ভাব্য উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে, যাতে অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি উৎপাদন সীমা বাস্তব প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সম্প্রসারিত হতে পারে।

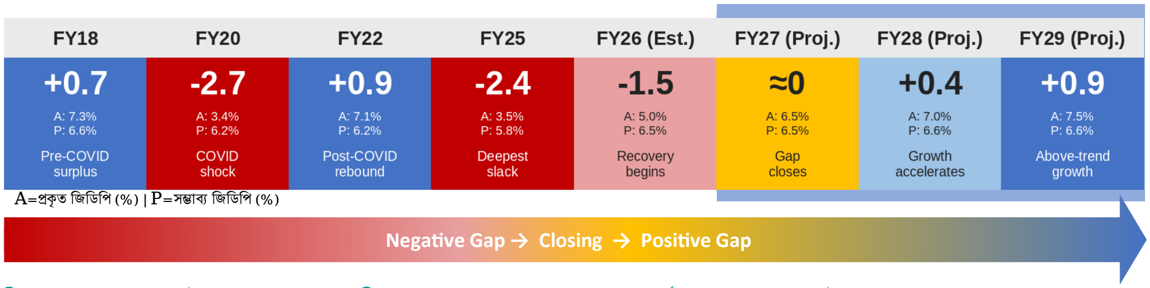

চিত্র ২.৪ এক নজরে উৎপাদন ব্যবধানের গতিপথ: ২০১৭-১৮ থেকে ২০২৮-২৯ অর্থবছর (শতাংশ পয়েন্ট)

সূত্র: অর্থ বিভাগ

২.৩.১.৩ সরবরাহ খাতের প্রবৃদ্ধি দৃশ্যকল্প

বাংলাদেশের সরবরাহভিত্তিক খাতসমূহের প্রবৃদ্ধি তিনটি খাতেই বাড়বে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে, যেখানে শিল্প খাত মধ্যমেয়াদি প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে।

কৃষি: এই খাত ২০২৬-২৭ থেকে ২০২৮-২৯ অর্থবছর মেয়াদে ৪.২ থেকে ৪.৫ শতাংশের মধ্যে স্থিতিশীল হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। নীতিগত সহায়তার মধ্যে রয়েছে উন্নত সার সরবরাহ, সেচে অব্যাহত সরকারি বিনিয়োগ, কৃষক কার্ডের পর্যায়ক্রমিক প্রবর্তন এবং অব্যাহত খাদ্য-নিরাপত্তা ও ফসল-বৈচিত্র্যকরণ উদ্যোগ— এসব নীতিগত সহায়তা গ্রামীণ আয়ের স্থিতিশীলতা ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্যগত গতিশীলতা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হবে।

শিল্প: শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৭.০ শতাংশ, ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ৭.৫ শতাংশ এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছর নাগাদ আনুমানিক ৮.০ শতাংশে উন্নীত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এ প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি হলো—ডিরেগুলেশন, বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাতের প্রবৃদ্ধির স্বাভাবিকীকরণ, দেশীয় উৎপাদন খাতের সম্প্রসারণ, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহের উন্নতি, এবং সরকারি মূলধন ব্যয় বৃদ্ধির ফলে নির্মাণ ও লজিস্টিকস খাতে সৃষ্ট ইতিবাচক প্রভাব।

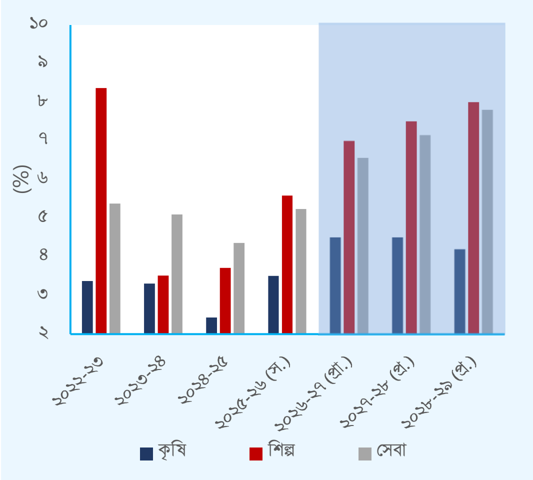

চিত্র ২.৫ সরবরাহ খাতের প্রবৃদ্ধির গতিপ্রকৃতি

সূত্র: অর্থ বিভাগ ও বিবিএস

সেবা: সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৬.৬ শতাংশ, ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ৭.১ শতাংশ এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছর নাগাদ ৭.৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। নতুন বেসরকারি বিনিয়োগ, ঋণ পরিস্থিতির উন্নতির কারণে আর্থিক সেবা খাতের বিকাশ, ডিজিটাল অর্থনীতি, ক্রিয়েটিভ অর্থনীতি এবং বাণিজ্য ও লজিস্টিকস সেবার সম্প্রসারণ এই প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করবে। একই সাথে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পেশাগত সেবার বাড়তি চাহিদাও প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে। সেবা খাতের

উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এবং তা ধরে রাখতে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও ডিজিটাল অবকাঠামোর মান উন্নয়ন করা অত্যন্ত জরুরি।

অর্থনীতির কাঠামোও এ প্রবৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিবর্তিত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষির অবদান ছিল ১০.৯ শতাংশ, যা ২০২৮-২৯ অর্থবছর নাগাদ ১০ শতাংশের নিচে নেমে আসবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। একই সময়ে শিল্প খাতের অংশ ৩৬.২ শতাংশ থেকে ৩৬.৯ শতাংশে সামান্য বৃদ্ধি পাবে, এবং সেবা খাত ৫০ শতাংশের ওপরে স্থিতিশীল থাকবে।

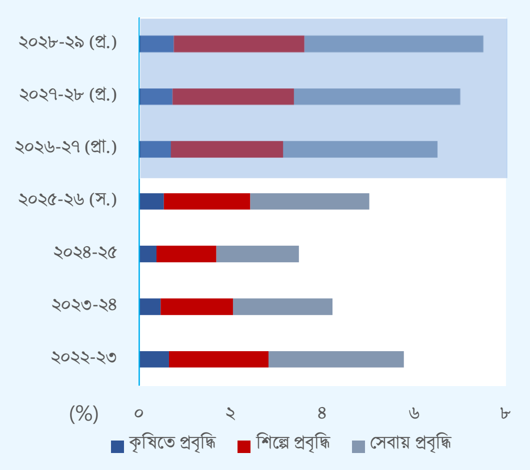

চিত্র ২.৬ প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে সরবরাহ খাতসমূহের অবদান
সূত্র: অর্থ বিভাগ ও বিবিএস

২.৩.১.৪ চাহিদাভিত্তিক খাতসমূহের প্রবৃদ্ধির দৃশ্যকল্প

চাহিদাভিত্তিক খাতসমূহের প্রবৃদ্ধি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ব্যয়ের কাঠামো ধীরে ধীরে ভোগনির্ভর প্রবৃদ্ধি থেকে বিনিয়োগনির্ভর প্রবৃদ্ধির দিকে পরিবর্তিত হচ্ছে। বেসরকারি খাতের ভোগ (Private Consumption) এখনও দেশের প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে বহাল রয়েছে, যা চলতি মূল্যে জিডিপির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে এই খাতের অবদান ২.৫ থেকে ৪.৯ শতাংশীয় পয়েন্ট অবদান রাখছে। রেমিট্যান্স প্রবাহের কারণে ব্যয়যোগ্য আয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বেসরকারি খাতের ভোগ প্রবৃদ্ধি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ২.৫২ শতাংশ থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৪.৩৬ শতাংশে উন্নীত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

মধ্যমেয়াদে সামগ্রিক বিনিয়োগ পরিস্থিতি ঘুরে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে; যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ২৮.৫৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৮-২৯ অর্থবছর নাগাদ জিডিপির ৩৬.৮২ শতাংশে উন্নীত হবে। এর ফলে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে বিনিয়োগের অবদান ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রায় ১.০ শতাংশ পয়েন্ট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৮-২৯ অর্থবছর নাগাদ ২.৮ শতাংশ পয়েন্টে দাঁড়াবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে সরকারি বিনিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য মানবসম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত অগ্রাধিকার খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির মাধ্যমে। সেই অনুযায়ী, প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে সরকারি বিনিয়োগের অবদান ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ০.২৩ শতাংশ পয়েন্ট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৮-২৯ অর্থবছরে ১.১৪ শতাংশ পয়েন্টে উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। পাশাপাশি, মুদ্রানীতির ক্রমান্বয় শিথিলকরণ, সুদের হার স্বাভাবিক হওয়া এবং ব্যবসায়িক পরিবেশের উন্নতি ঘটার সাথে সাথে বেসরকারি বিনিয়োগও পর্যায়ক্রমে শক্তিশালী হবে।

সরকারি বিনিয়োগের জন্য প্রচুর মূলধনী পণ্য আমদানি করতে হবে বিধায় আমদানি প্রবৃদ্ধি রপ্তানির চেয়ে দ্রুতগতিতে বাড়বে। এর ফলে নিট রপ্তানির ওপর চাপ তৈরি হবে, যা প্রতি বছর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে প্রায় ০.৫ থেকে ১.৪ শতাংশ পয়েন্ট কমিয়ে দেবে। ২০২৮-২৯ অর্থবছর নাগাদ ৭.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন অনেকাংশে নির্ভর করবে তিনটি বিষয়ের ওপর—

১. অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেসরকারি বিনিয়োগকে কার্যকরভাবে উৎসাহিত করা,

২. রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং মূলধনী পণ্য তৈরিতে নিজস্ব উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে আমদানি নির্ভরতা কমানো, এবং

৩. প্রকল্প বাস্তবায়নের সক্ষমতা ধাপে ধাপে বাড়ানো হবে, যেন সরকারি বিনিয়োগের সুফল দেশের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধিতে পুরোপুরি কাজে লাগানো যায়।

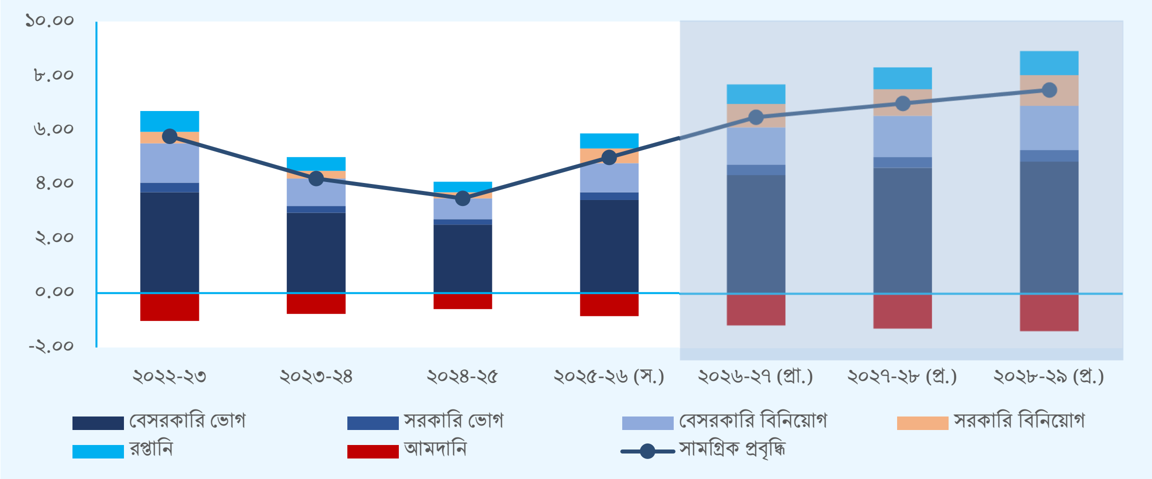

চিত্র ২.৭ চাহিদাভিত্তিক খাতসমূহ ও প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির গতিবিধি

সূত্র: অর্থ বিভাগ ও বিবিএস

২.৩.১.৫ মূল্যস্ফীতির দৃশ্যকল্প

২০২৪ সালের জুলাই মাসে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি সর্বোচ্চ ১১.৭ শতাংশে বৃদ্ধি পায়, যার মধ্যে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ১৪.১ শতাংশ। অবশ্য, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সামগ্রিক বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতির পরিমাণ ছিল ১০.০ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের কিছু অংশে মূল্যস্ফীতি কমে ২০২৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে ৮.৫–৯.১ শতাংশে নেমে আসে। তবে মূল্যস্ফীতি কমার এই প্রবণতা ছিল সাময়িক এবং অসম। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে দাম কমার পরিবর্তে নতুন করে মূল্যস্ফীতির চাপ দেখা যাচ্ছে। ডলারের বাড়তি দাম ও জ্বালানির খরচ সমন্বয়ের কারণে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি এখনও প্রায় ৯ শতাংশের কাছাকাছি স্থানু আছে। এই সমস্যার সমাধান কেবল মুদ্রানীতির মাধ্যমে সম্ভব নয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি শুধু মুদ্রা ও বিনিময় হারজনিত উপাদানের কারণেই ঘটছে না। প্রকৃতপক্ষে, অভ্যন্তরীণ সরবরাহ ব্যবস্থার দুর্বলতা, বাজারে দুর্বল প্রতিযোগিতা এবং পাইকারি ও বিতরণ পর্যায়ে কার্টেল ও সিন্ডিকেটের আধিপত্যের কারণে মূল্যবৃদ্ধির চাপ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের নেওয়া নীতিগত পদক্ষেপগুলোর কার্যকারিতা আংশিকভাবে ব্যাহত হয়েছে।

আগামী বছরগুলোতে মূল্যস্ফীতি ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে, ২০২৬-২৭ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি ৭.৫ শতাংশে, ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ৬.৫ শতাংশে এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছরে ৬.০ শতাংশে নেমে আসবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। তবে, এই পূর্বাভাস কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্তের উপর নির্ভরশীল যথা: নতুন কোনো অভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক সরবরাহজনিত সংকট না থাকা, বিনিময় হার স্থিতিশীল থাকা, মুদ্রানীতির কার্যকর প্রতিফলন ঘটা এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারে বিদ্যমান কাঠামোগত ত্রুটি দূর হওয়া। মধ্যমেয়াদি মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য তাই সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও কাঠামোগত—উভয় পর্যায়ে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এর মধ্যে রয়েছে: ১. মূল্যস্ফীতি স্থায়ীভাবে নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত

সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি অব্যাহত রাখা; ২. বাজার তদারকি জোরদারসহ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং ৩. প্রতিযোগিতা আইনের কঠোর প্রয়োগ, বাজারভিত্তিক তথ্যব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং পরিবহন, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের মাধ্যমে বাজারে কার্টেল, সিন্ডিকেট ও যোগসাজশমূলক মূল্য নির্ধারণের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

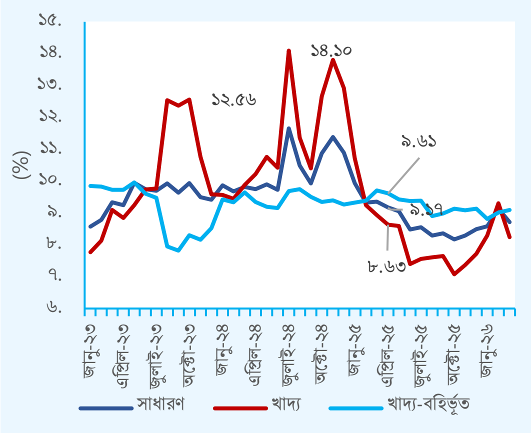

চিত্র ২.৮ সাম্প্রতিক মূল্যস্ফীতির গতিবিধি

সূত্র: বিবিএস

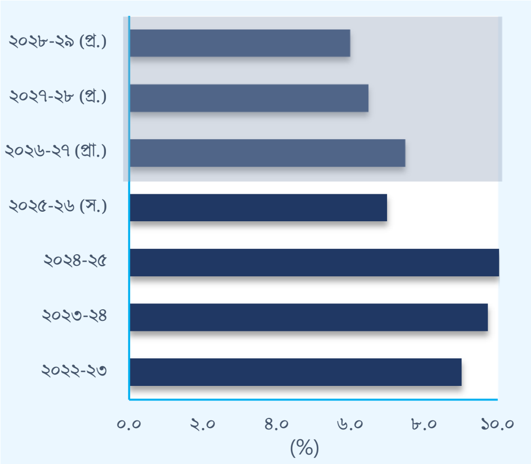

চিত্র ২.৯ বাৎসরিক গড় মূল্যস্ফীতির গতিবিধি

সূত্র: অর্থ বিভাগ ও বিবিএস

২.৩.১.৬ *বিনিয়োগের দৃশ্যকল্প*

কৌশলগত সরকারি বিনিয়োগের মূল লক্ষ্য হলো বেসরকারি পুঁজি গঠনে আস্থা সৃষ্টি ও তা উৎসাহিত করা। পাশাপাশি, মধ্যমেয়াদে প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে বেসরকারি বিনিয়োগের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করাও এর অন্যতম লক্ষ্য। সরকারি বিনিয়োগ ২০২৪–২৫ অর্থবছরের জিডিপির ৬.৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৬–২৭ অর্থবছরে ১৩.১ শতাংশ, ২০২৭–২৮ অর্থবছরে ১৪.০ শতাংশ, এবং ২০২৮–২৯ অর্থবছর নাগাদ ১৫.২ শতাংশে উন্নীত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এ বিনিয়োগের মূল লক্ষ্য হলো পরিবহন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, ডিজিটাল সংযোগ এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন—এই গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোর কাঠামোগত বাধা দূর করা।

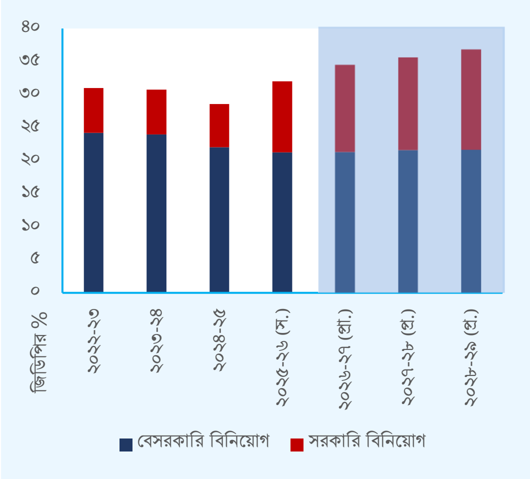

চিত্র ২.১০ জিডিপিতে বিনিয়োগের অবদানের গতিবিধি

সূত্র: অর্থ বিভাগ ও বিবিএস

একই সময়ে, মোট মূলধন গঠনে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ জিডিপির প্রায় ২২ শতাংশ নিয়ে সবচেয়ে বড় অবদান বজায় রাখবে বলে প্রক্ষেপণ করা হচ্ছে। সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে স্বল্পমেয়াদে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গতিশীল হবে বলে আশা করা হলেও, দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই প্রবৃদ্ধি মূলত বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধির ওপরই নির্ভর করছে। এর ফলে মোট

বিনিয়োগ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপির ২৮.৫৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৮-২৯ অর্থবছর নাগাদ ৩৬.৮২ শতাংশে উন্নীত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

এই রূপান্তরকে সহায়তা করতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করছে, যার মধ্যে রয়েছে: ১. বিভিন্ন খাতে নিয়ন্ত্রণ শিথিলকরণ, তথা- বিনিয়ন্ত্রণকরণ বা ডিরেগুলেশন, যার আওতায় বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-কে কেন্দ্র করে বিনিয়োগ সহায়ক সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ; ২. সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) কাঠামো শক্তিশালীকরণ এবং প্রকল্প পাইপলাইন সম্প্রসারণ; ৩. ঋণের ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে ২০২৬-২৭ অর্থবছর থেকে মুদ্রানীতি পর্যায়ক্রমে শিথিল করা; এবং ৪. ঋণ মধ্যস্থতা ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার ও পুঁজিবাজারের কার্যকারিতা উন্নয়নের লক্ষ্যে আর্থিক খাত সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

মূলধনি ব্যয়ে প্রক্ষেপিত এই বৃদ্ধির কার্যকারিতা অনেকাংশে সরকারি খাতের প্রকল্প বাস্তবায়ন সক্ষমতা জোরদার এবং প্রকল্পের গুণগত মান নিশ্চিত করার ওপর নির্ভর করবে। সরকারি বিনিয়োগের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে প্রকল্প মূল্যায়ন, ক্রয় প্রক্রিয়া, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার সার্বিক উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটে, বিদ্যমান প্রকল্পসমূহের একটি সমন্বিত পর্যালোচনা, প্রকল্পের ধারাবাহিক ব্যয় বৃদ্ধি হ্রাস করা এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো শক্তিশালী করা সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

২.৩.১.৭ সঞ্চয়ের দৃশ্যকল্প

উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে মানুষের প্রকৃত আয় কমে যাওয়ায় মোট দেশজ সঞ্চয় ২০২২-২৩ অর্থবছরের ২৫.৭৬ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২১.৯৮ শতাংশে নেমে এসেছে। তবে পরবর্তী সময়ে দেশজ সঞ্চয় পরিস্থিতি ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে, দেশজ সঞ্চয় ২০২৬-২৭ অর্থবছরে জিডিপির ২৭.১ শতাংশে এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছর নাগাদ প্রায় ২৯.৬ শতাংশে উন্নীত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, প্রবাসী আয়ের শক্তিশালী প্রবৃদ্ধির কারণে মোট জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপির ২৭.৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৮-২৯ অর্থবছরে ৩৬.২ শতাংশে দাঁড়াবে। জাতীয় ও দেশজ সঞ্চয়ের মধ্যে ৫-৭ শতাংশ পয়েন্টের এই বড় পার্থক্য দেশের ভেতরের বিনিয়োগের ঘাটতি মেটাতে এবং বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য বজায় রাখতে প্রবাসী আয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে নির্দেশ করে।

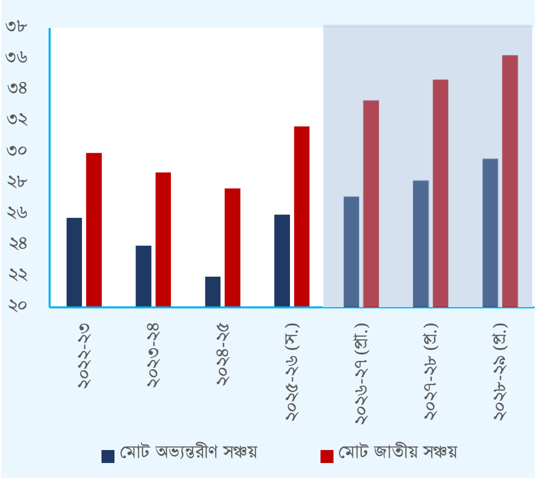

চিত্র ২.১১ জিডিপিতে সঞ্চয়ের অবদানের গতিবিধি (%)
সূত্র: অর্থ বিভাগ ও বিবিএস

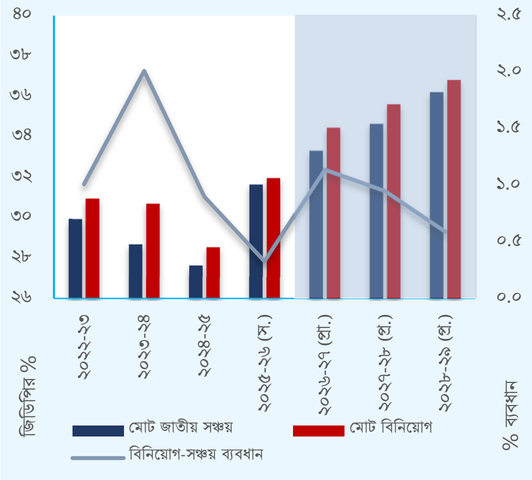

চিত্র ২.১২ সঞ্চয়-বিনিয়োগ ব্যবধান

সূত্র: অর্থ বিভাগ ও বিবিএস

বিনিয়োগ পুনরুদ্ধারের প্রক্ষেপণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সঞ্চয়-বিনিয়োগ ব্যবধান ২০২৬-২৭ অর্থবছরে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ১.১ শতাংশ পয়েন্টে উন্নীত হতে পারে। তবে পরবর্তীকালে তা ধীরে ধীরে কমে ২০২৮-২৯ অর্থবছরে ০.৬ শতাংশ পয়েন্টে নেমে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মধ্যমেয়াদে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ—উভয়ই জিডিপির প্রায় ৩৬ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে, যা সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যের উন্নয়ন এবং বৈদেশিক অর্থায়নের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের ইঙ্গিত বহন করে।

২.৩.১.৮ কর্মসংস্থান

বাংলাদেশের কর্মসংস্থান কাঠামোতে তিনটি দীর্ঘস্থায়ী চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত হয়, যার সরাসরি নীতিগত প্রভাব রয়েছে। এগুলো হলো— খাতভিত্তিক উৎপাদনশীলতায় বিশাল ব্যবধান, শ্রমশক্তির কাঠামোগত রূপান্তরে ধীরগতি, এবং লিঙ্গ ও গ্রাম-শহরভিত্তিক উল্লেখযোগ্য বৈষম্য। পাশাপাশি, উচ্চশিক্ষিত তরুণ জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ এখনও বেকার রয়েছে; বস্তুত এই শ্রেণিতে বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি।

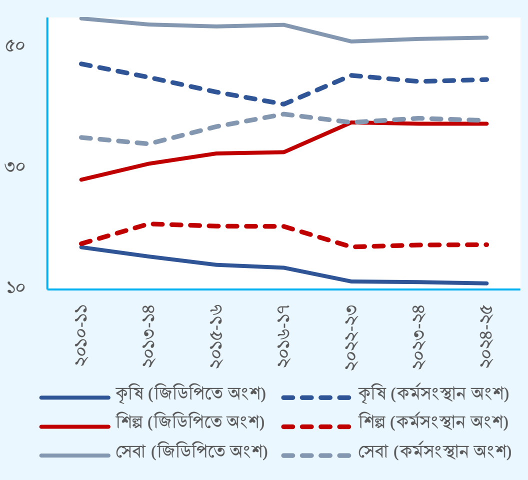

চিত্র ২.১৩ কর্মসংস্থানে খাতভিত্তিক অংশ বনাম জিডিপিতে খাতভিত্তিক অংশ (%)

সূত্র: বিবিএস

খাতভিত্তিক কর্মসংস্থানের কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কৃষিখাতে মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৪৪.৫ শতাংশ নিয়োজিত থাকলেও জিডিপিতে এ খাতের অবদান মাত্র প্রায় ১১ শতাংশ, যা একটি বড় উৎপাদনশীলতার ঘাটতি নির্দেশ করে। অন্যদিকে, জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ৩৭.৫ শতাংশ হলেও এ খাতে মাত্র ১৭.৫ শতাংশ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। পাশাপাশি, সেবাখাত মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৩৮ শতাংশ ধারণ করছে এবং জিডিপির অর্ধেকেরও বেশি অবদান রাখছে।

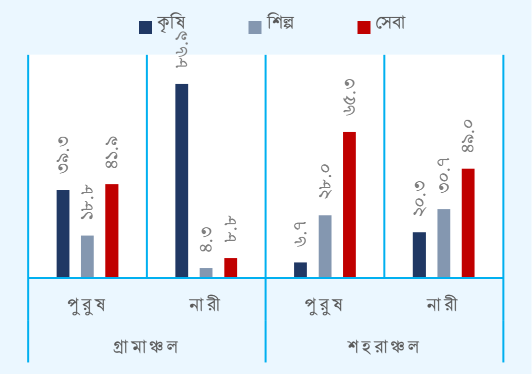

চিত্র ২.১৪ লিঙ্গ ও অবস্থানভেদে কর্মসংস্থানের গতিধারা (পরিসংখ্যান শতাংশে)

সূত্র: বিবিএস

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কৃষি খাত থেকে শিল্প ও সেবা খাতে শ্রমশক্তির স্থানান্তরের দীর্ঘমেয়াদি প্রবণতা দুর্বল হয়ে পড়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কৃষিতে কর্মসংস্থানের হার ৪০.৫ শতাংশে নেমে এলেও, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তা আবার বেড়ে ৪৪.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে শিল্প খাতের উৎপাদনে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও কর্মসংস্থানে এ খাতের অংশ কমেছে। কর্মসংস্থানের ধরণও অনেকাংশে লিঙ্গভিত্তিক: কৃষি খাতে মোট নিয়োজিত শ্রমশক্তির ৭২ শতাংশই নারী, অন্যদিকে শিল্প (৭১ শতাংশ) ও সেবা (৭৬ শতাংশ) খাতে পুরুষদের আধিপত্য দেখা যায়। গ্রামীণ নারীরা মূলত কৃষি খাতেই ব্যাপকভাবে কেন্দ্রীভূত, অন্যদিকে শহরের নারীরা সেবা ও শিল্প খাতে বেশি নিয়োজিত—যা মূলত গ্রামীণ নারীদের জন্য কৃষি-বহির্ভূত কর্মসংস্থানের সীমিত সুযোগের বিষয়টিই তুলে ধরে।

এসব বিষয় বিবেচনা করে উৎপাদনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা জরুরি: ১. কৃষি-প্রক্রিয়াজাতকরণ, হালকা প্রকৌশল (Light Engineering), চামড়া, আইসিটি-নির্ভর সেবা এবং পর্যটন খাতে শিল্পায়ন; ২. শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে লক্ষ্যভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার (TVET) প্রসার; ৩. নারীদের জন্য বিভিন্ন খাতে প্রবেশের বাধা দূরীকরণ এবং নারী-পরিচালিত উদ্যোগগুলোকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা প্রদান; ৪. গ্রামীণ উদ্যোগের বিকাশ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কৃষি-বহির্ভূত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; ৫. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল (NHRDF) এবং স্কিলস ফর ইন্ডাস্ট্রি কম্পিটিটিভনেস অ্যান্ড ইনোভেশন প্রোগ্রাম (SICIP)-এর মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও দক্ষ অভিবাসন সুযোগ তৈরির জন্য সহায়তা বৃদ্ধি; এবং ৬. পর্যটন, হেরিটেজ, ডিজিটাল কনটেন্ট, ডিজাইন, মিডিয়া, আর্ট, সিনেমা, থিয়েটার ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক শিল্পসহ ক্রিয়েটিভ অর্থনীতির বিকাশের মাধ্যমে তরুণ ও নারীদের জন্য উচ্চ আয়ের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

তাছাড়া এটিও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই অধ্যায়ে উপস্থাপিত মোট রাজস্বের হিসাবের মধ্যে অনুদানও (Grants) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২.৩.১.৯ উন্নয়ন সহযোগীদের প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতি সংক্রান্ত পূর্বাভাস

আর্থিক খাতের দুর্বলতা, মূল্যস্ফীতির একটানা চাপ এবং বেসরকারি বিনিয়োগের কাঠামোগত বাধার কারণে বহুপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ (যেমন—আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক) বাংলাদেশের মধ্যমেয়াদি অর্থনৈতিক গতিপথের বিষয়ে সরকারের মূল প্রাক্কলনের তুলনায় কিছুটা সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। সরকারের সংশোধিত প্রাক্কলনের বিপরীতে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ করেছে ৪.৭ শতাংশ; অন্যদিকে বিশ্বব্যাংক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এ প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ করেছে যথাক্রমে ৩.৯ শতাংশ এবং ৪.০ শতাংশ (আইএমএফ, ২০২৬; এডিবি, ২০২৬ ও বিশ্ব ব্যাংক, ২০২৬ক)। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য উন্নয়ন সহযোগীদের প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ ৪.৩ শতাংশ থেকে ৪.৭ শতাংশের মধ্যে রয়েছে, যা সরকারের ৬.৫ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম।

পাশাপাশি, মধ্যমেয়াদে মূল্যস্ফীতি হ্রাসের গতিপথও ধীর হবে বলে উন্নয়ন সহযোগীরা প্রক্ষেপণ করেছে। আইএমএফ-এর প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি ৯.২ শতাংশ হবে, যা কমে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৬.০ শতাংশে দাঁড়াবে (আইএমএফ, ২০২৬)। বিশ্বব্যাংকের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, মূল্যস্ফীতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৮.৬ শতাংশ এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৭.৫ শতাংশ হবে (বিশ্ব ব্যাংক, ২০২৬ক)। অন্যদিকে, এডিবি-র প্রক্ষেপণ অনুযায়ী এ হার হবে যথাক্রমে ৯.০ শতাংশ এবং ৮.৫ শতাংশ (এডিবি, ২০২৬)। এসব প্রক্ষেপণ

সরকারের ২০২৬-২৭ অর্থবছরের ৭.৫ শতাংশ মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশি। একইসঙ্গে, মূল্য স্থিতিশীলতা ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক সহনশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে উপযুক্ত মাত্রায় সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি অব্যাহত রাখা এবং লক্ষ্যভিত্তিক সরবরাহব্যবস্থা সংক্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

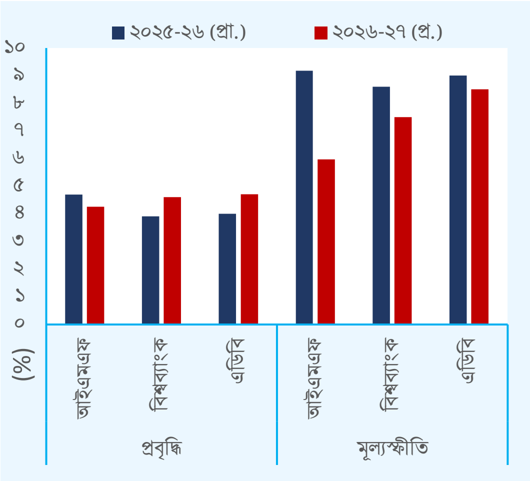

চিত্র ২.১৫ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাস

সূত্র: আইএমএফ, এডিবি ও বিশ্বব্যাংক

২.৩.২ রাজস্ব খাত[২]

২.৩.২.১ রাজস্ব আহরণের দৃশ্যকল্প

মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সফল করতে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি করা সামষ্টিক অর্থনীতির সবচেয়ে প্রধান চ্যালেঞ্জ এবং একটি জরুরি পূর্বশর্ত। মোট রাজস্ব ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জিডিপির ৮.৩ শতাংশ থেকে কমে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৮.০ শতাংশে নেমে এসেছে, যা সমপর্যায়ের অর্থনীতিগুলোর তুলনায় অন্যতম সর্বনিম্ন রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত। রাজস্ব আহরণে দুর্বলতা, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ওপর কর অব্যাহতি এবং আমদানি-সংশ্লিষ্ট রাজস্ব প্রাপ্তি হ্রাস পাওয়া মূলত এ রাজস্ব আয় হ্রাসের প্রধান কারণ।

তবে মধ্যমেয়াদে রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ১০.২ শতাংশ, ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ১০.৫ শতাংশ এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছরে ১০.৭ শতাংশে উন্নীত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। একই সময়ে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর রাজস্ব ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপির ৬.৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৮.৮ শতাংশ, ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ৯.১ শতাংশ এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছরে ৯.৩ শতাংশে পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

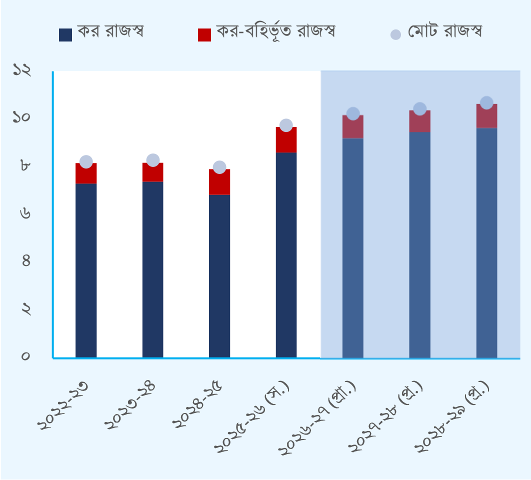

চিত্র ২.১৬ জিডিপিতে রাজস্ব আয়ের অবদানের গতিবিধি (%)

সূত্র: অর্থ বিভাগ

অন্যদিকে, এনবিআর-বহির্ভূত কর রাজস্ব জিডিপির প্রায় ০.৩ থেকে ০.৪ শতাংশে সীমিত থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। একইসঙ্গে, কর-বহির্ভূত রাজস্ব জিডিপির

[২] পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে রাজস্ব আহরণ এবং সরকারি ব্যয়ের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করায়, এই পরিচ্ছেদে কেবল রাজস্ব, ব্যয়, বাজেট ঘাটতি এবং অর্থায়নের মধ্যমেয়াদি প্রবণতাসহ রাজস্ব খাতের রূপরেখার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়াও, এটি উল্লেখ প্রয়োজন যে, এই অধ্যায়ে উপস্থাপিত মোট রাজস্বের হিসাবের মধ্যে অনুদানও (Grants) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

প্রায় ১ শতাংশে মোটামুটি স্থিতিশীল থাকবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এ পরিস্থিতি রাজস্ব প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে কর পরিপালন (Tax Compliance) নিশ্চিত করা, প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং করের আওতা সম্প্রসারণের গুরুত্বকে বিশেষভাবে তুলে ধরে।

এসব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারমূলক উদ্যোগগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন প্রয়োজন, যার মধ্যে নিচের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত (তবে তা শুধু এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়): ১. ২০২৫-২৬ হতে ২০৩৪-৩৫ অর্থবছরের জন্য মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি রাজস্ব কৌশল (MLTRS) বাস্তবায়ন; ২. কর নীতি প্রণয়ন এবং কর প্রশাসন কার্যক্রমের চলমান পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া; ৩. এ-চালান, ই-টিডিএস, আইভাস (IVAS) এবং বিএসডব্লিউ (BSW)-সহ কর দাখিল, পরিশোধ ও সমন্বিত ব্যবস্থার ডিজিটালাইজেশন ত্বরান্বিতকরণ; ৪. কর ব্যয় নীতি ও ব্যবস্থাপনা কাঠামোর (TEPMF) আওতায় কর ব্যয় যৌক্তিকীকরণ; এবং ৫. অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে অধিকতর অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে করের আওতা পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণ। তবে, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব আদায় না হওয়া এবং লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত আহরণের মধ্যকার ধারাবাহিক ব্যবধান মধ্যমেয়াদি রাজস্ব কাঠামোর জন্য একটি অন্যতম প্রধান ঝুঁকি।

২.৩.২.২ সরকারি ব্যয়ের দৃশ্যকল্প

সরকারি ব্যয় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপির ১১.৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ১৩.৭ শতাংশ, ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ১৩.৯ শতাংশ এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছরে ১৪.৪ শতাংশে উন্নীত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এটি মূলত পরিচালন ব্যয়ের ক্ষেত্রে সংযত অবস্থান বজায় রেখে উন্নয়ন ব্যয় সম্প্রসারণে সরকারের নীতিগত গুরুত্বারোপের প্রতিফলন।

ব্যয় কাঠামোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনটি পরিলক্ষিত হবে ব্যয়ের খাতভিত্তিক বিন্যাসে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মূলধনি ব্যয় ছিল জিডিপির ৩.১ শতাংশ, যা ২০২৮-২৯ অর্থবছরে বেড়ে ৬.৪ শতাংশ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। গত এক দশকের মধ্যে মূলধনি ব্যয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এটিই সবচেয়ে দ্রুততম প্রবৃদ্ধি। অন্যদিকে, একই সময়ে পরিচালন ব্যয় জিডিপির ৮.৪ শতাংশ থেকে কমে ৮.০ শতাংশে নেমে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যা মূলত পরিচালন ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারের কৃচ্ছ্রসাধন বা ব্যয় সংকোচনের প্রতিফলন। একইসঙ্গে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আকার ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপির ২.৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৪.৪ শতাংশ, ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ৪.৮ শতাংশ এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছরে ৫.৩ শতাংশে উন্নীত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

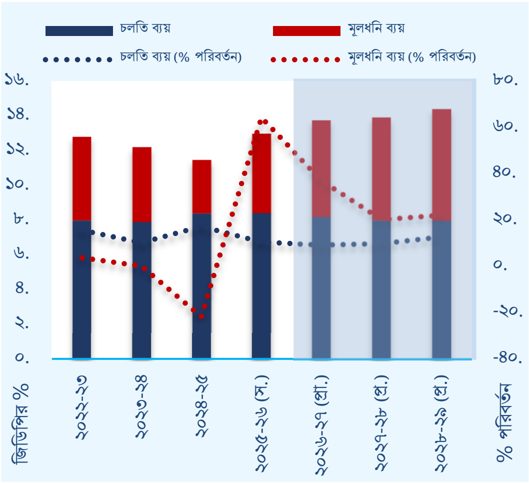

চিত্র ২.১৭ জিডিপিতে সরকারি ব্যয়ের গতিবিধি

সূত্র: অর্থ বিভাগ

তবে, এই উন্নয়ন ব্যয় সম্প্রসারণের কার্যকারিতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা অনেকাংশে বাস্তবায়ন সক্ষমতা জোরদারের ওপর নির্ভর করবে। এ প্রেক্ষাপটে, শক্তিশালী সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা, সরকারি ক্রয় ব্যবস্থার সংস্কার ত্বরান্বিত করা, চলমান প্রকল্পসমূহের সমন্বিত পর্যালোচনার মাধ্যমে ব্যয় বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো আরও শক্তিশালী করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগ সম্প্রসারণের

পাশাপাশি বিনিয়োগের গুণগত মান ও দক্ষতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

২.৩.২.৩ বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়নের দৃশ্যকল্প

সামগ্রিক বাজেট ঘাটতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপির ৪.৬ শতাংশ থেকে হ্রাস পাওয়ার পর মধ্যমেয়াদে তা সতর্কতামূলক সীমার মধ্যে রাখা হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে, বাজেট ঘাটতি ২০২৬-২৭ এবং ২০২৭-২৮ অর্থবছরে জিডিপির ৩.৫ শতাংশ এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছরে ৩.৭ শতাংশে অবস্থান করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। একই সময়ে, প্রাথমিক ঘাটতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরে জিডিপির প্রায় ১.৬ শতাংশে থাকবে এবং পরবর্তীকালে তা সামান্য হ্রাস পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদ জুড়ে সরকারি ঋণ জিডিপির প্রায় ৩৮ শতাংশে স্থিতিশীল থাকবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে, যা ঋণের টেকসই অবস্থার (Debt Sustainability) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকার ইঙ্গিত বহন করে।

অর্থায়ন কৌশল: বর্ধিত উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়নে সহায়তার লক্ষ্যে বৈদেশিক নিট অর্থায়ন ২০২৬-২৭ অর্থবছরে জিডিপির প্রায় ১.৬২ শতাংশে উন্নীত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে তা সামান্য কমে ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ১.৫৪ শতাংশ এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছরে ১.৫৭ শতাংশে অবস্থান করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অন্যদিকে, অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন ২০২৬-২৭ অর্থবছরে কমে জিডিপির ১.৯৬ শতাংশে নেমে আসবে এবং পরবর্তী সময়ে প্রায় ১.৯ থেকে ২.১ শতাংশের মধ্যে স্থিতিশীল থাকবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এর ফলে বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহের ওপর বর্তমান 'ক্রাউডিং-আউট' চাপ হ্রাস পাবে। তবে বৈদেশিক ঋণের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা ভবিষ্যতে ঋণ পরিশোধের চাপ এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারজনিত ঝুঁকি বাড়িয়ে দেবে। এই ঝুঁকি এড়াতে বিচক্ষণতার সাথে ঋণ গ্রহণ, রিজার্ভে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার মিশ্রণ (Currency Mix) বজায় রাখা এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শক্তিশালী করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

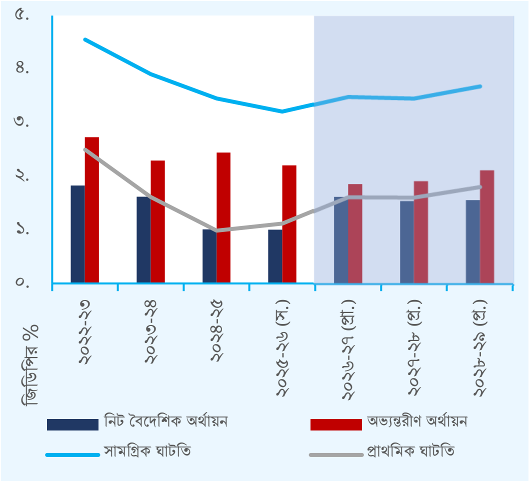

চিত্র ২.১৮ বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়নের গতিবিধি (%)

সূত্র: অর্থ বিভাগ

অভ্যন্তরীণ অর্থায়নের ক্ষেত্রে, অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে ঋণ গ্রহণ ২০২৬-২৭ অর্থবছরে জিডিপির প্রায় ১.৬ শতাংশে সীমিত থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ফলে বাজারভিত্তিক সুদহার বা মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় জাতীয় সঞ্চয়পত্রসহ খুচরা অর্থায়ন পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে জাতীয় সঞ্চয়পত্রের সুদহারকে বাজারভিত্তিক ট্রেজারি বন্ডের সুদহারের সঙ্গে সমন্বয় করার ফলে বাজারের বিদ্যমান ভারসাম্যহীনতা হ্রাস পাবে এবং পারিবারিক সঞ্চয়ের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

২.৩.৩ মুদ্রা খাত

২.৩.৩.১ মুদ্রা নীতি ও সুদহার

বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২৫-২৬ অর্থবছরজুড়ে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বজায় রেখেছে এবং নীতি সুদহার ১০ শতাংশে অপরিবর্তিত রেখেছে (বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০২৬)। এর পাশাপাশি স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (SLF) ১১.৫ শতাংশ এবং সম্প্রতি স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (SDF) কমিয়ে ৭.৫ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নীতি সুদহারকে কেন্দ্রে

রেখে একটি নির্দিষ্ট ব্যবধানে সুদহার করিডোর তৈরি করা হয়েছে, যা আন্তঃব্যাংক কল মানি মার্কেটের সুদের হারের উর্ধ্বসীমা ও নিম্নসীমা হিসেবে কাজ করবে। এই সময়ে কল মানি রেট ৯.৭ থেকে ১০.১ শতাংশের ঘরেই ওঠানামা করেছে। তাছাড়া ২০২৫-২৬ অর্থবছরের মাঝামাঝি সময়ে ব্যাংক ঋণের গড় সুদহার প্রায় ১২.০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা প্রমাণ করে যে বাজারে মুদ্রানীতির প্রভাব সফলভাবে কার্যকর হচ্ছে। তবে আমানতের সুদহারে এই সঞ্চালন এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। ঋণ ও আমানতের সুদহারের মধ্যে এই উচ্চ ব্যবধান মূলত ব্যাংকগুলোর আর্থিক মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ার উচ্চ ব্যয় এবং খেলাপি ঋণের জন্য প্রভিশন সংরক্ষণের চাপের প্রতিফলন।

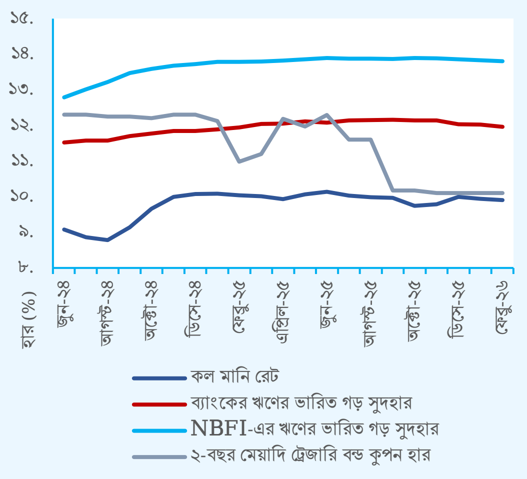

চিত্র ২.১৯ বিভিন্ন সুদহার (%)

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

অভ্যন্তরীণ ঝুঁকিমুক্ত বেঞ্চমার্কের একটি উদাহরণ হিসেবে ২-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের কুপন রেট ২০২৪-২৫ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মূলত ১০ থেকে ১২ শতাংশের মধ্যে অবস্থান করছে, যা সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি এবং উচ্চ মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সরকারি সিকিউরিটিজের আয়ের হার (Yield) পরিবর্তনের ফলে পুরো আর্থিক খাতে সুদের হারের সুসমন্বয় সহজ হয়েছে। এর প্রভাব যেমন ব্যাংকের আমানত ও ঋণের সুদের হারে দেখা গেছে, তেমনি বেসরকারি খাতের সামগ্রিক ঋণ নেওয়ার খরচও প্রভাবিত হয়েছে।

২০২৩ সালের জুলাই মাসে 'মানিটারি এগ্রিগেট টার্গেটিং'-এর পরিবর্তে 'ইন্টারেস্ট-রেট টার্গেটিং' বা সুদহারভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে মুদ্রানীতির কাঠামোতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হয়, যা ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আরও সুসংহত হয়েছে। এই পদক্ষেপ মুদ্রানীতি সঞ্চালনের পূর্বাভাসযোগ্যতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করেছে, নীতি কাঠামোকে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছে এবং নীতি সুদহারের সংকেতমূলক কার্যকারিতা জোরদার হয়েছে। একইসঙ্গে, আমানত সুদহারের উর্ধ্বসীমা প্রত্যাহারের ফলে খুচরা আমানত সংগ্রহে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পারিবারিক সঞ্চয়ের প্রকৃত মুনাফা ধীরে ধীরে বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ভবিষ্যৎ রূপরেখা: মধ্যপ্রাচ্যে বিরাজমান অস্থিতিশীলতা এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য বিবেচনায় নিয়ে স্বল্পমেয়াদে নীতি সুদহার ১০ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হবে। অবশ্য বাজার পরিস্থিতির উন্নতি সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে মুদ্রানীতি সহজ করা হবে। এতে ঋণের সুদের হার বা ব্যয় কমে আসবে, যা বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে বড় ধরণের নীতিগত সহায়তা দেবে।

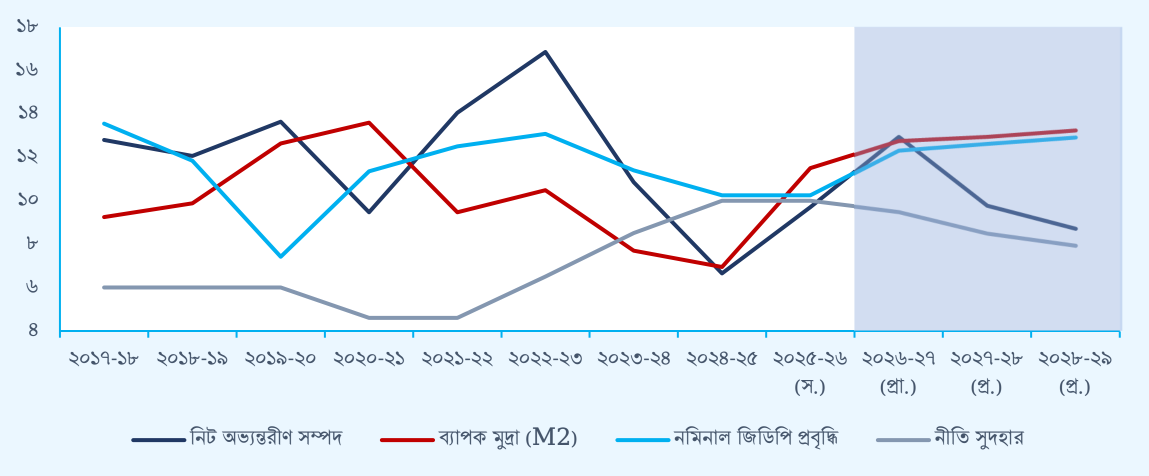

চিত্র ২.২০ মুদ্রা খাতের গতি-প্রকৃতি (% পরিবর্তন)

সূত্র: অর্থ বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংক

আর্থিক খাত সংক্রান্ত অগ্রাধিকার: মধ্যমেয়াদি কাঠামো অনুযায়ী, মূল্যস্ফীতি ধীরে ধীরে ৬ শতাংশের দিকে নেমে আসবে এবং এর সাথে বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রায় ৯ থেকে ১০ শতাংশে পৌঁছাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। তবে এই লক্ষ্য অর্জনে কেবল নীতি সুদহার কমানোই যথেষ্ট হবে না, বরং অন্যান্য পদক্ষেপও নিতে হবে। কারণ ব্যাংকিং খাতের কাঠামোগত দুর্বলতা এখনও মুদ্রানীতির সফল বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। উচ্চ খেলাপি ঋণ, দুর্বল মূলধন ভিত্তি এবং সুশাসন ঘাটতির কারণে ব্যাংকগুলোর নতুন ঋণ প্রদানের সক্ষমতা ও আগ্রহ কমে গেছে, যা একইসঙ্গে ঋণ ও আমানতের সুদহারের ব্যবধান বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

ভবিষ্যতে মুদ্রানীতি সফলভাবে শিথিল করা এবং ব্যাংক ও আর্থিক খাতের ঋণ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এই দুর্বলতাগুলো দূর করা অপরিহার্য। এ প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষায়িত টাস্কফোর্সের সহায়তায় আর্থিক খাতে একটি বিস্তৃত সংস্কার কর্মসূচি শুরু করেছে। এ কর্মসূচির আওতায় প্রধান পদক্ষেপসমূহের মধ্যে রয়েছে: ১. দুর্বল আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পদের প্রকৃত মান যাচাই বা পর্যালোচনা করা (Asset Quality Reviews); ২. মূলধন ঘাটতিতে থাকা ব্যাংকগুলোর জন্য নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক মূলধন পুনর্গঠন পরিকল্পনা তৈরি; ৩. ব্যাংকিং খাতের নজরদারি, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং সুশাসন কাঠামো শক্তিশালী করা; ৪. খেলাপি ঋণ বা সম্পদ আদায়ের লক্ষ্যে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার উন্নয়ন; এবং ৫. লোকসানি বা অকার্যকর ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান একীভূতকরণ (Merger) বা অধিগ্রহণের একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো তৈরি।

২.৩.৩.২ ব্যাপক মুদ্রার (M2) প্রবৃদ্ধি

ব্যাপক মুদ্রা (M2)-এর প্রবৃদ্ধি ২০২২-২৩ অর্থবছরের ১০.৫ শতাংশ থেকে কমে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৬.৯৫ শতাংশে নেমে এসেছে। এর ফলে জিডিপির অংশ হিসেবে ব্যাপক মুদ্রা ৪৪ শতাংশ থেকে ৩৯-৪০ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। এই চিত্র প্রমাণ করে যে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি সফলভাবে কার্যকর হচ্ছে। পাশাপাশি, নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধি ১৬.৯ শতাংশ থেকে কমে ৬.৭ শতাংশে নেমে এসেছে, যার ফলে অর্থনীতিতে অতিরিক্ত তারল্য নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

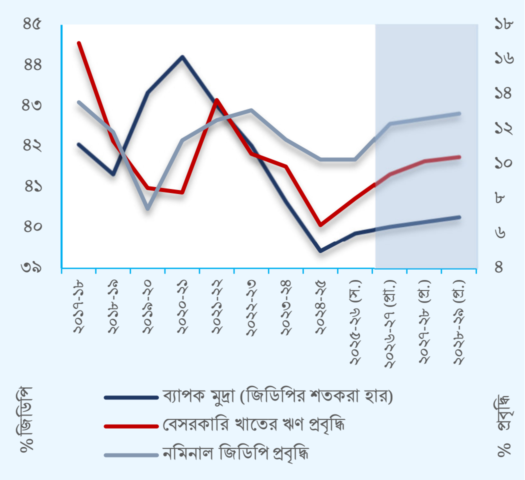

চিত্র ২.২১ ব্যাপক মুদ্রা, বেসরকারি খাতের ঋণ ও নমিনাল জিডিপির প্রবৃদ্ধির গতিবিধি

সূত্র: অর্থ বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংক

মধ্যমেয়াদে মোট মুদ্রা সরবরাহ ক্রমান্বয়ে আবার বাড়তে শুরু করবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে, যা সামগ্রিকভাবে দেশের চলতি মূল্যে জিডিপির হারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখা হবে। ২০২৬-২৭ অর্থবছর থেকে ব্যাপক মুদ্রা এবং চলতি মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধি একটি অভিন্ন ধারায় পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা মুদ্রাবাজারে পুনরায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত বহন করে। অবশ্য নতুন করে মূল্যস্ফীতি যেন না বাড়ে, তা নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য মূল্যস্ফীতি কমে আসার হারের সাথে মিল রেখে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মুদ্রানীতি শিথিল করা দরকার।

বেসরকারি খাতের ঋণপ্রবাহ দেখে মূলত নতুন বিনিয়োগের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। এই ঋণ প্রবৃদ্ধি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কমে মাত্র ৬.৫ শতাংশ হয়েছে, যা গত কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম। অবশ্য মুদ্রানীতি শিথিল করা এবং ব্যবসায়িক পরিবেশের উন্নতি ঘটায় বেসরকারি খাতের ঋণপ্রবাহ আবার বাড়তে শুরু করবে। ফলে বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবৃদ্ধি ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৯.৪ শতাংশ, ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ১০.২ শতাংশ এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছরে ১০.৪ শতাংশে উন্নীত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

২০১৭-১৮ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত ঋণ প্রবৃদ্ধি এবং উৎপাদন প্রবৃদ্ধির মধ্যে উচ্চমাত্রার সমন্বয় পরিলক্ষিত হলেও, মধ্যমেয়াদে নমিনাল জিডিপি প্রবৃদ্ধি ধারাবাহিকভাবে ঋণ প্রবৃদ্ধির তুলনায় এগিয়ে থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এমন ইতিবাচক প্রবণতা একটি টেকসই আর্থিক কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর ফলে ঋণপ্রবাহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে গতিশীল করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিলেও, তা মোট উৎপাদনের হারকে ছাড়িয়ে যাবে না।

২.৩.৩.৩ পুঁজিবাজার ও আর্থিক মধ্যস্থতার গতিধারা

একটি গভীর, গতিশীল ও কার্যকর পুঁজিবাজার গড়ে তোলা সরকারের অন্যতম নীতিগত অগ্রাধিকার, যার লক্ষ্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন ও আর্থিক মধ্যস্থতার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে পুঁজিবাজারকে প্রতিষ্ঠিত করা। এ লক্ষ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সামগ্রিক সংস্কার ও উন্নয়নে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বেশ কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলশ্রুতিতে, তথ্য প্রকাশের স্বচ্ছতা ও কর্পোরেট সুশাসন বৃদ্ধির পাশাপাশি বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা আরও সুসংহত হয়েছে।

মধ্যমেয়াদে মুদ্রানীতি পর্যায়ক্রমে শিথিল হওয়ার পাশাপাশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কর্পোরেট খাতের মুনাফা পুনরুদ্ধার হলে, পুঁজিবাজারে দেশি ও বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এটি ব্যাংকভিত্তিক আর্থিক মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিপূরক হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

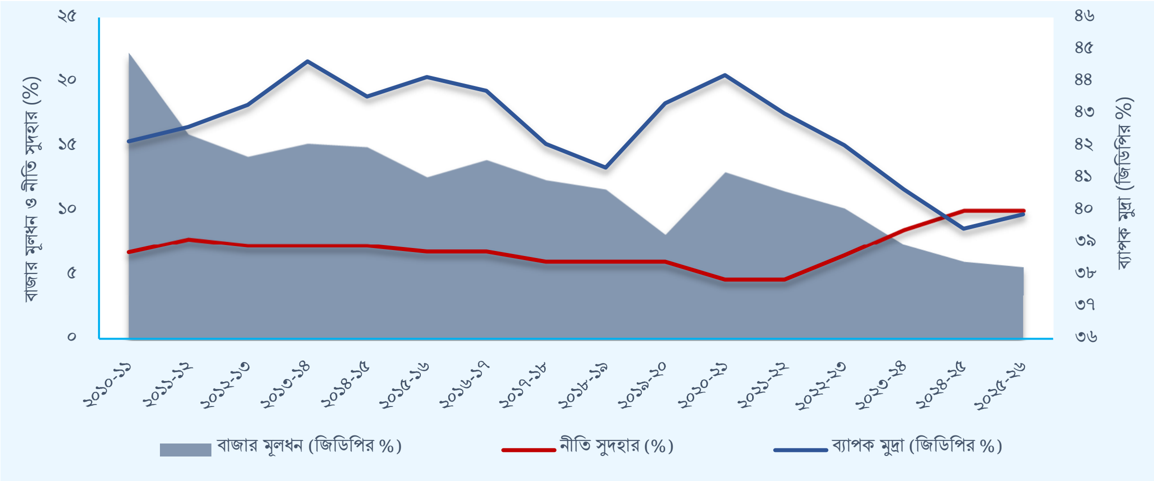

চিত্র ২.২২ মুদ্রা সূচক ও পুঁজিবাজার উন্নয়নের ঐতিহাসিক গতিবিধি

সূত্র: অর্থ বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংক

বন্ড বাজার উন্নয়ন: অভ্যন্তরীণ বন্ড বাজারের সম্প্রসারণ ও গভীরতা বৃদ্ধি সরকারের অন্যতম মধ্যমেয়াদি অগ্রাধিকার। সরকারের সুকুক বন্ড ইস্যু এবং স্বল্পমেয়াদি ইসলামি ট্রেজারি বিল চালুর পরিকল্পনা বিনিয়োগকারীদের পরিধি বাড়াতে এবং বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের উৎসগুলোতে বৈচিত্র্য আনতে বড় ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি, বন্ড বাজারের সম্প্রসারণ ব্যাংকঋণের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমাবে এবং বেসরকারি খাতের বন্ড ইস্যুর মানদণ্ড হিসেবে দীর্ঘমেয়াদি মুনাফা বা সুদহার কাঠামো গঠনে সহায়তা করবে। একইসঙ্গে, এটি আরও বহুমুখী ও ভারসাম্যপূর্ণ আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতেও সহায়তা করবে। এ লক্ষ্যে সেকেন্ডারি বাজারের তারল্য বৃদ্ধি, প্রাইমারি-ডিলার ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং পেনশন তহবিলের অংশগ্রহণের মতো প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২.৩.৪ বহিঃখাত

গত এক বছর ধরে বহিঃখাতে উল্লেখযোগ্য ঘাতসহনশীলতা (Resilience) পরিলক্ষিত হয়েছে, যা মূলত রপ্তানি পুনরুদ্ধার, রেকর্ড পরিমাণ প্রবাসী আয়, চলতি হিসাবের ঘাটতি হ্রাস এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পরিস্থিতির উন্নতির কারণে সম্ভব হয়েছে। ২০২৫ সালের মে মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে বাজারভিত্তিক বিনিময় হার ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে বাজারে বিদ্যমান ভারসাম্যহীনতা হ্রাস পেয়েছে, প্রতিযোগিতার সক্ষমতা উন্নত হয়েছে এবং সামগ্রিক বহিঃখাত কাঠামোর গ্রহণযোগ্যতা ও আস্থা আরও সুসংহত হয়েছে। তবে, বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিস্থিতির পরিবর্তন, সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্ন এবং বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ দায় বৃদ্ধিসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনিশ্চয়তা এখনও বহাল রয়েছে, যা মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণকালজুড়ে সতর্কতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে।

২.৩.৪.১ *রপ্তানি ও আমদানির দৃশ্যকল্প*

পণ্য ও সেবা রপ্তানি ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৭.৯ শতাংশ, ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ১১.৫ শতাংশ এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছরে ১২.২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এর ফলে প্রক্ষেপণকাল শেষে মোট রপ্তানি আয় প্রায় ৭৪.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তৈরি পোশাক খাতের ঘুরে দাঁড়ানো এবং বিশ্ববাজারে পোশাক কেনার ক্ষেত্রে নতুন প্রবণতা আগামী দিনগুলোতে আমাদের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি বাড়াতে বড় ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

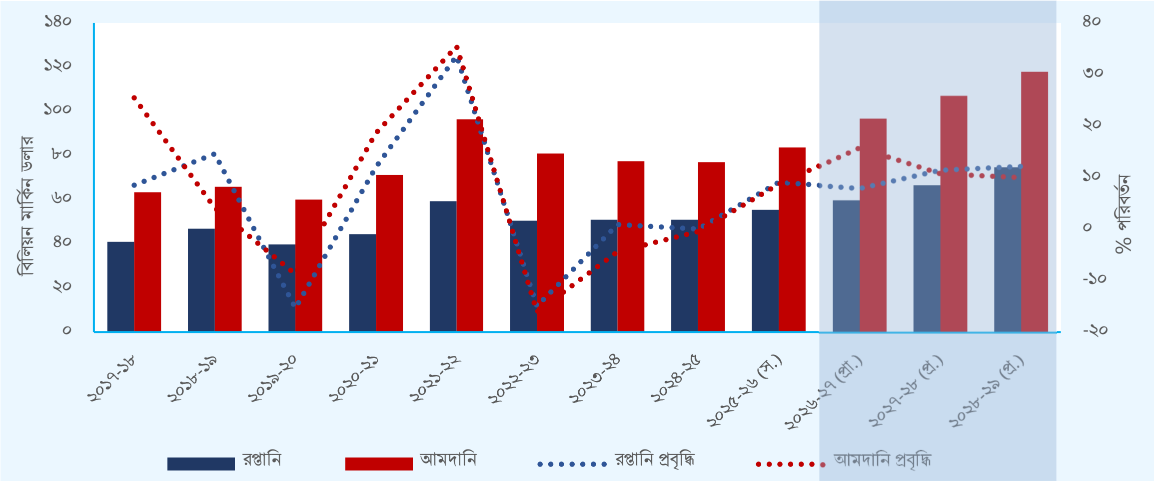

চিত্র ২.২৩ রপ্তানি ও আমদানির গতিবিধি

সূত্র: অর্থ বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংক

মধ্যমেয়াদে রপ্তানি বহুমুখীকরণ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এ লক্ষ্যে ওষুধশিল্প, চামড়া, কৃষি-প্রক্রিয়াজাতকরণ, হালকা প্রকৌশল এবং আইসিটি-নির্ভর সেবা খাত সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, যাতে তৈরি পোশাক রপ্তানির ওপর বিদ্যমান কাঠামোগত নির্ভরশীলতা হ্রাস পায় এবং বহিঃখাতের সহনশীলতা আরও শক্তিশালী হয়।

রপ্তানি পরিস্থিতি এখনও উল্লেখযোগ্য বৈদেশিক ঝুঁকির মুখোমুখি রয়েছে। এর মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) থেকে উত্তরণের সময়সূচি এবং এর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে অনিশ্চয়তা অন্যতম, বিশেষ করে সরকার কর্তৃক উত্তরণের সময়সীমা ২০২৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করার অনুরোধ বর্তমানে জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসির (সিডিপি)-এর বিবেচনাধীন রয়েছে। পাশাপাশি, মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত বৈদেশিক চাহিদা দুর্বল করতে পারে, বৈশ্বিক জাহাজ পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি করতে পারে এবং লোহিত সাগর ও হরমুজ প্রণালিসহ গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বাণিজ্যপথে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে।

সরকারের অবকাঠামো সম্প্রসারণ কর্মসূচির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মূলধনি যন্ত্রপাতির উচ্চ আমদানি নির্ভরতার কারণে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে আমদানি ১৫.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। তবে পরবর্তীকালে আমদানি প্রবৃদ্ধি কিছুটা শ্লথ হয়ে ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ১০.৮ শতাংশ এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছরে ১০.০ শতাংশে নেমে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এর ফলে প্রক্ষেপণকাল শেষে মোট আমদানির পরিমাণ প্রায় ১১৭.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

ফলস্বরূপ, বাণিজ্য ঘাটতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রায় ২৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৮-২৯ অর্থবছরে প্রায় ৪৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

২.৩.৪.২ চলতি হিসাব ও বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য

মধ্যমেয়াদে বাংলাদেশের লেনদেনের ভারসাম্য (Balance of Payments) পর্যায়ক্রমে শক্তিশালী হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। প্রবাসী আয়ের উচ্চ প্রবৃদ্ধি, রপ্তানি আয়ের ইতিবাচক ধারা এবং বাহ্যিক খাতের সামগ্রিক স্থিতিশীলতা এই লক্ষ্য অর্জনে মূল ভূমিকা রাখবে। চলতি হিসাবের ভারসাম্য ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপির ৪.০৫ শতাংশের সর্বোচ্চ ঘাটতি থেকে

উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রায় ভারসাম্যের কাছাকাছি অবস্থানে পৌঁছেছে।

মধ্যমেয়াদি কাঠামো অনুযায়ী, চলতি হিসাবের ঘাটতি সীমিত পর্যায়ে থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে, চলতি হিসাবের ঘাটতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরে জিডিপির প্রায় ০.৬৯ শতাংশ, ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ০.৪৮ শতাংশ এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছরে ০.১১ শতাংশে নেমে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যা মূলত বহিঃখাতে পর্যায়ক্রমে ভারসাম্য ফিরে আসারই একটি ইঙ্গিত বহন করে।

তবে, এসব প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রে কিছু নিম্নমুখী ঝুঁকিও (Downside Risks) রয়েছে। বিশেষ করে, মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানিজনিত কারণে বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধি, প্রত্যাশার তুলনায় প্রবাসী আয়ের ধীর প্রবৃদ্ধি অথবা মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংকট চলতি হিসাবের ঘাটতিকে প্রক্ষেপণের তুলনায় আরও বাড়িয়ে দিতে পারে এবং বহিঃখাতের স্থিতিশীলতা অর্জনকে বিলম্বিত করতে পারে। ফলশ্রুতিতে, প্রকৃত অর্জন বা ফলাফল মূলত প্রবাসী আয়ের শক্তিশালী ধারা বজায় থাকা, রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণ এবং বৈশ্বিক পরিস্থিতির স্বাভাবিক হওয়ার ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করবে।

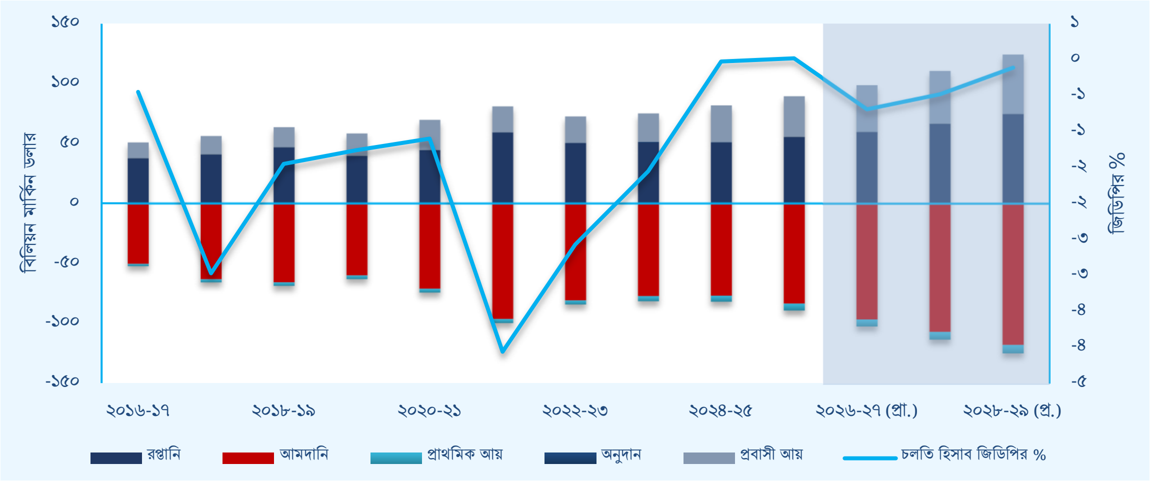

চিত্র ২.২৪ লেনদেন ভারসাম্যের চলতি হিসাবের উপাদানসমূহ
সূত্র: অর্থ বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংক

২.৩.৪.৩ মুদ্রা বিনিময় হার ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০২০-২১ অর্থবছরের ৪৬.৩৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে কমে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২৬.৯০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে নেমে আসে। তবে পরবর্তীকালে রিজার্ভ পরিস্থিতি স্থিতিশীল হতে শুরু করে এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের শেষে তা ৩১.১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছায়। মধ্যমেয়াদে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আরও বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৪১.০১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ৫০.৬২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছরে ৬২.৬৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, ২০২৮-২৯ অর্থবছর নাগাদ দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দিয়ে প্রায় ৫.৪ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব হবে। এটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ছয় মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর মানদণ্ডের বেশ কাছাকাছি। এই প্রক্ষেপণ মূলত শক্তিশালী প্রবাসী আয়, রপ্তানি আয়ের ইতিবাচক ধারা এবং বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনায় বিচক্ষণতার অনুমানের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়েছে।

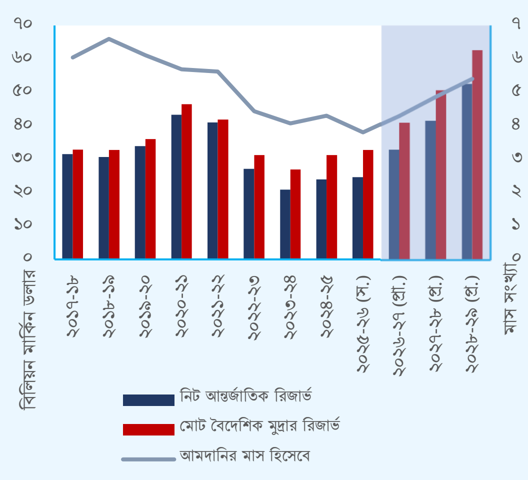

চিত্র ২.২৫ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

সূত্র: অর্থ বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংক

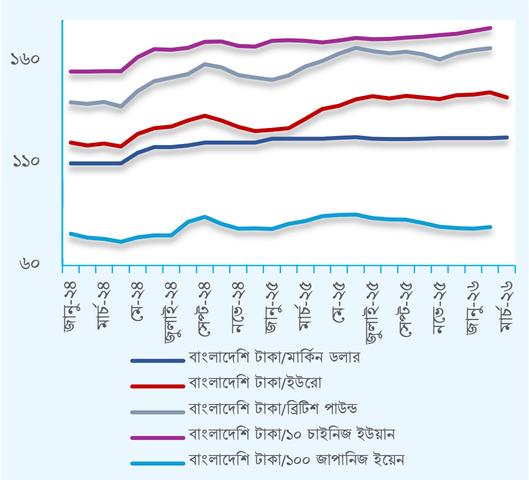

চিত্র ২.২৬ বিনিময় হারের গতিবিধি

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

বিনিময় হার ব্যবস্থা: ২০২৫ সালের মে মাস থেকে বাজারভিত্তিক বিনিময় হার নীতি কার্যকর রয়েছে। বাজারের সাথে মিল রেখে মুদ্রার মান সমন্বয়ের এই পদক্ষেপটি আমাদের সামগ্রিক অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ প্রক্রিয়ায় মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার (BDT/USD) বিনিময় হারের প্রায় ১১ শতাংশ নিয়ন্ত্রিত অবমূল্যায়ন (Depreciation) হয়েছে; যা ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসের প্রায় ১১০ টাকা থেকে ২০২৫ সালের অক্টোবর নাগাদ প্রায় ১২২ টাকায় পৌঁছায় এবং এরপর থেকে টাকার এই বিনিময় হার মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে।

অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত অন্যান্য প্রধান মুদ্রার বিপরীতে ক্রস-রেটের ক্ষেত্রে উচ্চমাত্রার অস্থিতিশীলতা পরিলক্ষিত হয়েছে। একই সময়ে ইউরো এবং ব্রিটিশ পাউন্ড স্টার্লিং উভয়ের বিপরীতেই টাকার মান ১৮ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি, চীনা ইউয়ানের বিপরীতেও টাকার অবমূল্যায়ন হয়েছে। এর ফলে চীন থেকে আমদানি করা শিল্প কাঁচামাল এবং মধ্যবর্তী পণ্যের ল্যান্ডিং কস্ট বা প্রকৃত আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে, অভ্যন্তরীণ সরবরাহ ব্যবস্থায় উৎপাদন ব্যয়ের চাপ আরও তীব্র হয়েছে।

REER বা প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হারের গতিপ্রকৃতি: ২০২৪ এবং ২০২৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (REER) এবং নমিনাল কার্যকর বিনিময় হার (NEER)-এর মধ্যকার ব্যবধান ঋণাত্মক হয়ে যায়। এর থেকে দেখা যায় যে, নমিনাল অবমূল্যায়নের পর দেশের বাজারেও সাময়িকভাবে টাকার প্রকৃত দর কমে গিয়েছিল। তবে পরবর্তী সময়ে অভ্যন্তরীণ মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়ার কারণে রপ্তানি বাণিজ্যে অর্জিত সেই প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বা বাড়তি সুবিধা কমে যায়। ফলে ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ REER–NEER ব্যবধান পুনরায় ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রায় ৫ থেকে ৮ পয়েন্টে পৌঁছায়।

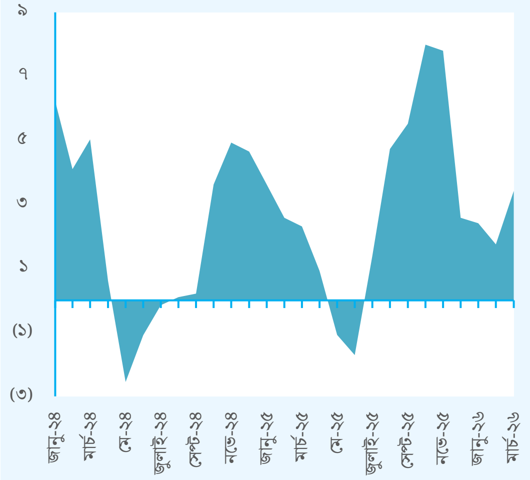

চিত্র ২.২৭ REER ও NEER হারের পার্থক্য

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

এই প্রেক্ষাপটে, REER এবং NEER-এর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি ভারসাম্য নিশ্চিত করতে বারবার মুদ্রার অবমূল্যায়ন না করে, বরং কঠোর আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যবসার প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়ানো জরুরি।

২.৩.৪.৪ প্রবাস আয়

প্রবাসী আয় বর্তমানে বাংলাদেশের বহিঃখাতকে স্থিতিশীল রাখার অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রবাসী আয় ২৮.১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে রেকর্ড ৩০.৫৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। ২০২৪ সালের মে মাসে 'ক্রলিং-পেগ বিনিময় হার' ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ২০২৫ সালের মে মাসে 'বাজারভিত্তিক বিনিময় হার' ব্যবস্থা চালুর ফলে আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ প্রেরণের প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা অনানুষ্ঠানিক বাজারের প্রিমিয়াম কমিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এর ফলে, মাসভিত্তিক প্রবাসী আয় প্রবাহ ২০২৩ সালের আগস্ট মাসে প্রায় ১.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৬ সালে প্রায় ৩.২ থেকে ৩.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে পৌঁছেছে। বিশেষত, ২০২৬ সালের মার্চ মাসে রেকর্ড ৩.৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রবাসী আয় অর্জিত হয়েছে, যা আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে অর্থ প্রেরণের শক্তিশালী ধারাকেই সুস্পষ্ট করে তোলে।

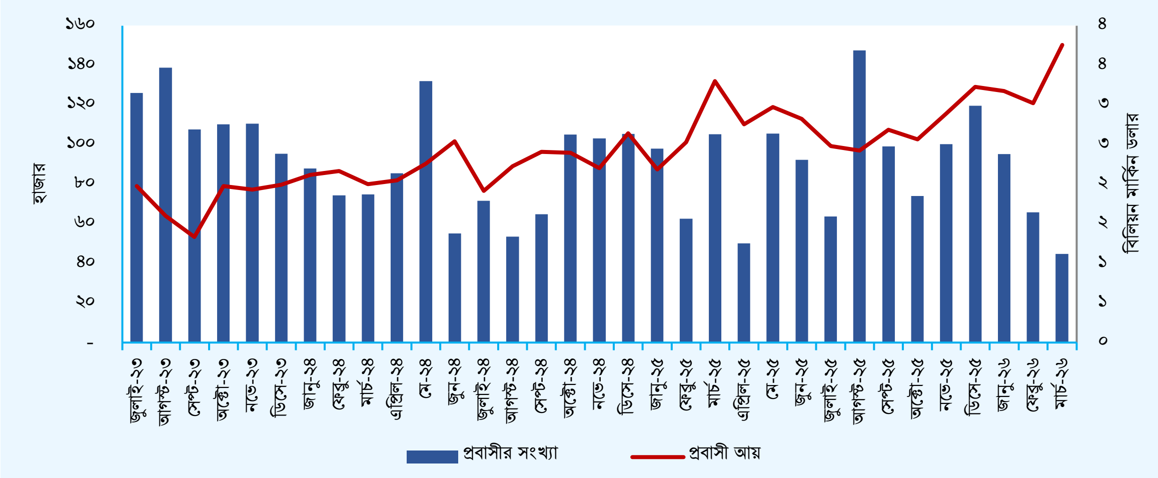

চিত্র ২.২৮ প্রবাস আয় ও প্রবাসীর সংখ্যা

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

মধ্যমেয়াদে প্রবাসী আয় আরও বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৩৮.৭২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ৪৩.৭৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছরে প্রায় ৪৯.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এই মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস মূলত বিদ্যমান প্রবাসী কর্মীদের আয় সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে অর্থ প্রেরণের বিষয়ে তাদের অব্যাহত আস্থার ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়েছে। এর ফলে প্রবাসী আয়ের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি এখন আর বিদেশে যাওয়া নতুন কর্মীর সংখ্যার সাময়িক ওঠানামার ওপর খুব বেশি নির্ভর করছে না। এই ইতিবাচক ধারা বজায় রাখতে সরকারের নীতিগত সহায়তা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন হবে। এর মধ্যে প্রবাসী লাউঞ্জ উদ্যোগের মতো অভিবাসী সহায়তা সেবা সম্প্রসারণ, প্রতিযোগিতামূলক বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা এবং প্রবাসী কর্মীদের জন্য আর্থিক সেবার সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একইসঙ্গে, মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতির ওপরও এই পূর্বাভাস অনেকাংশে নির্ভরশীল, কারণ বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রবাসী শ্রমশক্তি এই অঞ্চলে নিয়োজিত রয়েছে। প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রে অনুমান করা হয়েছে যে, ২০২৬ সালের জুন মাসের মধ্যে এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা বা স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরে আসবে। তবে দীর্ঘস্থায়ী সংকট ওই অঞ্চলের শ্রমচাহিদা দুর্বল করতে পারে, কর্মী নিয়োগ ধীর করতে পারে, মজুরি প্রবৃদ্ধি হ্রাস করতে পারে এবং মধ্যমেয়াদে প্রবাসী আয়ের প্রবাহে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এর ফলে বাণিজ্য ঘাটতি মোকাবিলায় প্রবাসী আয়ের যে গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত ভূমিকা রয়েছে, তা দুর্বল হয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হতে পারে।

এ প্রেক্ষাপটে, দীর্ঘমেয়াদে বহিঃখাতের সহনশীলতা জোরদার করতে রপ্তানি ও প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) বৃদ্ধির পাশাপাশি বৈদেশিক শ্রমবাজার বহুমুখীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

২.৪ মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্পের প্রধান অনুমানসমূহ

মধ্যমেয়াদি ২০২৬-২৭ থেকে ২০২৮-২৯ অর্থবছরের সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রক্ষেপণ প্রকৃত খাত, রাজস্ব খাত, মুদ্রা খাত ও বহিঃখাত সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু আন্তঃসম্পর্কিত অনুমানের ওপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়েছে। একইসঙ্গে, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং নীতিগত পরিবেশ সম্পর্কিত অনুমানসমূহও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই প্রক্ষেপণ দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ঠিক রেখে সরকারের এক ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি গড়ার পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রস্তুত করা হয়েছে। ফলে এর মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সরকারের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা ভিশন উঠে এসেছে।

প্রকৃত খাত সংক্রান্ত অনুমান: প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৬.৫ শতাংশ এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছরে ৭.৫ শতাংশে উন্নীত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। রাজনৈতিক ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার উন্নয়ন, বেসরকারি বিনিয়োগ পুনরুদ্ধার এবং সরকারি বিনিয়োগ সম্প্রসারণ এ প্রবৃদ্ধিকে সহায়তা করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। লক্ষ্যভিত্তিক ভর্তুকি এবং কৃষক কার্ড সুবিধার সহায়তায় কৃষিখাত স্থিতিশীল থাকবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। একইসঙ্গে, জ্বালানি সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নয়ন, সরবরাহব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা হ্রাস এবং উৎপাদনমুখী খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধি আরও শক্তিশালী হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অন্যদিকে, মূল্যস্ফীতি হ্রাস, প্রবাসী আয়ের স্থিতিশীল প্রবাহ এবং ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির সম্প্রসারণসহ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী জোরদার করার ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

মুদ্রানীতি ও মূল্যস্ফীতি সংক্রান্ত অনুমান: বৈশ্বিক পণ্যমূল্য হ্রাস, বিনিময় হার স্থিতিশীলতা এবং সরবরাহব্যবস্থা সংক্রান্ত নীতিগত পদক্ষেপের ফলে মূল্যস্ফীতি ২০২৬-২৭

অর্থবছরে প্রায় ৭.৫ শতাংশে নেমে আসবে এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছর নাগাদ ৬.০ শতাংশের কাছাকাছি নেমে আসবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের বিরাজমান অস্থিতিশীলতা এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য বিবেচনায় নিয়ে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত নীতি সুদহার ১০ শতাংশে অপরিবর্তিত থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে পরবর্তীকালে সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল হওয়ার সাথে সাথে মুদ্রানীতি পর্যায়ক্রমে শিথিল করা হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

রাজস্ব খাত সংক্রান্ত অনুমান: আর্থিক শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রেখে সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে মূলত অবকাঠামো, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং সামাজিক সুরক্ষা খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কর পরিপালন নিশ্চিতকরণ, এমএলটিআরএস (MLTRS) বাস্তবায়ন, স্বয়ংক্রিয়করণ (অটোমেশন), করের আওতা সম্প্রসারণ এবং কর প্রশাসন থেকে কর নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে পৃথকীকরণের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ বাড়ানো হবে; যার ফলে বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৩.২ থেকে ৩.৭ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হবে। একই সাথে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক ভর্তুকি এবং খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো চলমান থাকবে। তবে সরকারি বিনিয়োগের এই সম্প্রসারণ মূলত প্রকল্প মূল্যায়ন, ক্রয় প্রক্রিয়া এবং বাস্তবায়ন সক্ষমতার আনুপাতিক অগ্রগতির ওপর নির্ভর করবে।

বহিঃখাত সংক্রান্ত অনুমান: ২০২৬-২৭ থেকে ২০২৮-২৯ অর্থবছর পর্যন্ত দেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ৭.৯ থেকে ১২.২ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে, যা মূলত বৈশ্বিক চাহিদা পুনরুদ্ধার এবং বাণিজ্যিক কূটনীতির প্রসারের ওপর নির্ভর করে অর্জিত হবে। অন্যদিকে, মূলধনি যন্ত্রপাতি, জ্বালানি ও শিল্প কাঁচামালের চাহিদা বাড়ায় আমদানি প্রবৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে ঊর্ধ্বমুখী থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাছাড়া, প্রবাসী আয়ের এই ইতিবাচক ধারা আগামীতেও চালু থাকবে। বিদেশে আমাদের শ্রমবাজার স্থিতিশীল থাকা এবং ব্যাংকিং চ্যানেলে টাকা পাঠানোর জন্য সরকারের দেওয়া নগদ প্রণোদনা রেমিট্যান্সের গতি ধরে রাখতে সাহায্য করবে। এর ফলে চলতি হিসাবের ঘাটতি একটি সীমিত পরিসরে থাকবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। পাশাপাশি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৪১.০১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হবে—যা দিয়ে প্রায় ৪.৩০ মাসের আমদানি ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব। পরবর্তীকালে ২০২৮-২৯ অর্থবছর নাগাদ এই রিজার্ভ বৃদ্ধি পেয়ে ৬২.৬৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়া, মধ্যমেয়াদে বাজারভিত্তিক বিনিময় হার নীতি বহাল থাকবে।

বৈশ্বিক ও নীতিগত পরিবেশ: স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণের সময়সীমা ২০২৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করার জন্য সরকারের প্রস্তাবটি বর্তমানে জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসির (সিডিপি) পর্যালোচনাধীন রয়েছে। এটি অনুমোদিত হলে, এলডিসি থেকে বের হয়ে আসার প্রক্রিয়াটি আরও সহজ হবে। একই সাথে বিশ্ববাজারে আমাদের রপ্তানি পণ্যের টিকে থাকার সক্ষমতা বা প্রতিযোগিতা বজায় রাখতে বাড়তি কিছু সময় পাওয়া যাবে। পাশাপাশি, ডিরেগুলেশন, আর্থিক খাত সংস্কার, বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা শক্তিশালীকরণসহ চলমান কাঠামোগত সংস্কার কার্যক্রম মধ্যমেয়াদে অব্যাহত থাকবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে।

২.৫ এমটিএমএফ[৩]: ২০২৬-২৭ থেকে ২০২৮-২৯ অর্থবছর

সারণি ২.২ এমটিএমএফ প্রক্ষেপণ ২০২৫-২৬ থেকে ২০২৮-২৯ অর্থবছর

সূচকসমূহ	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৫-২৬ (সংশোধিত)	২০২৬-২৭ (প্রা.)	২০২৭-২৮ (প্র.)	২০২৮-২৯ (প্র.)
	প্রকৃত	বাজেট	সাময়িক	প্রাক্কলন	প্রক্ষেপণ	
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৩.৪৯	৫.৫	৫.০*	৬.৫	৭.০	৭.৫
মূল্যস্ফীতি (%)	১০.০৩	৬.০	৭.০*	৭.৫	৬.৫	৬.০
মোট বিনিয়োগ (জিডিপির %)	২৮.৫৪	৩৩.০০	৩১.৯৮	৩৪.৪৭	৩৫.৬২	৩৬.৮২
বেসরকারি বিনিয়োগ (জিডিপির %)	২২.০৩	২৬.২০	২১.২২	২১.৩৩	২১.৬০	২১.৬৫
সরকারি বিনিয়োগ (জিডিপির %)	৬.৫১	৬.৮০	১০.৭৫	১৩.১২	১৪.০১	১৫.১৭
রাজস্ব (জিডিপির %)	৭.৯৯	৯.০০	৯.৭৫	১০.২৫	১০.৪৫	১০.৭১
এনবিআর রাজস্ব (জিডিপির %)	৬.৬৮	৮.০০	৮.২৭	৮.৮৪	৯.১২	৯.৩২
এনবিআর-বহির্ভূত রাজস্ব (জিডিপির %)	০.১৫	০.৩০	০.৩৩	০.৩৭	০.৩৫	০.৩২
কর বহির্ভূত রাজস্ব (জিডিপির %)	১.০৭	০.৭০	১.০৭	০.৯৭	০.৯১	১.০০
ব্যয় (জিডিপির %)	১১.৪৫	১২.৭০	১২.৯৬	১৩.৭৩	১৩.৯১	১৪.৩৯
যার মধ্যে, এডিপি	২.৫৮	৩.৭০	৩.২৯	৪.৩৯	৪.৮০	৫.৩১
প্রাথমিক ভারসাম্য (জিডিপির %)	−০.৯৮	−১.৭০	−১.১২	−১.৬২	−১.৬১	−১.৮১
বাজেট ঘাটতি (জিডিপির %)	−৩.৪৫	−৩.৬০	−৩.২১*	−৩.৪৮	−৩.৪৬	−৩.৬৮
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন (জিডিপির %)	২.৪৪	২.০০	২.২০	১.৮৬	১.৯১	২.১২
যার মধ্যে, ব্যাংক	২.০৭	১.৭০	১.৮৮	১.৫৯	১.৬৮	১.৮৩
নিট বৈদেশিক অর্থায়ন (জিডিপির %)	১.০১	১.৬০	১.০০	১.৬২	১.৫৪	১.৫৭
বেসরকারি খাতের ঋণ (প্রবৃদ্ধি, %)	৬.৪৯	৮.০০	৮.০০	৯.৪২	১০.১৭	১০.৪২
রপ্তানি (প্রবৃদ্ধি %)	৭.৭০	১০.০০	৯.০২	৭.৯৪	১১.৪৭	১২.১৮
আমদানি (প্রবৃদ্ধি %)	১.৮০	৭.০০	৮.৬৫	১৫.৭৯	১০.৭৬	১০.০৩
রেমিট্যান্স (প্রবৃদ্ধি %)	২৮.১৭	৮.০০	১০.১১	১৪.৯৭	১৩.০৩	১২.৫০
চলতি হিসাব ভারসাম্য (জিডিপির %)	−০.০৩	০.২০	০.০২*	−০.৬৯	−০.৪৮	−০.১১
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বিলিয়ন মা. ড.)	৩১.১৭	৩৮.৯০	৩২.৬৯	৪১.০১	৫০.৬২	৬২.৬৪
নমিনাল জিডিপি (বিলিয়ন টাকা)	৫৫,১৫০	৬২,৪৪৬	৬০,৮০৩	৬৮,৩০০	৭৬,৯২৫	৮৬,৮৬৩
নমিনাল জিডিপি (বিলিয়ন মা. ড.)	৪৫৮	৫১২	৪৯৭	৫৩৮	৫৮৩	৬৩৯
নমিনাল জিএনআই (বিলিয়ন মা. ড.)	৪৫৩	৫৩৯	৪৯১	৫৩২	৫৭৬	৬৩১

[৩] *উল্লেখ্য যে, সংযুক্ত সারণিতে উপস্থাপিত প্রক্ষেপণসমূহ ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বর (যা কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল কর্তৃক সংশোধিত বাজেটের জন্য অনুমোদিত) সময়কালের তথ্যের ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে, মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের প্রভাব এই প্রাক্কলনে ব্যবহৃত মূল তথ্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়নি। ফলশ্রুতিতে, সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট ও হালনাগাদ তথ্যের আলোকে বিশ্লেষণ করলে কিছু প্রক্ষেপণকে কিছুটা অতি-মূল্যায়িত বলে প্রতীয়মান হতে পারে।*

বক্স ২.১: মধ্যপ্রাচ্য সংকটের কারণে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রক্ষেপণ হালনাগাদ

মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার নেতিবাচক প্রভাবের কারণে সৃষ্ট তীব্রতর বাহ্যিক অভিঘাত (External Shock) ও অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রক্ষেপণগুলো সংশোধন করা হয়েছে। বৈশ্বিক সংকট পণ্যমূল্যের অস্থিতিশীলতাকে আরও আরও বাড়িয়ে দিয়েছে এবং জ্বালানি তেলসহ অন্যান্য পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বিশেষত, হরমুজ প্রণালিসহ গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বাণিজ্যপথে অস্থিরতার কারণে বাংলাদেশের আমদানি ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

একইসঙ্গে, উচ্চ জ্বালানি আমদানি ব্যয়ের পাশাপাশি দুর্বল রপ্তানি পারফরম্যান্সের কারণে বহিঃখাতের ওপর চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও প্রবাসী আয় প্রবাহ সামগ্রিকভাবে স্থিতিশীল রয়েছে, তবুও এ ক্ষেত্রে নিম্নমুখী ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এ প্রেক্ষাপটে, প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি আগের প্রাক্কলিত ৫.০ শতাংশের পরিবর্তে কমে ৪.২ শতাংশে নেমে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। একই সময়ে, মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৮.৯ শতাংশ হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যা থেকে বোঝা যায় যে, সামষ্টিক অর্থনীতিতে অব্যাহত মূল্যস্ফীতির চাপ বিরাজ করছে।

অন্যদিকে, ভর্তুকি ব্যয় বৃদ্ধি এবং আশানুরূপ রাজস্ব আদায় না হওয়ার কারণে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি প্রাথমিক প্রাক্কলনের চেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়বে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, রপ্তানি আয় হ্রাস এবং জ্বালানি আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে চলতি হিসাবের ঘাটতি আরও বৃদ্ধি পেতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

২.৬ নীতিগত অগ্রাধিকার ও সংস্কার কর্মসূচি

উপরোক্ত সামষ্টিক অর্থনৈতিক লক্ষ্যসমূহ অর্জন এবং দীর্ঘমেয়াদে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে উত্তরণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকার একটি বিস্তৃত ও পর্যায়ক্রমিক সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। এ সংস্কার অগ্রাধিকারসমূহ মূলত তিনটি কাঠামোগত ভিত্তির ওপর বিন্যস্ত— ডিরেগুলেশন, রাজস্ব ও আর্থিক খাতসহ বিভিন্ন খাতে কাঠামোগত সংস্কার, এবং অর্থনৈতিক গণতন্ত্রীকরণ ও বিনিয়োগনির্ভর অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি।

২.৬.১ বিনিয়ন্ত্রণকরণ (Deregulation):

ট্রিলিয়ন-ডলার জিডিপির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় দেশি ও বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগের ধারা অব্যাহত রাখতে একটি পূর্বানুমানযোগ্য, স্বচ্ছ ও কার্যকর নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশ নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

রেগুলেটরি কাঠামো সরলীকরণ: এ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারমূলক পদক্ষেপসমূহের মধ্যে রয়েছে— বিডার (BIDA) ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটাল ওয়ান-স্টপ সেবা ও সিঙ্গেল-উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স ব্যবস্থা সম্প্রসারণ; সহজীকৃত প্রক্রিয়া ও লক্ষ্যভিত্তিক প্রণোদনার মাধ্যমে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ) ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (EPZ) সম্প্রসারণ; সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান, লাইসেন্সিং শর্ত এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার নিয়মিত পর্যালোচনা; ট্যাক্স এক্সপেনডিচার পলিসি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক (TEPMF)-এর মাধ্যমে নীতির পূর্বাভাসযোগ্যতা জোরদারকরণ; এবং চুক্তি বাস্তবায়ন ও বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।

বেসরকারি খাতনির্ভর প্রবৃদ্ধি: বেসরকারি পুঁজি আহরণের ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এ লক্ষ্যে আইনগত, আর্থিক ও চুক্তিভিত্তিক মানদণ্ডসহ পিপিপি কাঠামো শক্তিশালী করা হচ্ছে, যাতে লেনদেনের পরিমাণ ও গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি, দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের জন্য পুঁজিবাজারের গভীরতা বৃদ্ধি, শিল্প বহুমুখীকরণ ও ভ্যালু-চেইন উন্নয়ন, এবং এসএমই ও স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম সম্প্রসারণও গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ ও বৈশ্বিক সংযুক্তি: বিডার (BIDA) সিঙ্গেল-উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স সুবিধার বাইরেও

বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে—দ্রুত অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ; ওয়ার্ক পারমিট এবং বিনিয়োগকারী সেবা দ্রুততর করা; মুনাফা প্রত্যাবাসন, আইনগত সুরক্ষা ও নীতিগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা; এবং দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি সম্প্রসারণ। ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন, রোডশো এবং অর্থনৈতিক কূটনীতির মাধ্যমে বাংলাদেশকে বৈশ্বিক পর্যায়ে 'নেক্সট ফ্রন্টিয়ার ইকোনমি' হিসেবে উপস্থাপন করা হবে। একইসঙ্গে, এলডিসি উত্তরণের সময় বাড়ানোর যে প্রস্তাব সরকার দিয়েছে, তা মাথায় রেখেই নতুন নতুন দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও বিশেষ পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সচল রাখা হবে।

২.৬.২ রাজস্ব ও আর্থিক খাতের কাঠামোগত সংস্কার

রাজস্ব সংস্কার: ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে উত্তরণের অর্থায়ন নিশ্চিত করা এবং মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে রাজস্ব স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ শক্তিশালী করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার করের আওতা সম্প্রসারণ, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর পরিপালন (Voluntary Compliance) বৃদ্ধি এবং কর প্রশাসন ও সুশাসন ব্যবস্থার আধুনিকায়নের মাধ্যমে মধ্যমেয়াদে কর-জিডিপি অনুপাত ধীরে ধীরে প্রায় ১০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং জবাবদিহি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর নীতি প্রণয়নকে কর প্রশাসনের কার্যক্রম থেকে পৃথক করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (NBR) পুনর্গঠনের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। একইসঙ্গে, স্ট্রেনদেনিং ডোমেস্টিক রেভিনিউ মোবিলাইজেশন প্রজেক্ট (SDRMP) এবং এ-চালান, ই-রিটার্ন, ই-টিডিএস, ASYCUDA World, IVAS ও বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডোসহ সমন্বিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রশাসনিক আধুনিকায়ন ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। এসব উদ্যোগ রাজস্ব আহরণের দক্ষতা বৃদ্ধি, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহজীকরণ এবং বিনিয়োগনির্ভর প্রবৃদ্ধি কৌশলকে আরও শক্তিশালী করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। রাজস্ব সংস্কার ও বাস্তবায়ন অগ্রাধিকার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা তৃতীয় অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে।

ব্যাংকিং খাত সংস্কার: সংস্কার কার্যক্রমের মূল অগ্রাধিকারসমূহের মধ্যে রয়েছে— খেলাপি ঋণ হ্রাস ও সম্পদের গুণগত মান উন্নয়ন; ব্যাংকিং সুশাসন, তদারকি ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ; পুঁজিবাজার ও বিকল্প অর্থায়ন ব্যবস্থা উন্নয়ন; এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও ডিজিটাল আর্থিক সেবা সম্প্রসারণ। বাংলাদেশ ব্যাংকের গঠিত তিনটি বিশেষায়িত টাস্কফোর্স বিদ্যমান দুর্বলতা মোকাবিলার প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। আমানতকারীদের অর্থের নিরাপত্তা প্রদান এবং আর্থিক খাতের সার্বিক ঝুঁকি দূর করাই সরকারের মূল লক্ষ্য। দেশের আর্থিক স্থিতিশীলতা ধরে রাখতে সরকার এটি নিশ্চিত করছে, যেন গুরুত্বপূর্ণ কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান হুট করে বন্ধ হয়ে বাজারে কোনো ধরণের বিশৃঙ্খলা তৈরি না হয়।

পুঁজিবাজার ও ইসলামি অর্থায়ন: মধ্যমেয়াদে দেশীয় ঋণ ও পুঁজিবাজারের উন্নয়ন, সুকুকসহ বিভিন্ন উদ্ভাবনী বন্ডের মাধ্যমে ইসলামি অর্থায়নের প্রসার এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর (NBFI) তদারকি জোরদার করা হবে। একই সাথে দীর্ঘমেয়াদি সঞ্চয় বাড়ানোর লক্ষ্যে বীমা ও পেনশন খাতের পরিধি বৃদ্ধিকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

জ্বালানি, জলবায়ু ও ডিজিটাল গভর্নেন্স: বিদ্যমান কাঠামোগত অগ্রাধিকারসমূহের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে—কস্ট-রিফ্লেক্টিভ প্রাইসিং মেকানিজম বা ব্যয়-প্রতিফলিত মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে জ্বালানি খাতের সংস্কার ত্বরান্বিতকরণ এবং বিদ্যুৎ উপখাতের ভর্তুকিজনিত আর্থিক সংশ্লেষ হ্রাসকরণ; ডিজিটাল পাবলিক সার্ভিসের সম্প্রসারণ এবং জাতীয় পরিসংখ্যান কাঠামোর আধুনিকায়ন। তদুপরি, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সরকার প্রতি বছর

বাজেটের প্রায় ৬–৭ শতাংশ বরাদ্দ রাখছে, যা জলবায়ু বাজেট কাঠামোর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হচ্ছে। পাশাপাশি দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবিলায় অর্থায়ন ব্যবস্থাও ধাপে ধাপে জোরদার করা হচ্ছে।

ক্রিয়েটিভ অর্থনীতি ও উদ্ভাবন: আইসিটি, ডিজিটাল সেবা এবং জ্ঞানভিত্তিক শিল্পকে উৎসাহিত করা হবে। একই সাথে ক্রিয়েটিভ হাব প্রতিষ্ঠা, 'এক গ্রাম-এক পণ্য' (One Village-One Product) উদ্যোগের সূচনা এবং ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। চলচ্চিত্র, চারুকলা ও থিয়েটার, হেরিটেজ, পর্যটনসহ অন্যান্য সাংস্কৃতিক খাতকে অন্তর্ভুক্ত করে ক্রিয়েটিভ খাতের বিকাশ ঘটানো হবে; জোরদার করা হবে উদ্ভাবনী ইকোসিস্টেম ও স্টার্ট-আপ সহায়তা। পাশাপাশি মেধাস্বত্ব (Intellectual Property) সুরক্ষার আইনি কাঠামো শক্তিশালী করা হবে—যা আমাদের অর্থনীতিকে অধিকতর আধুনিক ও প্রযুক্তি-নিবিড় (Technology-intensive) করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সুশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার: সংস্কারের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা জোরদার; সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সুশাসন সম্প্রসারণ; মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের মধ্যে নীতিগত সমন্বয় বৃদ্ধি; এবং তথ্যনির্ভর ও প্রমাণভিত্তিক নীতি প্রণয়ন ব্যবস্থার সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এসব পদক্ষেপ বিনিয়োগকারীদের আস্থা, নীতির গ্রহণযোগ্যতা এবং ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বজায় রাখতে সহায়তা করবে।

২.৬.৩ অর্থনৈতিক গণতন্ত্রায়ণ ও বিনিয়োগনির্ভর অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি

অর্থনৈতিক গণতন্ত্রায়নের লক্ষ্য হলো প্রবৃদ্ধির সুফল যেন সমাজের সকল স্তরে বিস্তৃতভাবে পৌঁছে, সম্পদ যেন কিছু মানুষের হাতে কুক্ষিগত না থাকে এবং অঞ্চল, খাত ও জনগোষ্ঠী নির্বিশেষে উৎপাদনশীল কাজে সবার সমান সুযোগ নিশ্চিত হয়।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও সিএমএসএমই উন্নয়ন: এ ক্ষেত্রে সরকারের পদক্ষেপসমূহের মধ্যে রয়েছে— ডিজিটাল আর্থিক সেবা ও গ্রামীণ পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং কভারেজ সম্প্রসারণ; এসএমই উদ্যোক্তাদের ঋণপ্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টিকারী জামানতের শর্ত শিথিলকরণ; লক্ষ্যভিত্তিক ক্রেডিট-গ্যারান্টি স্কিম, অগ্রাধিকার খাতের জন্য ভর্তুকিযুক্ত সুদহার কর্মসূচি এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন সহায়তা সেবা চালু করা; এবং নারী উদ্যোক্তা, তরুণ উদ্যোক্তা, ফ্রিল্যান্সিং ও সৃজনশীল অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে সহায়তা সম্প্রসারণ।

কর্মসংস্থান ও মানবসম্পদ উন্নয়ন: শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে মিল রেখে সাধারণ এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা হবে। একই সাথে শ্রমঘন শিল্প ও সেবা খাতের প্রসার এবং প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বিএমইটি (BMET), NHRDF ও SEIP-এর মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাড়ানো হবে। বিশেষ করে, শিল্প ও সেবা খাতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

সামাজিক সুরক্ষা: সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি আরও জোরদার করতে ফ্যামিলি কার্ড ও নগদ সহায়তার পরিধি বাড়ানো এবং তা ডিজিটালাইজড করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক সহায়তার জন্য একটি কার্যকর ডায়নামিক সোশ্যাল রেজিস্ট্রি (DSR) প্রবর্তন করা হচ্ছে। পাশাপাশি ওএমএস ও টিসিবির মাধ্যমে ভর্তুকি মূল্যে পণ্য বিক্রি অব্যাহত রাখা এবং কৃষক কার্ডের আওতা পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণের কাজ চলমান রয়েছে।

আঞ্চলিক ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন: দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবৃদ্ধির সুযোগ আরও ন্যায্যভাবে বণ্টনের লক্ষ্যে আঞ্চলিক ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন মধ্যমেয়াদি সংস্কার

কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে। এ লক্ষ্যে সরকার অর্থনৈতিক করিডর, বিকেন্দ্রীভূত গ্রোথ সেন্টার, বেসরকারি খাতনির্ভর আঞ্চলিক শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান সহায়ক কর্মসূচি এবং অঞ্চলভিত্তিক শিল্প ক্লাস্টার উন্নয়নকে উৎসাহিত করবে। পাশাপাশি, পরিবহন, লজিস্টিকস, যোগাযোগব্যবস্থা এবং গ্রাম-শহর সমন্বয় শক্তিশালী করার মাধ্যমে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

২.৭ উপসংহার

বাংলাদেশের মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক দৃশ্যকল্প ২০৩৪ সালের মধ্যে 'ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতি' বিনির্মাণের লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে প্রণয়ন করা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে টেকসই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, রাজস্ব শৃঙ্খলা, কাঠামোগত সংস্কার এবং বিনিয়োগ আহরণ সক্ষমতা বৃদ্ধিকে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে, দেশীয় বেসরকারি বিনিয়োগ শক্তিশালী করা এবং প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করা সরকারের অন্যতম প্রধান নীতিগত অগ্রাধিকার। এই লক্ষ্য অর্জনে কৌশলগত খাতসমূহে চলমান কাঠামোগত সংস্কারের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো বাজারে প্রবেশের প্রতিবন্ধকতা হ্রাস করা, নীতিগত পূর্বাভাসযোগ্যতা (regulatory predictability) সুসংহত করা এবং সামগ্রিক বিনিয়োগ পরিবেশকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে বিনিয়োগনির্ভর ও কর্মসংস্থানমুখী প্রবৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যেখানে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বৃহত্তর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের বিষয়টি অগ্রাধিকার পেয়েছে।

এসব কাঠামোগত অনুমানের ভিত্তিতে, ২০২৬-২৭ থেকে ২০২৮-২৯ অর্থবছরের মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (MTMF)-এ প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের ৬.৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ৭.০ শতাংশ এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছরে ৭.৫ শতাংশে উন্নীত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। মূলত বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, শিল্প ও সেবা খাতের পর্যায়ক্রমিক পুনরুদ্ধার, ব্যবসায়িক আস্থার উন্নতি এবং প্রবাসী আয়সহ বহিঃখাত থেকে টেকসই অর্থপ্রবাহের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির এই ধারা বজায় থাকবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণও সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এ লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি অব্যাহত থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যা পরবর্তীকালে মূল্যস্ফীতি হ্রাসের লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পর্যায়ক্রমে শিথিল করা হবে। মূল্যস্ফীতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৭.৫ শতাংশ থেকে কমে ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ৬.৫ শতাংশে নেমে আসবে এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছরে তা ধীরে ধীরে প্রায় ৬.০ শতাংশের দিকে নেমে আসবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ২০২৫ সালের মে মাসে প্রবর্তিত বাজারভিত্তিক বিনিময় হার ব্যবস্থা মুদ্রানীতির কার্যকর সঞ্চালন, বহিঃখাতের সমন্বয় এবং বৈদেশিক মুদ্রাবাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে অব্যাহতভাবে সহায়তা করে যাচ্ছে।

রাজস্ব খাতের ক্ষেত্রে, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার লক্ষ্যে নীতি নির্ধারণ করা হচ্ছে। শক্তিশালী রাজস্ব আহরণের সহায়তায় মধ্যমেয়াদে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এসব পদক্ষেপ অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে এবং একইসঙ্গে ঋণের টেকসই অবস্থান (Debt Sustainability) বজায় রাখতে সহায়তা করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। সামগ্রিক বাজেট ঘাটতি মধ্যমেয়াদে জিডিপির ৩.২ থেকে ৩.৭ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

তবে ইতিবাচক প্রক্ষেপণ সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য কিছু নিম্নমুখী ঝুঁকি এখনও বিদ্যমান। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে—রাজস্ব আহরণের সীমাবদ্ধতা, আর্থিক খাতের নাজুক অবস্থা, বিশ্ব রাজনীতির সংকট, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-নীতির অনিশ্চয়তা এবং নিত্যপণ্যের বাজারের অস্থিরতা। এর পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের নিয়মিত ঝুঁকি তো রয়েছেই। এসব ঝুঁকি মোকাবিলায় বিভিন্ন খাতে কাঠামোগত সংস্কার অব্যাহত রাখা এবং রাজস্ব তদারকি কাঠামো আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। একইসঙ্গে, মূল্যস্ফীতি টেকসইভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সমন্বিত মুদ্রানীতি ও সরবরাহ ব্যবস্থা সংক্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পরবর্তী অধ্যায়সমূহে রাজস্ব আহরণ কৌশল, সরকারি ব্যয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ঝুঁকি বিবৃতি ইত্যাদি নীতিগত অগ্রাধিকার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এসকল নীতিগত অগ্রাধিকারের মূল লক্ষ্য টেকসই সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক মধ্যমেয়াদি প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

৩

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি

(২০২৬-২৭ হতে ২০২৮-২৯)

রাজস্ব আদায়ের দৃশ্যপট ও আহরণ কৌশল

অধ্যায় ৩

রাজস্ব আদায়ের দৃশ্যপট ও আহরণ কৌশল

সংক্ষিপ্তসার

- *বাংলাদেশে রাজস্ব আদায় ধারাবাহিকভাবে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম। রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।*
- *জিডিপির প্রবৃদ্ধির তুলনায় কম রাজস্ব প্রবৃদ্ধি, ভ্যাট আদায়ে নিম্ন কার্যকর হার এবং দেশের অর্থনীতিতে একটি বিশাল অনানুষ্ঠানিক খাতের উপস্থিতি রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির বৃহৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়।*
- *সরকার রাজস্ব নীতি সংক্রান্ত কার্যাবলী রাজস্ব আদায় থেকে পৃথক করার উদ্যোগ নিয়েছে। এছাড়া, নতুন কর আইন প্রণয়ন, অনলাইনে কর প্রদানের ব্যবস্থা করা, কর অঞ্চল এর সম্প্রসারণ এবং কর অব্যাহতি যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে সরকার কর পরিপালন উৎসাহিতকরণ ও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।*
- *স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ পরবর্তী সময়ে টেকসই রাজস্ব বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য Medium- and Long-Term Revenue Strategy (MLTRS) বাস্তবায়ন, কর ব্যবস্থাপনার পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন, ভ্যাট ও শুল্ক ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।*

৩.১ ভূমিকা

একটি আদর্শ রাজস্ব নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো- সামাজিক ন্যায্যতা, স্বতঃস্ফূর্ত কর পরিপালন ও অর্থনৈতিক দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে এমন একটি রাজস্ব কাঠামো গড়ে তোলা, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি সরকারের টেকসই ব্যয় নির্বাহে সহায়ক হবে। বর্তমানে আমাদের রাজস্ব নীতির প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো করের সংকীর্ণ পরিধি বা ভিত্তিকে সম্প্রসারণ করা, যা ঐতিহাসিকভাবে প্রবৃদ্ধি সহায়ক সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির সুযোগকে সীমিত করে রেখেছে। আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ এবং করদাতাদের তথা নাগরিকদের আস্থা পুনর্গঠনের লক্ষ্যে এই কৌশলে প্রযুক্তিনির্ভর ও স্বতঃস্ফূর্ত কর পরিপালন-ভিত্তিক একটি সার্বজনীন রাজস্ব ব্যবস্থার দিকে রূপান্তরকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এই কৌশলের মূল দর্শন হলো—করের বোঝা না বাড়িয়ে বরং অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে রাজস্ব প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা এবং 'বিনিয়োগ-উৎপাদন-কর্মসংস্থান-ভোগ-কর' চক্রটিকে পুরোপুরি কার্যকর করা।

ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০৩৫ সালের মধ্যে কর-জিডিপি অনুপাত ১৫ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে সরকার। এই অভিলক্ষ্যের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে-ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণ এবং অভ্যন্তরীণ বাজারের ব্যবসায়িক পরিবেশের সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা, যার ফলে করের পরিধি বা ভিত্তি আরও বিস্তৃত হবে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের যে সম্প্রসারণ ঘটবে, তা-ই টেকসই রাজস্ব আদায়ের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে। এক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার হলো একটি দক্ষ কর প্রশাসন গড়ে তোলা; যা কর রেয়াত বা প্রণোদনাকে সরাসরি কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও প্রযুক্তির আধুনিকায়নের

সাথে কার্যকরভাবে যুক্ত করার মাধ্যমে কর ব্যয়ের সর্বোচ্চ যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করবে। আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ এবং অপচয়মূলক কর ব্যয় দূর করার মাধ্যমে এই কৌশলটি রাজস্ব ব্যবস্থাকে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রায়ণ (Economic Democratisation) ও টেকসই উন্নয়নের একটি শক্তিশালী হাতিয়ারে রূপান্তর করবে।

এই কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির ধারাবাহিকতায়, অধ্যায়টিতে সাম্প্রতিক রাজস্ব আদায়ের প্রবণতা ও এর কাঠামোর একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে; যার পরপরই বাংলাদেশের রাজস্ব খাতের দক্ষতার একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অতঃপর মধ্যমেয়াদে রাজস্ব প্রক্ষেপণ এবং কৌশলগুলোর রূপরেখা উপস্থাপন করা হয়েছে। সবশেষে, নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনে সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট সংস্কার কর্মসূচিগুলোর বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩.২ সার্বিক রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি

রাজস্ব আদায়ের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবেই পিছিয়ে রয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আদায় হয় ৪,১১৬ বিলিয়ন টাকা; এতে ১২.২ শতাংশের প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলেও ৪,৭৮০ বিলিয়ন টাকার মূল লক্ষ্যমাত্রা থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কম ছিল। একইভাবে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রাজস্ব আদায় পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৬.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪,৩৬৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ালেও তা ৫,১৮০ বিলিয়ন টাকার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এই প্রকৃত রাজস্ব আদায় ছিল প্রায় ১৫.৬ শতাংশ কম।

রাজস্ব আদায়ের এই ধারাবাহিক ঘাটতির পাশাপাশি রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে; যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৮.২ শতাংশ থেকে কমে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৭.৯ শতাংশে নেমে এসেছে। বিগত পাঁচটি অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত রাজস্ব আদায়ের মধ্যকার এই ব্যবধান গড়ে ১৩ থেকে ১৫ শতাংশের মধ্যে ছিল। এই ক্রমবর্ধমান ব্যবধান আমাদের কর নীতি ও কর প্রশাসনের সামগ্রিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাকেই জোরালোভাবে তুলে ধরে। রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও রাজস্ব সম্ভাবনার বিপরীতে রাজস্ব আদায় এখনও কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে যেতে পারেনি।

সারণি ৩.১ রাজস্ব আহরণ ২০২০-২১ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর (বিলিয়ন টাকা)

বছর	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা	৩৫১৫	৩৮৯০	৪৩৩০	৪৭৮০	৫১৮০
	{১০.০}	{৯.৮}	{৯.৬}	{৯.৬}	{৯.৩}
প্রকৃত আদায়	৩২০৭	৩৩৫৩	৩৬৬৮	৪১১৬	৪৩৬৯
	{৯.১}	{৮.৪}	{৮.২}	{৮.২}	{৭.৯}
	[২০.৬]	[৪.৬]	[৯.৪]	[১২.২]	[৬.২]

টীকা: সারণিতে ( ) জিডিপি'র % নির্দেশ করে, { } বার্ষিক প্রবৃদ্ধি (%) নির্দেশ করে।
উৎস: আইবাস++, অর্থ বিভাগ

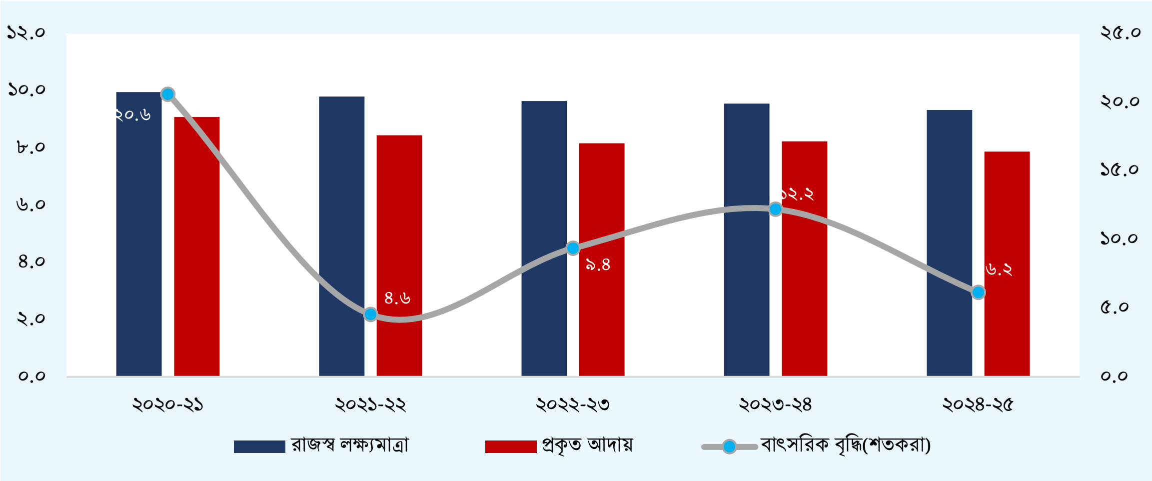

চিত্র ৩.১ রাজস্ব আহরণ (জিডিপি'র %)

উৎস: আইবাস++, অর্থ বিভাগ

৩.৩ রাজস্ব আহরণের উৎসভিত্তিক চিত্র

বাংলাদেশের রাজস্ব কাঠামো মূলত কর রাজস্বের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে; এছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো কর-বহির্ভূত রাজস্ব (এনটিআর))। বিগত পাঁচ বছরে মোট রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কর রাজস্বের অবদান ছিল গড়ে ৮৭.৮ শতাংশ, আর বাকি ১২.২ শতাংশ এসেছে কর-বহির্ভূত রাজস্ব থেকে। এই সময়ে কর-জিডিপি অনুপাত ৬.৮ শতাংশ থেকে ৭.৭ শতাংশের মধ্যে ওঠানামা করেছে। মোট কর রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা রেখেছে, এনবিআর গড়ে মোট কর রাজস্বের ৯৭.৮ শতাংশ আদায় করেছে। অবশিষ্ট ২.২ শতাংশ এসেছে এনবিআর-বহির্ভূত বিভিন্ন উৎস থেকে, যেমন ভূমি রাজস্ব, নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প, নারকোটিক্স অ্যান্ড লিকার কর, যানবাহন কর ইত্যাদি।

বিগত পাঁচ বছরে প্রকৃত কর রাজস্ব গড়ে ১১.৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কর রাজস্ব প্রবৃদ্ধির গতিতে বড় ধরণের নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা যায়; যেখানে পূর্ববর্তী অর্থবছরের ১২.৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এটি ২.৪ শতাংশে নেমে এসেছে। রাজস্ব প্রবৃদ্ধির এই নিম্নমুখী প্রবণতা দেশের মূল রাজস্ব প্রবাহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক ঝুঁকিগুলোর কথাই পুনর্ব্যক্ত করে, যা অর্থনীতির সামগ্রিক স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করছে। অন্যদিকে, ২০২০-২১ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর সময়ে কর-বহির্ভূত রাজস্ব (এনটিআর) গড়ে ৮.৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অব্যয়িত অর্থ সরকারের ট্রেজারি সিঙ্গেল অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করার ফলে কর-বহির্ভূত রাজস্বের প্রবৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে বেশি হয়েছে। নানা ওঠানামা সত্ত্বেও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কর-বহির্ভূত রাজস্ব ৩৮.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে সর্বোচ্চ ৫৯৩ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে এবং মোট রাজস্বে এর অবদান ১৩.৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

সারণি ৩.২ রাজস্বের প্রধান উৎসসমূহ (বিলিয়ন টাকা)

রাজস্বের উৎস	অর্থ বছর				
	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
ক) কর রাজস্ব (ক১+ক২)	২৭০২	২৯৯৭	৩২৭৮	৩৬৮৮	৩৭৭৬
(ক১) এনবিআর কর	২৬৪৩	২৯৩০	৩১৯৮	৩৬০৭	৩৬৯৪
(ক২) এনবিআর বহির্ভূত কর	৫৯	৬৭	৮০	৮১	৮২
(খ) কর-বহির্ভূত রাজস্ব (এনটিআর)	৫০৬	৩৫৬	৩৯০	৪২৮	৫৯৩
মোট রাজস্ব (ক+খ)	৩২০৭	৩৩৫৩	৩৬৬৮	৪১১৬	৪৩৬৯

উৎস: আইবাস++, অর্থ বিভাগ

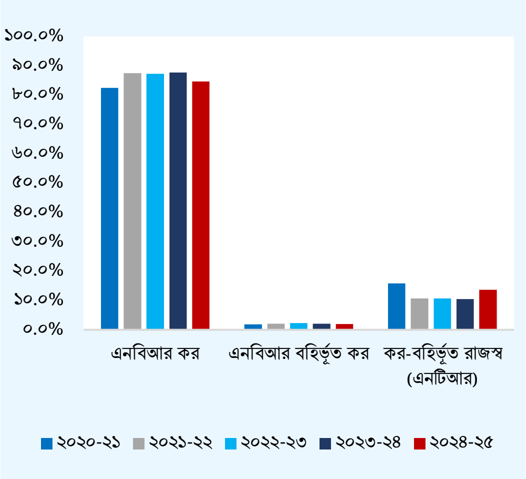

চিত্র ৩.২ উৎসভিত্তিক রাজস্বের বিন্যাস (মোট রাজস্বের শতাংশ)

সূত্র: আইবাস++, অর্থ বিভাগ।

৩.৩.১ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর রাজস্ব আহরণ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) মূলত আয়কর , আমদানি শুল্ক (Customs Duty), মূল্য সংযোজন কর (VAT) এবং সম্পূরক শুল্ক (Supplementary Duty) এ চারটি প্রধান উৎসের মাধ্যমে কর রাজস্ব আহরণ করে থাকে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরেও মূসক জাতীয় কোষাগারে সর্বোচ্চ অবদানকারী উৎস হিসেবে বহাল রয়েছে, যা এনবিআরের মোট সংগৃহীত রাজস্বের ৩৭.৬ শতাংশ। এর পরেই রয়েছে আয় ও মুনাফার ওপর কর, যার অবদান ৩৪.৪ শতাংশ। এছাড়া সম্পূরক শুল্ক থেকে ১৫.৪ শতাংশ এবং আমদানি শুল্ক থেকে ১০.৫ শতাংশ রাজস্ব অর্জিত হয়েছে। রাজস্বের এই খাতওয়ারি বিন্যাস রাজস্ব কাঠামোর পরোক্ষ করের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতাকেই নির্দেশ করে-যেখানে ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক, আমদানি শুল্ক এবং অন্যান্য করসহ সামগ্রিক পরোক্ষ করের অবদান মোট রাজস্ব আদায়ের ৬৫.৬ শতাংশ। এর বিপরীতে, প্রত্যক্ষ করের অবদান অবশিষ্ট ৩৪.৪ শতাংশ যার মধ্যে আয়করই প্রধান উৎস।

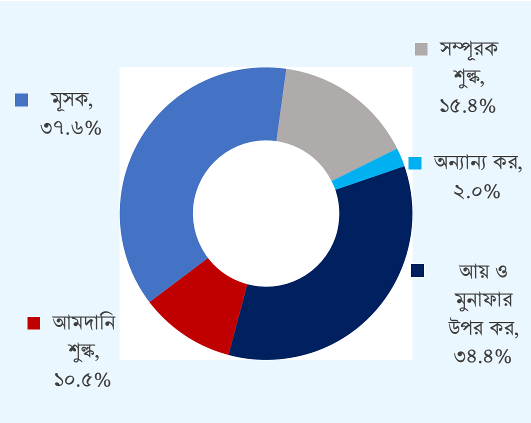

চিত্র ৩.৩ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এনবিআর রাজস্বের উৎসসমূহ (এনবিআর রাজস্বের শতাংশ)

সূত্র: আইবাস++, অর্থ বিভাগ

প্রত্যক্ষ করের একটি বৃহৎ অংশ আবার করপোরেট করদাতাদের নিকট হতে আদায় করা হয়। সাম্য (Fairness), সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা এবং আয় ও সম্পদের পুনর্বণ্টন নিশ্চিতকরণে ব্যক্তিপর্যায়ের আয়কর ব্যবস্থায় প্রগতিশীল কর হার (Progressive Tax Rate) অনুসৃত হলেও সামগ্রিক রাজস্ব আদায় করপোরেট

আয়কর ও অন্যান্য পরোক্ষ করের উপর অতিরিক্ত মাত্রায় নির্ভরশীল। ফলে সামগ্রিক কর কাঠামোতে সাম্য, সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা এবং আয় ও সম্পদের সুষম পুনর্বণ্টন নীতির প্রয়োগ বেশ সীমিত। প্রত্যক্ষ কর আহরণ বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদ্যমান কর-কাঠামোর ভারসাম্য পুনর্নির্ধারণে আরও জোরালো নীতিগত পদক্ষেপ আবশ্যক।

সারণি ৩.৩   এনবিআর কর রাজস্বের উৎসসমূহ (বিলিয়ন টাকা)

উৎস	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
আয় ও মুনাফার উপর কর	৮৭৫	৯৬২	১০৭২	১২৩২	১২৭২
আমদানি শুল্ক	৩১৬	৩৪৪	৩৬২	৩৮৪	৩৮৮
মূসক	১০৩৫	১১৭১	১২৬৩	১৩৮৪	১৩৮৭
সম্পূরক শুল্ক	৩৮৭	৪১২	৪৪৫	৫৩৭	৫৭১
অন্যান্য কর	৩০	৪২	৫৬	৬৮	৭৬
মোট এনবিআর কর	২৬৪৩	২৯৩১	৩১৯৮	৩৬০৭	৩৬৯৪

উৎস: আইবাস++, অর্থ বিভাগ

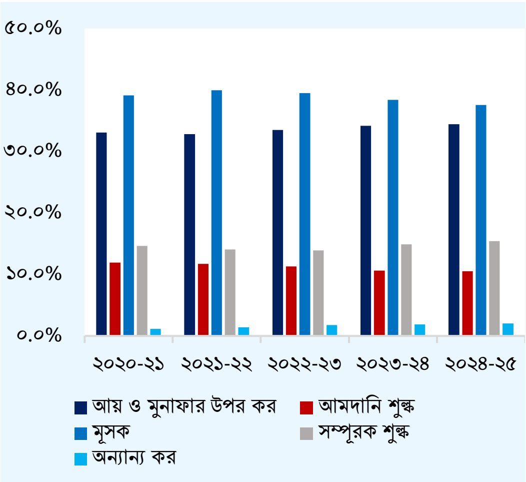

চিত্র ৩.৪   এনবিআর কর রাজস্বের উৎসসমূহ (এনবিআর কর রাজস্বের শতাংশ)

সূত্র: আইবাস++, অর্থ বিভাগ

বিগত পাঁচ বছরে বাংলাদেশে এনবিআর কর রাজস্ব গড়ে ১১.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেলেও রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধির এই ধারাবাহিকতা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিঘ্নিত হয়। প্রবৃদ্ধির হার ২০২০-২১ অর্থবছরের ২২.৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২.৪ শতাংশে নেমে আসে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রবৃদ্ধি হ্রাসের কারণে প্রবৃদ্ধির স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দাঁড়ায় ৭.২ শতাংশ। এর কারণ হিসেবে বৈশ্বিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং অর্থনৈতিক রূপান্তরের প্রভাবকে চিহ্নিত করা যায়। রাজস্বের সব কটি উৎসেই এ নিয়ামকগুলোর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। যদিও মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্ক বিগত পাঁচ বছরে সর্বোচ্চ ১১.৯ শতাংশ গড় প্রবৃদ্ধি বজায় রেখেছিল, তথাপি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এর সম্প্রসারণের গতি মন্থর হয়ে মাত্র ১.৯ শতাংশে দাঁড়ায়। এর পাশাপাশি আমদানি শুল্কের প্রবৃদ্ধিতেও ধীরগতি লক্ষ্য করা যায়, যা মাত্র ১.১ শতাংশে এসে ঠেকে। একইভাবে, আয় ও মুনাফার ওপর করের প্রবৃদ্ধিও এই নিম্নমুখী ধারা অনুসরণ করে; যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১৫.০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মাত্র ৩.২ শতাংশে অবস্থান করে। এনবিআর কর রাজস্ব আহরণের এই সাময়িক চিত্রটি সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা এবং ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত কম কর-জিডিপি অনুপাত উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিগত সংস্কার ও উদ্যোগ গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।

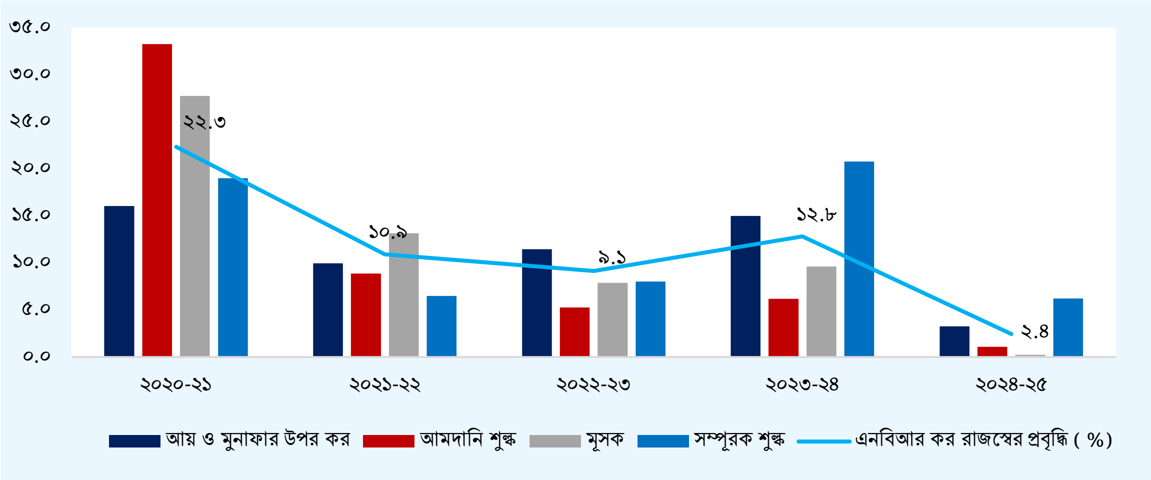

চিত্র ৩.৫ এনবিআর কর রাজস্বের প্রবৃদ্ধি (%)

সূত্র: আইবাস++, অর্থ বিভাগ

৩.৩.২ কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণ

২০২০-২১ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মধ্যবর্তী সময়ে দেশের কর-বহির্ভূত রাজস্ব (এনটিআর) আদায়ের হারে বেশ ওঠানামা দেখা গেছে। এই সময়ে রাজস্ব প্রবৃদ্ধির গড় হার ছিল ৮.৭ শতাংশ। তবে বছরভিত্তিক আদায়ের হারে ব্যাপক বিচ্যুতির কারণে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দাঁড়িয়েছে ২৪.৫ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আদায় ১৫.১ শতাংশ বাড়লেও পরের অর্থবছরেই (২০২১-২২) তা ২৯.৬ শতাংশ কমে যায়। তবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এসে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় কর-বহির্ভূত রাজস্ব আদায় ৩৮.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৫৯৩.১৬ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়। উল্লেখ্য, 'স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান আইন, ২০২০' কার্যকর হওয়ার ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের (SOE) অব্যাবহৃত ও উদ্বৃত্ত অর্থ বিপুল পরিমাণে সরকারি কোষাগারে স্থানান্তরিত হয়। মূলত এই আইনের অধীনে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্ব-শাসিত সংস্থা থেকে 'অন্যান্য প্রাপ্তি' খাতে উদ্বৃত্ত তহবিল স্থানান্তরের ফলেই ২০২০-২১ অর্থবছরে এনটিআর সংগ্রহে এই সাময়িক ও উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল। অপরদিকে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ৩৮.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি দেশের রাজস্ব আহরণ প্রক্রিয়ায় একটি গুণগত ও কৌশলগত পরিবর্তনের বার্তা দেয়। এ অর্থবছরে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আদায়ের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের 'লভ্যাংশ ও মুনাফা' খাত, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১০২.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সামগ্রিক এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক ও পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। নিচের সারণীতে এই অর্থবছরগুলোর কর-বহির্ভূত রাজস্ব (এনটিআর) সংগ্রহের খাত ভিত্তিক চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.৪ কর-বহির্ভূত রাজস্বের উৎসসমূহ (বিলিয়ন টাকা)

	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
মুনাফা ও লভ্যাংশ	১৯.১	৫০.১৯	১৭.৪৫	১২৪.৩৯	২৫১.৪২
	[-৪৫.০]	[১৬২.৮]	[-৬৫.২]	[৬১২.৮]	[১০২.১]
প্রশাসনিক ফি	২০.৪১	২৩.৬৫	২৮.১৫	২৭.০৮	২৭.২৭
	[-১৪.২]	[১৫.৯]	[১৯.০]	[-৩.৮]	[০.৭]
সুদ	৮০.৭২	১৯.৪৯	৫৩.১৪	২১.৪৬	৪৮.৭৩
জরিমানা	৮.৯৩	১০.৯৪	১২.৬৪	১৫.২২	১০.৫৯
পরিষেবা ফি	৩২.৬৯	৫২.৩৭	৬০.৭৭	৮৪.৭২	৭১.২৭
	[-২৪.৩]	[৬০.২]	[১৬.০]	[৩৯.৪]	[-১৫.৯]
ভাড়া ও ইজারা	৭.৪৪	৮.৯২	১১.২৫	১২.৮২	১৪.৬২
টোল/ লেভি	৭.৮৯	৮.৩৩	৯.২৪	৯.৮২	৯.৮১
অবাণিজ্যিক বিক্রয়	১৮.৭২	২৮.০৭	২২.৫২	২২.৭৪	২২.০৮
মূলধন প্রাপ্তি	২.৪৬	৩.০৮	২.৪৭	১.৪৮	২.১৬
অন্যান্য আয় (কর রাজস্ব ব্যতিত)	৩০৭.৩১	১৫০.৯৮	১৭৫.২৫	১০৮.৩৫	১৩৫.২১
মোট কর ব্যতীত রাজস্ব	**৫০৫.৬৭**	**৩৫৬.০২**	**৩৯২.৮৮**	**৪২৮.০৮**	**৫৯৩.১৬**
	[১৫.১]	[-২৯.৬]	[১০.৪]	[৯.০]	[৩৮.৬]

টীকা: ( ) বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা বার্ষিক প্রবৃদ্ধি (%) নির্দেশ করে

উৎস: আইবাস++, অর্থ বিভাগ

৩.৩.৩ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের চিত্র

২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ মেয়াদে সর্বমোট ৩,৩১৫ বিলিয়ন টাকা রাজস্ব সংগৃহীত হয়েছে, যা বার্ষিক সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৫৬.৪ শতাংশ। বরাবরের মতোই রাজস্বের মূল উৎস হিসেবে এনবিআর কর রাজস্বের মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রার ৫৫.৯ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। তবে কর-বহির্ভূত রাজস্ব (এনটিআর) খাতে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৬৭.৮ শতাংশ আদায় হলেও এনবিআর-বহির্ভূত কর রাজস্ব আহরণে ধীরগতি দৃশ্যমান, যেখানে প্রথম নয় মাসে লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৩১.৬ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। ফলে অর্থবছর শেষে সামগ্রিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শেষ প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন) রাজস্ব আদায়ের প্রচেষ্টা জোরদার করা অপরিহার্য।

২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে কর রাজস্ব খাতটি গত অর্থবছরের স্থবিরতা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। এ খাতে প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের ২.৫ শতাংশ হতে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ১০.০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যার মূল চালিকাশক্তি ছিল এনবিআর করের ১০.১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি। বিশেষ করে, মূল্য সংযোজন কর (VAT)- এর প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরের মাত্র ০.১ শতাংশ হতে এবার ১২.৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। একই সাথে আয়কর-এ ১১.৫ শতাংশ এবং আমদানি শুল্ক খাতে পূর্ববর্তী অর্থবছরের ০.২ শতাংশের বিপরীতে ১১.০ শতাংশ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।

সারণি ৩.৫ রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি ২০২৫-২৬ অর্থবছর (বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০২৫-২৬ লক্ষ্যমাত্রা	২০২৫-২৬ সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	২০২৫-২৬ (জুলাই- মার্চ) প্রকৃত আদায়	২০২৫-২৬ (জুলাই- মার্চ) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার %	২০২৪-২৫ (জুলাই-মার্চ) প্রবৃদ্ধি %	২০২৫-২৬ (জুলাই-মার্চ) প্রবৃদ্ধি %
মোট রাজস্ব	৫৬৪০	৫৮৮০	৩৩১৫	৫৬.৪	৮.১	৭.০
কর রাজস্ব	৫১৮০	৫২৩০	২৮৭৫	৫৫.০	২.৫	১০.০
(ক) এনবিআর কর	৪৯৯০	৫০৩০	২৮১২	৫৫.৯	২.৬	১০.১
আয়কর	১৮২০	১৮২১	৯৬৫	৫৩.০	৬.০	১১.৫
আমদানি শুল্ক	৫১৫	৫২১	৩১৭	৬০.৯	০.২	১১.০
মূসক	১৮৮৫	১৮৪৮	১০৮৯	৫৮.৯	০.১	১২.৪
সম্পূরক শুল্ক	৬৮২	৭৩০	৩৭৭	৫১.৬	১.৮	২.১
অন্যান্য কর	৮৭	১১০	৬৩	৫৭.৫	১৩.৮	-২.৮
(খ) এনবিআর বর্হিভূত কর	১৯০	২০০	৬৩	৩১.৬	-২.২	৭.৮
কর বহির্ভূত রাজস্ব (এনটিআর)	৪৬০	৬৫০	৪৪১	৬৭.৮	৫২.৮	-৯.২

উৎস: আইবাস++, অর্থ বিভাগ

২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে কর রাজস্ব খাতটি গত অর্থবছরের স্থবিরতা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। এ খাতে প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের ২.৫ শতাংশ হতে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ১০.০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যার মূল চালিকাশক্তি ছিল এনবিআর করের ১০.১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি। বিশেষ করে, মূল্য সংযোজন কর (মূসক) খাতের প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরের মাত্র ০.১ শতাংশ হতে এবার ১২.৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। একই সাথে আয়কর খাতে ১১.৫ শতাংশ এবং আমদানি শুল্ক খাতে পূর্ববর্তী অর্থবছরের ০.২ শতাংশের বিপরীতে ১১.০ শতাংশ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।

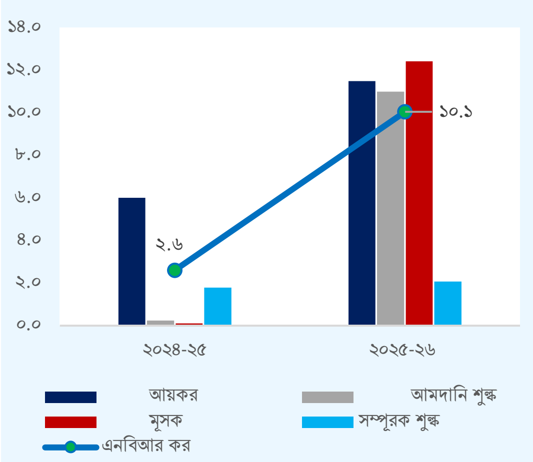

চিত্র ৩.৬ জুলাই-মার্চ সময়কালে এনবিআর রাজস্ব প্রবৃদ্ধি (%)

সূত্র: আইবাস++, অর্থ বিভাগ

এ সময়ে এনবিআর-বহির্ভূত কর রাজস্ব পূর্ববর্তী মেয়াদের ঋণাত্মক ২.২ শতাংশ থেকে ৭.৮ শতাংশ ইতিবাচক প্রবৃদ্ধিতে উন্নীত হয়েছে। অপরদিকে, পূর্ববর্তী অর্থবছরের উচ্চ ভিত্তির (High Base Effect) কারণে সৃষ্ট প্রভাবের ফলে চলতি মেয়াদে কর-বহির্ভূত রাজস্ব (এনটিআর) খাতে ৯.২ শতাংশ সংকোচন বা ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি দেখা গেলেও সামগ্রিক আহরণ সন্তোষজনক রয়েছে। মূলত এই

এনটিআর খাতের সাময়িক হ্রাসের প্রভাবেই মোট রাজস্ব প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরের ৮.১ শতাংশের তুলনায় সামান্য কমে হয়ে ৭.০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

৩.৪ রাজস্ব আদায়ের গতিধারা এবং কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়

৩.৪.১ রাজস্ব বয়েন্সি (Revenue Buoyancy)

রাজস্ব বয়েন্সি (Revenue Buoyancy) রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। জিডিপি পরিবর্তনের সাথে রাজস্ব আদায় কিভাবে পরিবর্তন হয় বয়েন্সি তা পরিমাপ করে। বয়েন্সির মান ০১ (এক) এর চেয়ে বেশি হলে বোঝা যায় যে রাজস্বের প্রবৃদ্ধি জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির চেয়ে বেশি হচ্ছে পক্ষান্তরে ০১ (এক) এর চেয়ে কম হলে তা নির্দেশ করে যে রাজস্ব প্রবৃদ্ধি অর্থনীতির প্রসারণের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে।

চলতি মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার এবং রাজস্ব বৃদ্ধির হার ব্যবহার করে ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশের জন্য রাজস্ব বয়েন্সি গণনা করা হয়েছে। এ সময় বাংলাদেশের রাজস্ব বয়েন্সি (Revenue Buoyancy)-তে বড় ধরণের ওঠানামা পরিলক্ষিত হয়েছে; যেমন-২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্ব বয়েন্সি সর্বোচ্চ ২.১০-এ পৌঁছানোর পর ২০২১-২০২২ অর্থবছরে তা সর্বনিম্নে অর্থাৎ ০.১৫-এ নেমে আসে। এই ওঠানামা অর্থবছর ২০২৫-এও বজায় ছিল, যেখানে রাজস্ব বয়েন্সি হ্রাস পেয়ে ০.৬০-এ দাঁড়ায়। ফলশ্রুতিতে, ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত রাজস্ব বয়েন্সির গড় দাঁড়িয়েছে ০.৯৩, যা নির্দেশ করে যে রাজস্ব প্রবৃদ্ধি কাঠামোগতভাবেই চলতি মূল্যে জিডিপি সম্প্রসারণের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে এবং রাজস্ব আহরণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। রাজস্ব বয়েন্সির এই ওঠানামা দেশের ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক রূপান্তরের পথে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তাই রাজস্ব আহরণকে আরও টেকসই করতে আদায় প্রক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গ ডিজিটালাইজেশন এবং কাঠামোগত প্রশাসনিক সংস্কারের গতি ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন।

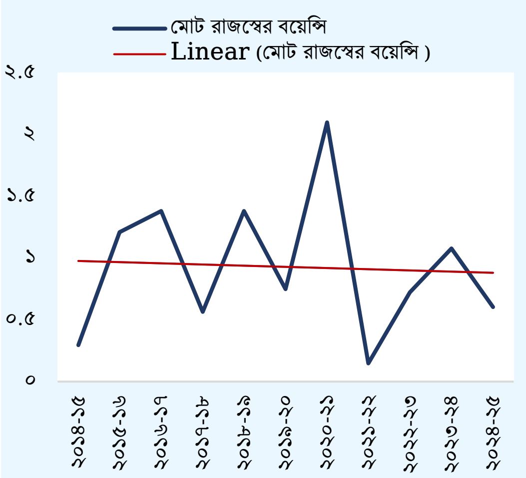

চিত্র ৩.৭ রাজস্ব বয়েন্সি (Revenue Buoyancy)

সূত্র: আইবাস++, অর্থ বিভাগ

৩.৪.২ রাজস্ব-জিডিপির তুলনামূলক বিশ্লেষণ

প্রতিবেশী দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমপর্যায়ের দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের অর্থনীতির আকারের বিপরীতে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কম। বিগত এক দশকের রাজস্ব-জিডিপি অনুপাতের তুলনামূলক চিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সমপর্যায়ের অন্যান্য দেশগুলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাদের রাজস্ব আহরণ সক্ষমতা বাড়াতে পারলেও, বাংলাদেশ এখনো একটি সংকীর্ণ রাজস্ব ভিত্তি এবং নিম্নমুখী আদায় দক্ষতার বৃত্তে রয়ে গেছে। চিত্র ৩.৮-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সাল নাগাদ এই আঞ্চলিক ব্যবধান আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ, যেখানে ভুটান সর্বোচ্চ ২৭.৮ শতাংশ রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত অর্জন করেছে, যার পর রয়েছে ভারত (২১.০ শতাংশ), মিয়ানমার (২০.৩ শতাংশ), ভিয়েতনাম (১৯.৯ শতাংশ) এবং নেপাল (১৯.৯ শতাংশ)—সেখানে বাংলাদেশের এই অনুপাত অত্যন্ত হতাশাজনক, মাত্র ৭.৯ শতাংশ।

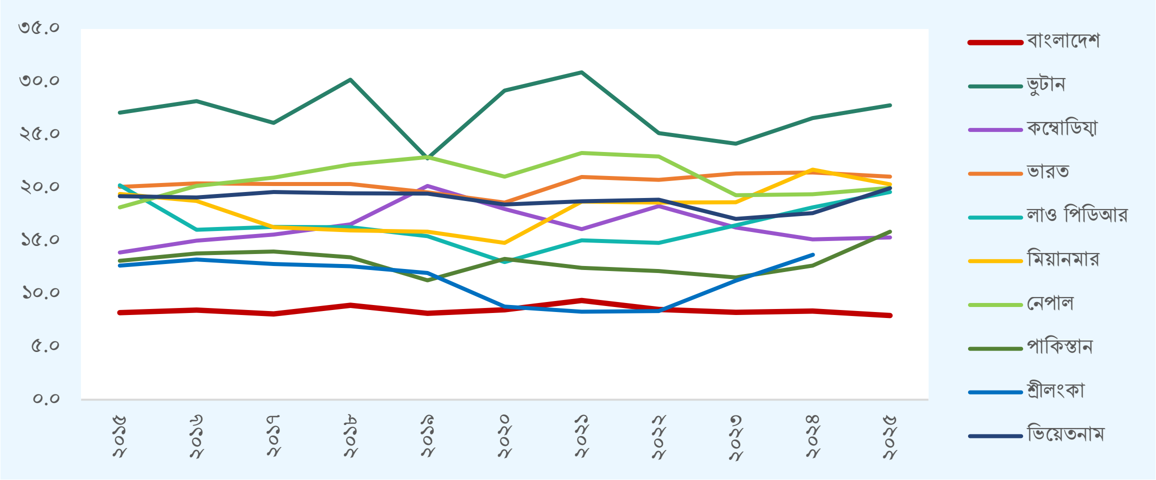

চিত্র ৩.৮ মোট রাজস্ব (General Government Revenue) (জিডিপির %)

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, আইএমএফ এপ্রিল ২০২৬

রাজস্ব আহরণের এই ধারাবাহিক নিম্নমুখী প্রবণতা থেকে উত্তরণ দক্ষতার সাথে কর আদায়ের জন্য প্রয়োজন কর নীতি ও প্রশাসনে কাঠামোগত সংস্কার ও আধুনিকীকরণ। বিশেষ করে, একটি বিশাল অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি (Informal Economy) এবং ঐতিহ্যগত বড় কৃষি খাতের সিংহভাগ প্রাতিষ্ঠানিক কর কাঠামোর বাইরে থাকায় তা কর প্রশাসনের দক্ষতা ও আওতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। পাশাপাশি, সামগ্রিক কর আদায় প্রক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গ ডিজিটালাইজেশনের অভাব এবং কর সচেতনতা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে না হওয়ায় কর আদায়ের কার্যকারিতা বৃদ্ধির পথে বড় বাধা। এই অঞ্চলের অন্যান্য উদীয়মান দেশগুলোর রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত—যেমন পাকিস্তান (১৫.৮ শতাংশ), কম্বোডিয়া (১৫.৩ শতাংশ) এবং শ্রীলঙ্কার (২০২৪ সালে ১৩.৭ শতাংশ)-পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এসব দেশে রাজস্বের পরিধি বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত। এই আঞ্চলিক তুলনামূলক চিত্রটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে অব্যবহৃত অভ্যন্তরীণ উৎসগুলো থেকে রাজস্ব আহরণ ব্যাপক মাত্রায় বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তাকে স্পষ্ট করে। ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির লক্ষ্য পূরণের অর্থায়নের জন্য রাজস্ব-জিডিপির এই নিম্ন হারের প্রবণতা হতে অতি দ্রুত উত্তরণ করতে হবে। কর জাল সম্প্রসারণ এবং আদায় দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ জোর দিয়ে সরকার ২০৩৫ সালের মধ্যে কর-জিডিপি অনুপাত ১৫ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন দেশের আর্থিক সক্ষমতাকে তার দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগান দেবে।

৩.৪.৩ কর পরিপালন (Compliance) পরিস্থিতি

বর্তমান কর ব্যবস্থার সার্বিক চিত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশে করদাতা সনাক্তকরণ নম্বর (TIN) ধারীদের সংখ্যা এবং প্রকৃত আয়কর রিটার্ন দাখিলের পরিমাণের মধ্যে একটি ধারাবাহিক বড় ব্যবধান রয়ে গেছে। যদিও ২০২৪-২৫ অর্থবছর নাগাদ নিবন্ধিত টিআইএন ধারীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ১২.০ মিলিয়নে পৌঁছেছে, তবে তাদের একটি বিশাল অংশ কর পরিপালনের বাইরে রয়ে গেছেন। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে

গেলে, আলোচ্য সময়ে ৪.৬ মিলিয়ন রিটার্ন দাখিল করা হয়েছে; অর্থাৎ প্রায় ৬২ শতাংশ টিআইএন ধারীই রিটার্ন জমা দেননি। ফলশ্রুতিতে, TIN ধারী ও TIN নিবন্ধনের বাইরে থাকা বিপুল সংখ্যক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর পরিপালনের আওতার বাইরে রয়ে গেছে।

পূর্ববর্তী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আয়কর রিটার্ন দাখিলের পরিমাণ ছিল ৩.৭ মিলিয়ন; অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ২.১ শতাংশ কর জালের আওতায় এসেছেন। অন্যান্য উদীয়মান বা উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের কর পরিপালনের (Tax Compliance) এর ক্ষেত্রে স্তর লক্ষ্যণীয়ভাবে পিছিয়ে রয়েছে। তবে এর মাঝেও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আয়কর রিটার্ন দাখিলের সংখ্যায় ২৪.৩ শতাংশের একটি উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, মোট জনসংখ্যার অনুপাতে আয়কর রিটার্ন জমাকারীর হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের ২.১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২.৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। যদিও টিআইএন TIN ধারীদের রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত কর পরিপালন পরিহারের হার (Non-Compliance Rate) ধীরে ধীরে কমেছে—যা ২০২১-২২ অর্থবছর এর ৭০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৬২ শতাংশে নেমে এসেছে—তথাপি এই ঘাটতির বিশাল আকার রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে এখনও একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন দৃশ্যমান হচ্ছে, যেখানে বাধ্যতামূলক অনলাইন রিটার্ন দাখিল ব্যবস্থার কারণে মার্চ পর্যন্ত জমাকৃত রিটার্নের সংখ্যায় ২৪.৩ শতাংশের একটি বড় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। এই ইতিবাচক প্রবণতা ইঙ্গিত দেয় যে, কর পরিপালনের ঘাটতি হ্রাস এবং একটি নিয়মতান্ত্রিক কর সংস্কৃতি বিনির্মাণে প্রযুক্তিনির্ভর সংস্কার ও ডিজিটাল ব্যবস্থার প্রয়োগই প্রধান চালিকাশক্তি।

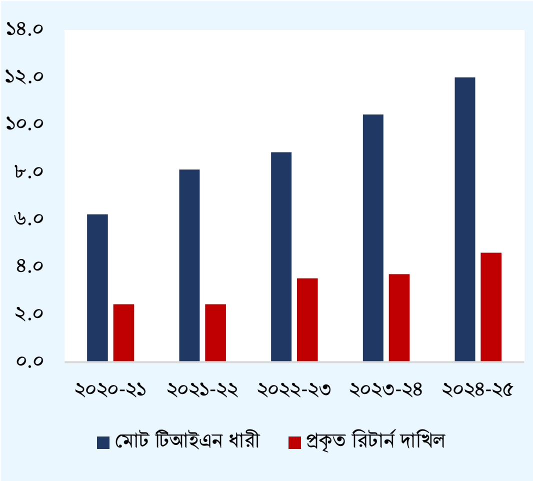

চিত্র ৩.৯ টিআইএন ও রিটার্ন দাখিলকারীর সংখ্যা (মিলিয়নে)

সূত্র: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

৩.৫ মধ্যমেয়াদে রাজস্ব আহরণের চিত্র

মধ্যমেয়াদি রাজস্ব কাঠামোর মূল অভীষ্ট হলো একটি প্রযুক্তিনির্ভর ও ন্যায়সংগত কর ব্যবস্থায় রূপান্তরের মাধ্যমে বিকাশমান অর্থনীতির উপযোগী টেকসই আর্থিক ভিত্তি স্থাপন করা। প্রবৃদ্ধি-সহায়ক ব্যয় নির্বাহে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের সুনির্দিষ্ট প্রয়াস হিসেবে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ৫.৮৮ ট্রিলিয়ন টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই প্রাক্কলিত রাজস্বের প্রধান অংশই কর রাজস্ব থেকে সংগৃহীত হবে, যার পরিমাণ ৫.২৩ ট্রিলিয়ন টাকা। এর ফলে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ৯.৭ শতাংশে উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা অর্জিত হলে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ৭.৯ শতাংশের তুলনায় একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হবে। এই কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনে মূলত আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর (মূসক)-এর পরিধি সম্প্রসারণের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদে মোট রাজস্ব আহরণ ২০২৬-২৭ অর্থবছরের ৬.৯৫ ট্রিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৮-২৯ অর্থবছর নাগাদ ৯.২৫ ট্রিলিয়ন টাকায় পৌঁছাবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। এই সময়কালে রাজস্ব-জিডিপি

অনুপাত গড়ে ১০.৪ শতাংশে স্থিতিশীল থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা ২০২৮-২৯ অর্থবছরে ১০.৭ শতাংশে উন্নীত হবে। খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে, ২০২৬-২৭ অর্থবছরে এনবিআর কর রাজস্ব ৬.০৪ ট্রিলিয়ন টাকা (জিডিপির ৮.৮ শতাংশ) প্রাক্কলন করা হয়েছে; যা পরবর্তী ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ৭.০২ ট্রিলিয়ন টাকা (জিডিপির ৯.১ শতাংশ) এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছর নাগাদ ৮.১০ ট্রিলিয়ন টাকায় (জিডিপির ৯.৩ শতাংশ) উন্নীত হতে পারে। পাশাপাশি, কর-বহির্ভূত রাজস্ব (এনটিআর) ২০২৮-২৯ অর্থবছরের মধ্যে ০.৮৭ ট্রিলিয়ন টাকায় পৌঁছাবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা জিডিপির ১.০ শতাংশের একটি ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে।

সারণি ৩.৬ রাজস্ব আহরণের মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ (বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০২৪-২৫ প্রকৃত	২০২৫-২৬ বাজেট	২০২৫-২৬ সংশোধিত বাজেট	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮ প্রক্ষেপণ	২০২৮-২৯
মোট রাজস্ব	৪,৩৬৯	৫,৬৪০	৫,৮৮০	৬,৯৫০	৭,৯৯০	৯,২৪৫
কর রাজস্ব	৩,৭৭৬	৫,১৮০	৫,২৩০	৬,২৯০	৭,২৮৮	৮,৩৭৫
এনবিআর কর	৩,৬৯৪	৪,৯৯০	৫,০৩০	৬,০৪০	৭,০১৭	৮,০৯৫
এনবিআর বহির্ভূত কর	৮২	১৯০	২০০	২৫০	২৭১	২৮০
এনটিআর	৫৯৩	৪৬০	৬৫০	৬৬০	৭০২	৮৭০

সূত্র: অর্থ বিভাগ

এই লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনে সরকারের মূল কৌশল হলো—'বিনিয়োগ-উৎপাদন-কর্মসংস্থান-ভোগ-কর' চক্রটিকে গতিশীল করা। অতিরিক্ত করের বোঝা না চাপিয়ে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পুনরুজ্জীবন এবং কর প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণের মাধ্যমে টেকসই রাজস্ব প্রবৃদ্ধি অর্জনই এই কৌশলের মূল ভিত্তি। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো ডিজিটাল রূপান্তরের মাধ্যমে কর প্রশাসনের সক্ষমতা জোরদার করা, যার লক্ষ্য কর পরিপালন প্রক্রিয়াকে সহজতর এবং রাজস্ব আহরণের সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা। কর প্রশাসনের আধুনিকায়ন ও সার্বিক ডিজিটাইজেশনকে প্রাধান্য দিয়ে এই কৌশলের আওতায় করের আওতা বৃদ্ধি এবং প্রচ্ছন্ন অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো হবে, যা একটি টেকসই ও ন্যায়সংগত প্রগতিশীল কর কাঠামো গড়ে তুলবে। তদুপরি, রাজস্ব ফাঁকি বা অপচয় (Revenue Leakage) কমানোর লক্ষ্যে কর ছাড়ের যৌক্তিকীকরণ এবং এনবিআর-বহির্ভূত কর ও কর-বহির্ভূত রাজস্ব (এনটিআর) খাতে সুশাসন ও শৃঙ্খলার উন্নয়ন দেশের সামগ্রিক আর্থিক স্থিতিশীলতাকে আরও সুদৃঢ় করবে। সর্বোপরি, এই সুদূরপ্রসারী আর্থিক রূপকল্পের সফল প্রতিফলন মূলত একটি স্থিতিশীল সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশ, নিয়ন্ত্রিত মূল্যস্ফীতি এবং নিরবচ্ছিন্ন সাপ্লাই-চেইন (সরবরাহ শৃঙ্খল) সমন্বয়ের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

৩.৬ রাজস্ব আহরণ কৌশল ও সংস্কার উদ্যোগ

বাংলাদেশে রাজস্ব সংগ্রহে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি রয়েছে, যা দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে একটি বড় সীমাবদ্ধতা হিসেবে কাজ করছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাত ছিল মাত্র ৬.৮ শতাংশ। এটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যে কোনো মানদণ্ডের তুলনায় অনেক কম, এবং এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের গড় ১৯.৫ শতাংশের তুলনায় অনেক নিচে (প্রেসমি, ২০২৫; ওইসিডি/এডিবি, ২০২৫)। একই অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক নির্ধারিত সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪,৬৩৫ বিলিয়ন টাকা যার বিপরীতে আদায় হয়েছে ৩,৬৯৪ বিলিয়ন টাকা, ফলে রাজস্ব ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৯৪১ বিলিয়ন

টাকারও বেশি। এই ধারাবাহিক রাজস্ব ঘাটতির জন্য রাজস্ব ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোগত কিছু সীমাবদ্ধতাও দায়ী। এর মধ্যে রয়েছে একটি বৃহৎ আকারের অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি, যা মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৮৫ শতাংশ এবং জিডিপির ৪৩ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব করে; সীমিত করদাতা ভিত্তি; ক্ষুদ্র কর জাল, যেখানে সক্রিয় আয়কর দাখিলকারী প্রকৃত জনসংখ্যার একটি সামান্য অংশ মাত্র; এবং কর অব্যাহতি, যার সম্মিলিত আনুমানিক মূল্য সংগৃহীত মোট করের প্রায় সমান (আইএলও, ২০২৫; ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট, ২০২৫; আইএমএফ, ২০২৫; বিশ্বব্যাংক, ২০২৫)। এছাড়া, রাজস্ব প্রশাসনের সক্ষমতা এবং সমগ্র এনবিআর-ব্যাপী ডিজিটালকরণের অভাবও রাজস্ব ব্যবস্থাপনার দক্ষতাকে প্রভাবিত করছে। এই প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এনবিআর-এর আয়কর, ভ্যাট এবং কাস্টমস বিভাগজুড়ে একাধিক সংস্কার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

৩.৭ কর ব্যয়ের বর্তমান চিত্র

সরকার করের স্বাভাবিক বিধানাবলীর বাইরে যেয়ে যেটুকু কর ছাড় দেয় বা পরিত্যাগ করে তাকে কর ব্যয় (Tax Expenditure) বলে। বাংলাদেশ সরকার কর অব্যাহতি, হ্রাসকৃত করহার, কর অবকাশ, কর রেয়াত এবং কর ফেরত প্রভৃতি অগ্রাধিকারমূলক (Preferential) কর বিধানের কারণে আয়কর, মূল্য সংযোজন কর এবং কাস্টমস শুল্ক খাতে উল্লেখযোগ্য রাজস্ব হারাচ্ছে।

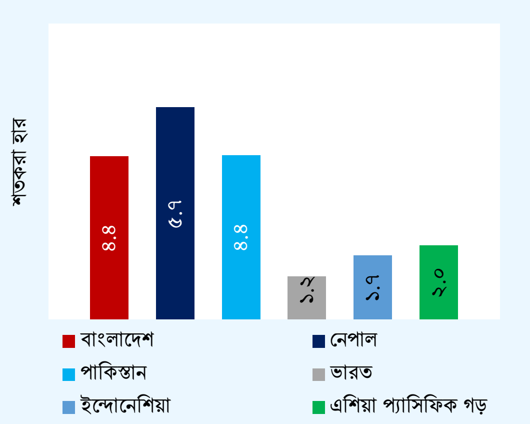

চিত্র ৩.১০ কর ব্যয় (Tax-Expenditure) (জিডিপির %)

সূত্র: Country Report and Asian Development Outlook 2022

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর প্রত্যক্ষ কর ব্যয় প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য প্রযোজ্য 'প্রত্যক্ষ কর ব্যয়'-এর মোট প্রাক্কলিত পরিমাণ হল ১,০৭১.৩২ বিলিয়ন টাকা, যা জিডিপির ২.৩৯ শতাংশ এবং মোট প্রত্যক্ষ কর আহরণের প্রায় ৯৯ শতাংশের সমান। অন্যদিকে, মূল্য সংযোজন কর ব্যয় প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ভ্যাট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১,২৯৭.৭০ বিলিয়ন টাকা, যা জিডিপির ৩.২৬ শতাংশের সমান। একই সময়ে কাস্টমস-সম্পর্কিত কর ব্যয় ছিল জিডিপির ০.৭৬ শতাংশ। সমষ্টিগতভাবে, তিনটি বিভাগে কর ব্যয়ের সম্মিলিত পরিমাণ ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপির প্রায় ৪.৪১ শতাংশে দাঁড়ায়। তবে বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের কর অব্যাহতির পরিমাণ প্রকৃত কর আদায়ের প্রায় সমান (বিশ্বব্যাংক, ২০২৫)।

৩.৮ বাংলাদেশের রাজস্ব সংস্কার এজেন্ডা

বর্তমান সরকার এক ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি অর্জনের লক্ষ্য ঘোষণা করেছে। এ লক্ষ্য পূরণে ২০৩৫ সালের মধ্যে কর-জিডিপি অনুপাতকে ৬.৮ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫

শতাংশে উন্নীত করতে হবে এবং মধ্যম মেয়াদে অন্তর্বর্তী লক্ষ্য ১০ শতাংশ অর্জন করতে হবে। ফলে, করভিত্তি সম্প্রসারণ, করদাতাদের স্বতঃস্ফূর্ত কর পরিপালন (Tax Compliance) বৃদ্ধি, কর ও ভ্যাটের আওতা বৃদ্ধি, অপ্রয়োজনীয় কর অব্যাহতি অপসারণ, রাজস্ব প্রশাসনের পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন, কর আদায় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে রাজস্বনীতিতে রাজস্ব প্রবৃদ্ধির জন্য একটি বিনিয়োগ-কেন্দ্রিক কৌশল গ্রহণ অপরিহার্য যা টেকসই রাজস্ব সম্প্রসারণ, অনানুষ্ঠানিক খাতসমূহকে আনুষ্ঠানিক খাতে রূপান্তর, উৎপাদনশীল বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে সহায়তা প্রদান করবে।

রাজস্ব নীতি ও প্রশাসনের ভবিষ্যৎ সংস্কারের গতিপ্রকৃতি ও রূপরেখা নির্ধারণের লক্ষ্যে সরকার একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ প্রেক্ষিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা রাজস্ব ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। একইসাথে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণ এবং রাজস্ব নীতি ও প্রশাসনকে আরও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে একটি বৃহৎ পরিসরের আধুনিকায়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

৩.৮.১ অর্থনীতি পুনঃকৌশল নির্ধারণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স

জাতীয় কর ব্যবস্থা পুনর্গঠন টাস্কফোর্স ‘Tax Policy for Development: A Reform Agenda for Restructuring the Tax System’ শীর্ষক প্রতিবেদন দাখিল করেছে। প্রতিবেদনটিতে করনীতি ও রাজস্ব প্রশাসনের কার্যকর পৃথকীকরণ, একটি তদারকি কমিটি গঠন এবং রাজস্ব সংস্কার কমিশন প্রতিষ্ঠার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) ও আয়করের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক অনলাইন রিটার্ন দাখিল নিশ্চিতকরণ এবং ম্যানুয়াল রিটার্ন দাখিল বিলোপের সুপারিশ করা হয়েছে, এতে কর ফাঁকির সুযোগ এবং করদাতা ও কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সীমিত করবে। এছাড়াও, প্রতিবেদনটিতে কর ব্যয় (Tax Expenditure) পদ্ধতির সংস্কারকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে শুল্ক এসআরও সমূহের জন্য সংসদীয় অনুমোদন বাধ্যতামূলক করার, চুক্তিভুক্ত নয় এমন শূন্যহার শুল্ক সুবিধা বিলুপ্তকরণ, শুল্ক ছাড়পত্র প্রক্রিয়া সরলীকরণ এবং প্রকৃত অর্থনৈতিক অবদান বিবেচনার ভিত্তিতে কর অবকাশসমূহের মূল্যায়ন নিশ্চিত করার সুপারিশ করা হয়েছে।

৩.৮.২ দশ-বছর মেয়াদী কৌশলগত কাঠামো: মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি রাজস্ব কৌশল

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রণীত Medium- and Long-Term Revenue Strategy (এমএলটিআরএস) একটি সময়সীমাভিত্তিক রাজস্ব সংস্কার কাঠামো। প্রতিবেদনটিতে করভিত্তি সম্প্রসারণ, স্বেচ্ছা কর পরিপালন জোরদার, রাজস্ব প্রশাসনের আধুনিকায়ন এবং এক দশকের মধ্যে কর-জিডিপি অনুপাতকে সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য একটি কাঠামোবদ্ধ রোডম্যাপ নির্ধারণ করা হয়েছে। এমএলটিআরএস (MLTRS) ছয়টি পারস্পরিক সহায়ক কৌশলগত উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে গঠন করা হয়েছে: আনুষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে কর ভিত্তি সম্প্রসারণ; সরলীকরণ ও করদাতার আস্থা-অর্জনের মাধ্যমে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত পরিপালন সুদৃঢ়করণ; ডিজিটাল রূপান্তরের মাধ্যমে প্রশাসনিক আধুনিকায়ন; এবং আইনি সংস্কার ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে অভিন্নতা (Uniformity) নিশ্চিতকরণ ও আর্থিক সুশাসন সুদৃঢ়করণ। এই কৌশলের মাধ্যমে উল্লিখিত সব উদ্দেশ্যকে একত্রে একটি সমন্বিত দশবছরব্যাপী কাঠামোর মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে।

৩.৮.৩ অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (SDRMP)

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিশ্বব্যাংকের সহযোগীতায় ১,০০০ কোটি টাকার Strengthening Domestic Revenue

Mobilisation Project (SDRMP) প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যা এনবিআর-এর অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ সক্ষমতা সুদৃঢ়করণ এবং এমএলটিআরএস-এর আওতায় পরিকল্পিত রূপান্তরসমূহকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের কৌশল প্রণয়ন করবে। বারোটি উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে গঠিত এসডিআরএমপি একটি বহুমাত্রিক ডিজিটাল রূপান্তর কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত যা ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া পুনঃনকশা, আয়কর ও ভ্যাট প্রশাসনের পূর্ণাঙ্গ স্বয়ংক্রিয়করণ; Integrated VAT Administration System (IVAS)-এর ERP সমন্বয়সহ সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন; দেশব্যাপী ই-ইনভয়েসিং ব্যবস্থা; কাস্টমস ও DEDO ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ার পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়করণ; বিভিন্ন কর ইউনিটকে একত্রিত করে একটি ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন নম্বর চালু করা; ASYCUDA World, IVAS, আইবাস++ এবং অন্যান্য সরকারি প্ল্যাটফর্মের মধ্যে আন্তঃসংযোগ নিশ্চিত করা; স্বয়ংক্রিয় করদাতা কল সেন্টার, ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, আয়কর প্রশিক্ষণ একাডেমি ও মূসক অফিস অবকাঠামো প্রতিষ্ঠাকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি বাংলাদেশের রাজস্ব প্রশাসন আধুনিকীকরণে এ যাবতকালের গৃহীত সর্ববৃহৎ একক প্রকল্প।

৩.৮.৪ কর ব্যয় নীতিমালা ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো

Tax Expenditure Policy and Management Framework (TEPMF) বাংলাদেশের রাজস্ব সংস্কার এজেন্ডা কর ব্যয় যৌক্তিকীকরণের প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা প্রণয়নের মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করেছে। এই কাঠামো বাংলাদেশের অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ কর ব্যয় সমস্যার সমাধান করার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছ (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ২০২৫)। বাংলাদেশের কর অব্যাহতির পরিমাণ প্রায় সংগৃহীত মোট করের সমপরিমাণ বলে অনুমান করা হয়। এতে করভিত্তি সীমিত হয়ে পড়ে এবং রাজস্ব আহরণ বাধাগ্রস্ত হয় (পেসমি, ২০২৫)।

TEPMF একটি স্বচ্ছ এবং বিধিভিত্তিক কর ব্যয় কাঠামো প্রবর্তন করেছে, যার আওতায় নতুন সব ধরণের কর অব্যাহতির জন্য সংসদীয় অনুমোদন বাধ্যতামূলক। একই সঙ্গে এর মাধ্যমে বিদ্যমান কর অব্যাহতির আর্থিক সংশ্লেষের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং এসব অব্যহতির অর্থনৈতিক কার্যকারিতা ও বণ্টনগত (Redistributive) প্রভাব মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট সময় পরপর পর্যালোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই কাঠামোর আওতায় অর্থনৈতিক ভাবে অলাভজনক ছাড়সমূহ প্রত্যাহার করা যাবে, এতে সংবিধিবদ্ধ (Statutory) রেগুলেটরি অর্ডার (SRO)-এর স্বেচ্ছামূলক ব্যবহারকে অধিকতর আইনগত জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসবে।

৩.৯ রাজস্ব আহরণ শক্তিশালীকরণ উদ্যোগ

অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ শক্তিশালীকরণ, স্বেচ্ছামূলক বিবেচনার সুযোগ হ্রাস, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং রাজস্ব প্রশাসনে ডিজিটাইজেশন জোরদার করার লক্ষ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.৯.১ কর রাজস্ব সংস্কার উদ্যোগসমূহ

৩.৯.১.১ আয়কর সংস্কার উদ্যোগসমূহ

- **আইনগত ও নীতিগত উদ্যোগ:** আইন ও নীতি উদ্যোগের অংশ হিসেবে ২০২৩ সালের আয়কর আইন প্রণীত হয়েছে। এর ফলে একটি সহজবোধ্য, সহজে পরিপালনযোগ্য ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রত্যক্ষ কর কাঠামো প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। ২০২৫ সালে একটি আনুষ্ঠানিক ইংরেজি সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে, যা বিদেশি বিনিয়োগকারী ও কর চুক্তির

অংশীজনদের জন্য আইনগত স্বচ্ছতা ও নিশ্চয়তা বৃদ্ধি করেছে।

- **করনেট ও প্রশাসনিক সংস্করন:** ২০২৫ অর্থবছরের রিটার্ন দাখিলের বর্ধিত সময়সীমা শেষে (৩১ মার্চ ২০২৬) নিবন্ধিত টিআইএনধারীর সংখ্যা প্রায় ১.২৮ কোটি এবং দাখিলকৃত কর রিটার্নের সংখ্যা প্রায় ৪৩ লক্ষ-এ পৌঁছেছে। উক্ত অর্থবছর থেকে এনবিআর ব্যক্তিগত আয়কর রিটার্ন অনলাইনে দাখিল বাধ্যতামূলক করেছে। পাশাপাশি কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণপত্র প্রদানের শর্ত সরকারি ও বেসরকারি মোট পঁয়তাল্লিশটি সেবার ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়েছে। এর ফলে টিআইএন নিবন্ধন এবং রিটার্ন দাখিল উভয় ক্ষেত্রেই করদাতার অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

- **ডিজিটাল পরিপালন, সিস্টেম একীভূতকরণ (Integration) ও সিস্টেমের আন্তঃকার্যকারিতা:** আয়কর ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার উদ্যোগ হলো ডিজিটাল আয়কর কমপ্লায়েন্স এবং সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থার সম্প্রসারণ। উল্লেখ্য, সকল ব্যক্তি করদাতার জন্য অনলাইন রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করার ফলশ্রুতিতে প্রায় ৪.৩ মিলিয়ন ইলেকট্রনিক রিটার্ন দাখিল সম্পন্ন হয়েছে। একই সঙ্গে Tax Representative Management System চালু করা হয়েছে, যা কর পরামর্শক বা প্রতিনিধির মাধ্যমে রিটার্ন দাখিল সহজ করেছে। এছাড়া বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশিরাও এখন সম্পূর্ণ অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারছেন। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে এ-চালান পদ্ধতিতে কর পরিশোধ সরাসরি সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হচ্ছে। একই সময়ে ASYCUDA World এবং ই-রিটার্ন প্ল্যাটফর্মের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনের ফলে আমদানি পর্যায়ে প্রদত্ত অগ্রিম আয়কর স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমন্বিত হচ্ছে এবং ঘোষিত আয়ের সঙ্গে আমদানি তথ্য যাচাই করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া ব্যাংকিং ব্যবস্থার সঙ্গে চলমান সমন্বয়ের মাধ্যমে ভবিষ্যতে ব্যাংক হিসাবের স্থিতি, সুদ আয় এবং উৎসে কর্তিত করের তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে ই-রিটার্নে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হবে, যা তথ্যের নির্ভুলতা বৃদ্ধি করবে এবং করদাতার অনুগত্য ব্যয় হ্রাস করবে।

- **স্বয়ংক্রিয় ও ঝুঁকিভিত্তিক অডিট (Risk Based and Automated Audit):** এনবিআর স্বয়ংক্রিয় আয়কর অডিট নির্বাচন প্রক্রিয়া প্রবর্তন করেছে। ২০২৩-২৪ কর বছরের ১৫,৪৯৪টি রিটার্ন সম্পূর্ণ দৈবচয়ন পদ্ধতিতে এবং প্রায় ৭২,৩৪১টি রিটার্ন নির্ধারিত ঝুঁকি মানদণ্ডের ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয় পর্যালোচনার আওতায় নির্বাচন করা হয়েছে। ম্যানুয়াল নিরীক্ষা ও নির্বাচন ব্যবস্থা বাতিল করা হয়েছে, যার ফলে প্রশাসনিক বিবেচনায় অডিটের জন্য রিটার্ন বাছাই এবং স্বেচ্ছামূলক বিবেচনা প্রয়োগের সুযোগ কমেছে। একই সঙ্গে কর কর্মকর্তাদের ASYCUDA World-এর আমদানি তথ্য ব্যবহার ও যাচাই-এর সুযোগ প্রদান করা হয়েছে, ফলে আয়কর ও ভ্যাটের জন্য প্রদর্শিত আয়ের ক্রস-ভেরিফিকেশন এবং প্রমাণ-ভিত্তিক কর নির্ধারণের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে।

৩.৯.১.২ ভ্যাট সংস্কার উদ্যোগ

- **নীতি ও কাঠামোগত সংস্কার:** নীতি ও কাঠামোগত সংস্কার: ২০২৫ সালের মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (সংশোধন)

অধ্যাদেশের মাধ্যমে মূল ভ্যাট কাঠামো হালনাগাদ করা হয়েছে, করযোগ্য কার্যক্রমের পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে এবং ভ্যাট ও এসডি আইন, ২০১২ ও বিধিমালা, ২০১৬-এর প্রামাণ্য ইংরেজি পাঠ গেজেটভুক্ত করা হয়েছে। ভ্যাট নিবন্ধন সীমা ৩ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ৫০ লক্ষ টাকা এবং টার্নওভার করের সীমা ৫০ লক্ষ টাকা থেকে কমিয়ে ৩০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, ফলে পূর্বে ভ্যাট কাঠামোর বাইরে থাকা বিপুল সংখ্যক ব্যবসা এখন আনুষ্ঠানিক ভ্যাট নেটের আওতায় এসেছে।

- **করভিত্তি সম্প্রসারণ এবং প্রশাসনিক কাঠামো:** ২০২৪-২৫ অর্থবছরে নিবন্ধিত ভ্যাট প্রদানকারীর সংখ্যা ৫ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮ লক্ষে পৌঁছেছে। ভ্যাট অনলাইন সিস্টেম বর্তমানে চৌদ্দটি কার্যকর মডিউলের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে, যার আওতায় অনলাইন ভ্যাট ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, নিরীক্ষা, মামলা ব্যবস্থাপনা, নথি ব্যবস্থাপনা এবং মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

- **ডিজিটাল কমপ্লায়েন্স অবকাঠামো:** ই-ভ্যাট প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইন রিটার্ন দাখিল এখন সর্বজনীন পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে প্রায় সব ভ্যাট রিটার্ন ইলেকট্রনিকভাবে দাখিল করা হচ্ছে। এর মধ্যে মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য সরাসরি ইআরপি-টু-সিস্টেম দাখিল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বর্তমানে কাগজভিত্তিক পুরোনো রিটার্নসমূহ ধাপে ধাপে ই-ভ্যাট সিস্টেমে স্থানান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ-চালান এবং ই-পেমেন্ট ব্যবস্থার মাধ্যমে কর পরিশোধ সম্পূর্ণ ডিজিটাল করা হয়েছে, যার ফলে করদাতারা সরাসরি নগদবিহীন উপায়ে সরকারি কোষাগারে অর্থ জমা দিতে পারছেন এবং আইবাস++ এর সঙ্গে তাৎক্ষণিক সমন্বয় নিশ্চিত হচ্ছে।

- **স্বয়ংক্রিয় ভ্যাট প্রয়োগ, রিফান্ড এবং করদাতা সহায়তা:** ভ্যাট ব্যবস্থাপনায় বিশটি কাঠামোবদ্ধ ঝুঁকি মানদণ্ডের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় নিরীক্ষা নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, এর আওতায় ৬০০ প্রতিষ্ঠানকে পূর্ণাঙ্গ নিরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে এবং প্রশাসনিক বিবেচনা ও অনিয়মের সুযোগ হ্রাস করতে ম্যানুয়াল ভ্যাট নিরীক্ষা নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে। স্বয়ংক্রিয় ভ্যাট রিফান্ড মডিউলের মাধ্যমে সরকারি কোষাগার থেকে সরাসরি করদাতার নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে রিফান্ড অর্থ স্থানান্তর করা হচ্ছে। এর ফলে বিলম্ব এবং প্রক্রিয়াগত জটিলতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, যা পূর্বে অনেক নিয়মিত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে ভ্যাট নিবন্ধন গ্রহণ থেকে নিরুৎসাহিত করত। স্বয়ংক্রিয় নিরীক্ষা, ডিজিটাল লয়ালটি এবং সরলীকৃত ফেরত প্রদানের মতো উদ্যোগসমূহ কার্যকরভাবে পরিচালিত হলে ভ্যাট প্রশাসনকে কাগজভিত্তিক ও বিবেচনানির্ভর ব্যবস্থা থেকে স্বয়ংক্রিয়তা, স্বচ্ছতা ও সেবামুখী ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করবে।

৩.৯.১.৩ কাস্টমস সংস্কার উদ্যোগ

- **বাণিজ্য সহজীকরণ এবং ব্যবসা পরিবেশ:** Bangladesh Single Window (BSW) বর্তমানে উনিশটি সরকারি নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে একটি একক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত করেছে, যা ASYCUDA World-এর সঙ্গে সমন্বিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এই প্ল্যাটফর্ম চালুর পর থেকে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ১০ লক্ষাধিক সনদ, লাইসেন্স এবং অনুমতিপত্র ইস্যু করা হয়েছে। Authorised Economic

Operator (AEO) ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে, যার আওতায় AEO সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০ শতাংশ আমদানি চালানের ক্ষেত্রে দ্রুত কাস্টমস ছাড় সুবিধা এবং দ্বৈত-ডেলিভারি সুবিধা পাচ্ছে। এছাড়া এনবিআর দ্রুত রপ্তানি ছাড় নীতি গ্রহণ করেছে, যার আওতায় HS Code matching-এর জটিলতা দূর করার জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় শ্রেণিকরণ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেছে।

- **ডিজিটাল রূপান্তর এবং সিস্টেম সমন্বয়:** ১ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে এনবিআর Customs Bond Management System কার্যকর করেছে, যার মাধ্যমে বন্ড সুবিধাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ অনলাইনে সেবা গ্রহণ করতে পারছে। একই সঙ্গে এ-চালান ব্যবস্থার মাধ্যমে কাস্টমস শুল্ক ও কর সরাসরি পরিশোধ করা হচ্ছে। ASYCUDA World বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরের Terminal Operating System, বাংলাদেশ ব্যাংকের Foreign Exchange Transaction Monitoring System এবং বিজিএমইএ-এর Utilisation Declaration System-এর সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে। এর ফলে তাৎক্ষণিক কার্গো ব্যবস্থাপনা সমন্বয়, আমদানি চালানের ইনভয়েস যাচাই এবং স্বয়ংক্রিয় রপ্তানি ছাড় কার্যক্রম নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া স্থলবন্দরসমূহে পণ্যবাহী যানবাহনের চলাচল পর্যবেক্ষণের জন্য একটি Truck Movement Module চালু করা হয়েছে, যা ডিজিটাল উপায়ে তাৎক্ষণিক নজরদারি নিশ্চিত করছে।

- **বন্দর দক্ষতা, নিলাম সংস্কার এবং শুল্ক যৌক্তিকীকরণঃ** কাস্টমস সংস্কারের ফলে বন্দর ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যার মধ্যে পণ্যজট হ্রাস, স্বচ্ছ নিলাম ব্যবস্থাপনা এবং শুল্ক সমন্বয় নিশ্চিতকরণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ASYCUDA World-ভিত্তিক একটি নিলাম মডিউল দেশের বিভিন্ন কাস্টমস হাউস এবং স্থল কাস্টমস স্টেশনে চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে পূর্ববর্তী ম্যানুয়াল ও অস্বচ্ছ পদ্ধতির পরিবর্তে একটি মানসম্মত ডিজিটাল প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

- **সাইবার নিরাপত্তা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিঃ** এনবিআর ASYCUDA World এবং অন্যান্য ডিজিটাল রাজস্ব ব্যবস্থার সুরক্ষার জন্য একটি সিকিউরিটি অপারেশনস সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছে, যা ধারাবাহিক সাইবার পর্যবেক্ষণ এবং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করছে। একইসাথে একটি স্বয়ংক্রিয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে, যা ম্যানুয়াল চালান নির্বাচনের পরিবর্তে তথ্যভিত্তিক ঝুঁকি প্রোফাইলিং ব্যবহার করছে। নতুন সি অ্যান্ড এফ এজেন্ট ও শিপিং এজেন্ট লাইসেন্সিং বিধিমালা কাস্টমস মধ্যস্থতাকারীদের জন্য পেশাগত মানদণ্ড প্রবর্তন করেছে। এছাড়া ব্যাংক-গ্যারান্টি নীতির মাধ্যমে নন-বন্ডেড উৎপাদনকারীরা নিয়ন্ত্রিত ও ব্যবসাবান্ধব প্রক্রিয়ায় কাঁচামাল আমদানি করতে পারছেন, যা রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

৩.৯.২ কর-বহির্ভূত রাজস্ব সংস্কার উদ্যোগসমূহ

- **নীতিমালা প্রণয়ন:** কর-বহির্ভূত রাজস্ব (NTR) ও অন্যান্য কর রাজস্ব আদায় ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২৬ (খসড়া) প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, যা এনটিআর ব্যবস্থাপনাকে একটি কাঠামোবদ্ধ, স্বচ্ছ ও তথ্য-নির্ভর কাঠামোর আওতায় আনবে। এই নীতিমালার আওতায়

সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে কর-বহির্ভূত রাজস্বের উৎস চিহ্নিত করা, যৌক্তিক ফি নির্ধারণ করা এবং সেবার ব্যয়, বাজারমূল্য ও মুদ্রাস্ফীতির ভিত্তিতে ন্যূনতম প্রতি তিন বছর অন্তর ফি পুনর্নির্ধারণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ নীতি, সরকারি ঋণের সুদ আদায়, উদ্বৃত্ত তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ ফি, সবুজ ফি, কার্বন-সম্পর্কিত চার্জ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা রাজস্বসহ জলবায়ু-সংবেদনশীল রাজস্ব উৎসসমূহও এই নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- **ট্রেজারিতে জমা এবং আর্থিক শৃঙ্খলা:** দেশের ৬৪টি জেলার জেলা প্রশাসকদের প্রতি নির্দেশনা জারি করা হয়েছে যেন বিভাগীয় ব্যাংক হিসাবে রাখা অব্যবহৃত সরকারি তহবিল সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়। সকল রাজস্ব এ-চালানের মাধ্যমে সরাসরি জমা হবে, যা শূন্য-ব্যালেন্স ব্যাংক হিসাব এবং তাৎক্ষণিক প্রতিবেদন ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে। এছাড়া, একটি পরিপত্র জারি করে সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে আর্থিক সংশ্লেষযুক্ত যেকোনো প্রজ্ঞাপন জারির পূর্বে অর্থ বিভাগের পূর্ব সম্মতি গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

- **হার পুনর্নির্ধারণ, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং সম্পদভিত্তিক আয় ব্যবস্থাপনা:** একাধিক মন্ত্রণালয় ও বিভাগে মোট ৪৯৩টি এনটিআর হার সংশোধন করা হয়েছে। সরকার স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান, করপোরেশন, কোম্পানি, ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ইক্যুইটি বিনিয়োগের একটি সমন্বিত ডাটাবেইজ উন্নয়নের কাজও করছে।

- **সমন্বিত রাজস্ব ডাটাবেজ এবং ডিজিটাল পর্যবেক্ষণ:** কর-বহির্ভূত রাজস্ব ও এনবিআর-বহির্ভূত কর রাজস্ব পর্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন চলমান রয়েছে, যা সরকারি ফি, মাশুল, নির্ধারিত হার, আরোপের তারিখ, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ এবং উদ্বৃত্ত তহবিলকে অন্তর্ভুক্ত করবে। ব্যবস্থা তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, সংগ্রহ পর্যবেক্ষণ, রাজস্ব তথ্য সংরক্ষণ, তাৎক্ষণিক Management Information System (MIS) প্রতিবেদন তৈরি এবং API integration-এর মাধ্যমে আইবাস++-এর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করবে, যা স্বচ্ছ ও তথ্যভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে।

- **ইকুইটি বিনিয়োগ এবং লভ্যাংশ ও সুদের উৎসের রেকর্ড সংরক্ষণ:** সরকার বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান, সরকারি করপোরেশন, কোম্পানি, ব্যাংক, বীমা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করেছে। এসব বিনিয়োগ সরকারি মূলধন বা ইকুইটি হিসেবে বিবেচিত হয়। সরকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগকৃত ইকুইটির একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে প্রায় ১৫০টি প্রতিষ্ঠানে সরকারের মোট ইকুইটি বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১,৮৯৯.৩৭ বিলিয়ন টাকা। 'Government Equity Accounting and Guidelines' শীর্ষক গ্রন্থটি হালনাগাদ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে সরকারি ইক্যুইটি-সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.১০ উপসংহার

বাংলাদেশের রাজস্ব সংস্কারের অন্যতম এজেন্ডা বাস্তবায়নে কর ও কর-বহির্ভূত রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় কাঠামোগত উন্নয়নের একটি সুস্পষ্ট রোডম্যাপ প্রনয়ন করা প্রয়োজন। ট্রিলিয়ন ডলারে অর্থনীতির রুপকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের রাজস্ব আহরণে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। একটি উচ্চতর এবং অধিক টেকসই কর-জিডিপি অনুপাত অর্জনের জন্য কাস্টমস, আয়কর এবং ভ্যাট ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বিত ও আন্তঃসংযুক্ত স্বয়ংক্রিয়করণ (Integrated & Interoperable Automation) কার্যক্রমে ধারাবাহিক অগ্রগতি বজায় রাখা অপরিহার্য। এর মাধ্যমে অনুমোদিত কর্মকর্তারা তাৎক্ষণিকভাবে করদাতার তথ্য প্রাপ্তি ও যাচাইয়ের সুযোগ পাবেন। একই সঙ্গে আয়করভিত্তি আরও সম্প্রসারণ, ভ্যাট নিবন্ধন ও কমপ্লায়েন্স জোরদার করা এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান ভবিষ্যৎ অগ্রাধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। এছাড়া, ধীরে ধীরে মানব-নির্ভর মূল্যায়ন (Assessment) ও আপিল ব্যবস্থা থেকে সরে এসে ফেসলেস (Faceless) কর নিরুপন ও আপিল ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে, যা মানবিক স্বেচ্ছামূলক বিবেচনার সুযোগ হ্রাস করবে, করদাতার আস্থা বৃদ্ধি করবে এবং স্বেচ্ছা পরিপালনকে (Self-Compliance) শক্তিশালী করার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে। ধারাবাহিকতা ও প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা এসব সংস্কার বাস্তবায়িত হলে রাজস্ব আহরণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে, আর্থিক স্থিতিশীলতা সুদৃঢ় হবে এবং রাজস্ব কাঠামো বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন অর্থায়নের চাহিদা পূরণে আরো সক্ষম হবে।

৪

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি

(২০২৬-২৭ হতে ২০২৮-২৯)

সরকারি ব্যয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা

অধ্যায় ৪

সরকারি ব্যয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা

সংক্ষিপ্তসার

- *মধ্যমেয়াদি ব্যয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা কৌশলের মূল লক্ষ্য হলো সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি বিনিয়োগনির্ভর, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা।*
- *আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক মানদণ্ডের তুলনায় বাংলাদেশের সরকারি ব্যয় এখনও অনেক কম। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তা জিডিপির ১১.৪ শতাংশে নেমে গেলেও ২০২৮-২৯ অর্থবছর নাগাদ তা পুনরুদ্ধার হয়ে ১৪.৪ শতাংশে পৌঁছানোর প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।*
- *সুদ পরিশোধ, ভর্তুকি, হস্তান্তর ব্যয় এবং সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির কারণে পরিচালন ব্যয়ের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। এক্ষেত্রে ব্যয় দক্ষতা বৃদ্ধি ও আরও কার্যকর লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।*
- *মধ্যমেয়াদে উন্নয়ন ও মূলধনী ব্যয় পুনরায় বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে, যেখানে স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রযুক্তি, জলবায়ু সহনশীলতা এবং সুষম আঞ্চলিক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।*
- *২০২৪-২৫ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) বাস্তবায়নের হার ৬৫.৯ শতাংশে নেমে এসেছে। এ পরিস্থিতিতে প্রকল্প প্রস্তুতি, ক্রয় পরিকল্পনা, নগদ প্রবাহ ব্যবস্থাপনা এবং পর্যবেক্ষণ কাঠামো আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন।*
- *সরকারের রাজস্ব নীতি সম্প্রসারণমূলক হলেও তা নিয়ন্ত্রিত থাকবে। বাজেট ঘাটতি সহনীয় সীমার মধ্যে রাখা হবে এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছর শেষে সরকারি ঋণ জিডিপির প্রায় ৩৮.৯ শতাংশে স্থিতিশীল থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।*
- *ঋণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থায়নের উৎসের ওপর জোর দেওয়া হবে। এছাড়া, দেশীয় বন্ড মার্কেটকে আরও শক্তিশালী করা, সঞ্চয়পত্রের (NSC) সুদের হার বাজারভিত্তিক করা, সতর্কতার সাথে বৈদেশিক ঋণ নেওয়া এবং বিনিময় হার, পুনঃঅর্থায়ন ও সম্ভাব্য দায়জনিত (Contingent Liability) ঝুঁকি কমিয়ে আনার বিষয়ে নজর দেওয়া হবে।*

৪.১ ভূমিকা

বিদ্যমান সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদে সরকারি ব্যয়ের প্রবণতা এবং নীতিগত অগ্রাধিকারের একটি সামগ্রিক চিত্র এই অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয়সহ সরকারের মোট ব্যয়ের গতিপ্রকৃতি এবং মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ তুলে ধরা হয়েছে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ এবং সুষম বণ্টন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহে সম্পদ বরাদ্দের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এছাড়াও, এই অধ্যায়ে সাম্প্রতিক ব্যয় ব্যবস্থাপনায় গৃহীত পদক্ষেপগুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পরিশেষে ঘাটতি অর্থায়ন কৌশল এবং ঋণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসহ সরকারের ঋণ পোর্টফোলিওর বিবর্তনশীল কাঠামো পর্যালোচনার মাধ্যমে অধ্যায়টি সমাপ্ত হয়েছে।

৪.২ সরকারি ব্যয় সংক্রান্ত নীতি-কাঠামো

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সরকারি সম্পদের বরাদ্দ ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় নীতি, অগ্রাধিকার ও কৌশলই সরকারের ব্যয়

সংক্রান্ত নীতির মূল ভিত্তি। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর জাতীয় উন্নয়নের পরিবর্তিত রূপরেখা ও কৌশলগত অগ্রাধিকারসমূহের আলোকে ব্যয় সংক্রান্ত কৌশলে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করা হয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের সরকারি ব্যয় পরিকল্পনা ২০২৬ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে উচ্চ বিনিয়োগ, বেসরকারি খাতের অধিকতর অংশগ্রহণ এবং টেকসই অর্থনৈতিক বহুমুখীকরণ নিশ্চিত করে ২০৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে এক ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থনীতিতে উন্নীত করার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা হবে (বক্স-৪.১)। সমষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) বৃদ্ধির জন্য এই রূপরেখায় রাজস্ব ও মুদ্রানীতির মধ্যে আরও কার্যকর সমন্বয়ের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জিডিপি প্রবৃদ্ধির মন্থরতার প্রেক্ষাপটে, সামগ্রিক সমষ্টিক অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার পাশাপাশি উৎপাদনশীল খাতগুলোকে সহায়তা করার লক্ষ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ Counter Cyclical রাজস্ব নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

বক্স ৪.১: বাজেট ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারের অগ্রাধিকারসমূহ

- **২০৩৪ সালের মধ্যে দেশকে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে রূপান্তর করা:**
  - বিনিয়ন্ত্রণকরণ
  - বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি
  - প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ
  - দক্ষ ও উৎপাদনশীল মানবসম্পদ গঠন
  - সৃজনশীল অর্থনীতির বিকাশ
  - অর্থনৈতিক গণতন্ত্রায়ন
- **সুষম ও অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন:**
  - লক্ষ্যভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সম্প্রসারণ (ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড ইত্যাদি)
  - নারীর ক্ষমতায়ন
  - কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মানবসম্পদ উন্নয়ন
  - খাদ্য ও কৃষি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ
  - জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা
- **সুষম উন্নয়নের মাধ্যমে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস**

মধ্যমেয়াদে আর্থিক স্থিতিশীলতা সুদৃঢ় করতে অনুৎপাদনশীল আবর্তক ব্যয়ের পরিবর্তে মানবসম্পদ উন্নয়ন, উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ এবং জলবায়ু-সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণের মতো অধিক উৎপাদনশীল বিনিয়োগকে ক্রমান্বয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এ রূপান্তরের মাধ্যমে ব্যয় ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি, পদ্ধতিগত অপচয় ও লিকেজ হ্রাস এবং 'ফ্যামিলি কার্ড' ও 'কৃষক কার্ড' কর্মসূচির মতো ডিজিটাল ব্যবস্থার মাধ্যমে ভর্তুকির অধিকতর লক্ষ্যভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, এ সমন্বিত উদ্যোগের আওতায় সকল রাজস্ব প্রণোদনা ও বৃহৎ সরকারী বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহকে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের মতো পরিমাপযোগ্য বিষয়ের সাথে আরো নিবিড়ভাবে সংযুক্ত

করা হচ্ছে। এ ধরণের কার্যকর আর্থিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হলো দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সুদৃঢ় করা, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করা এবং সরকারি সম্পদ বরাদ্দের সামগ্রিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা।

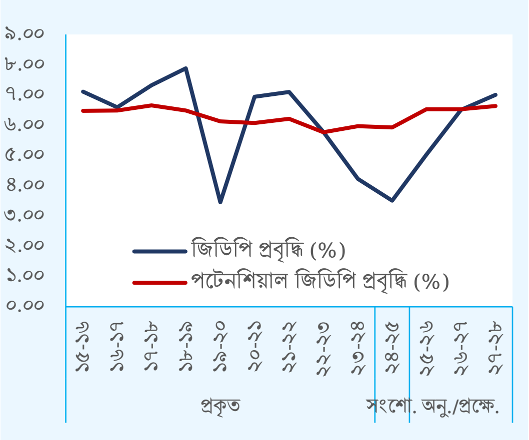

চিত্র ৪.১ পটেনশিয়াল জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও প্রকৃত/প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধির তুলনা

টীকা: আইএমএফের MFT টেমপ্লেট ব্যবহার করে পটেনশিয়াল জিডিপি হিসেব করা হয়েছে। এক্ষেত্রে Production Function এর বিভিন্ন কম্পোনেন্টের Trend নির্ধারনের জন্য HP filter ব্যবহার করা হয়েছে।

সূত্র: অর্থ বিভাগ

৪.৩ সরকারি ব্যয়ের গতিধারা ও প্রক্ষেপণ

৪.৩.১ মোট সরকারি ব্যয়

দীর্ঘদিন ধরে রাজস্ব আহরণ সক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলাদেশের সরকারি ব্যয়-জিডিপি অনুপাত দক্ষিণ এশিয়া তথা বৈশ্বিক মানদণ্ডে এখনও অনেক কম। বিদ্যমান সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় গৃহীত 'রাজস্ব সংকোচন নীতি'র (Fiscal Consolidation) কারণে সরকারি ব্যয় ২০২২-২৩ অর্থবছরে কমে ১২.৮ শতাংশ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আরও হ্রাস পেয়ে ১২.৩ শতাংশে নেমে আসে। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংকোচন ঘটে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে, যখন সরকারি ব্যয় জিডিপির মাত্র ১১.৪ শতাংশে নেমে আসে, যা গত এক দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন। উন্নয়ন ব্যয়ে সংকোচন, সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সারণি ৪.১ অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে উন্নয়ন ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়ে ১,৫২৪.৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আকার কমে ১,৪২৩.৩ বিলিয়ন টাকায় নেমে আসে। তবে নতুন সরকারের গৃহিত বিনিয়োগ নির্ভর প্রবৃদ্ধি কৌশল বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে সরকারি ব্যয় জিডিপির ১৩.৭ শতাংশে উন্নীত হওয়ার প্রাক্কলন করা হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে তা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ১৩.৯ শতাংশ ও ২০২৮-২৯ অর্থবছরে ১৪.৪ শতাংশে উন্নীত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে (চিত্র ৪.২)।

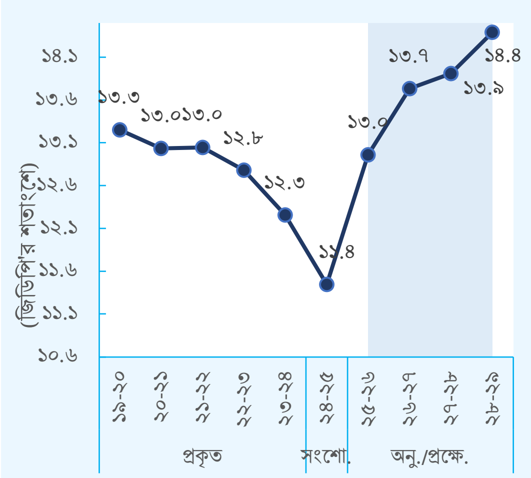

চিত্র ৪.২ মোট সরকারি ব্যয় (জিডিপি'র শতাংশে)

সূত্র: অর্থ বিভাগ

মধ্যমেয়াদে সরকারের এ ব্যয় বৃদ্ধি মূলত নীতিগত পরিবর্তনের প্রতিফলন; যেখানে ব্যয়সংকোচনমূলক অবস্থান থেকে সরে এসে প্রবৃদ্ধি-সহায়ক সরকারি

বিনিয়োগকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। তবে, জিডিপির অনুপাত হিসেবে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির এ প্রক্ষেপণ সম্পূর্ণভাবে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির ওপর নির্ভরশীল। করের আওতা (Tax base) সম্প্রসারণ এবং কর আদায়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব না হলে উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য দীর্ঘমেয়াদে প্রয়োজনীয় ব্যয় সংকুলান কঠিন হয়ে পড়বে, যা টেকসই অর্থনৈতিক সম্ভাবনার পথকে সংকুচিত করবে।

সারণি ৪.১ সরকারি ব্যয় (বিলিয়ন টাকা)

	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
	প্রকৃত						সংশোধিত
পরিচালন ব্যয়	২৫৪৮.৮	২৮৫৮.৩	৩২৫৬.৮	৩৬৯৮.৬	৪১২৪.৭	৪৭৮৩.১	৫৬৫০.৪
এর মধ্যে সুদ	৫৮৩.১	৭০৬.১	৭৭৭.৭	৯২১.১	১১৪৬.৬	১৩৬১.২	১২৭০.০
ভর্তুকি ও স্থানান্তর	৯১৯.২	১০৩১.৬	১৩৫৩.২	১৬৭২.৭	১৭৩৭.৯	২১৫৫.৫	২৪৫২.৮
উন্নয়ন ব্যয়	১৬১৮.০	১৬৯৪.৯	১৯৫১.৭	২০৫১.৬	২১০৩.৪	১৫২৪.৫	২১৪৮.৬
এর মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	১৫৫৩.৮	১৬০৫.০	১৮৬০.৬	১৯১৯.৩	১৯৬৪.৮	১৪২৩.৩	২০০০.০
অন্যান্য (খাদ্য হিসাব, নীট ঋণ ও অগ্রিম)	৩৪.৮	৪৮.৪	-২৬.৭	-১১.৭	-৯৭.৩	৫.১	৮১.০
মোট ব্যয়	৪২০১.৬	৪৬০১.৬	৫১৮১.৯	৫৭৩৮.৬	৬১৩০.৮	৬৩১২.৮	৭৮৮০.০

সূত্র: অর্থ বিভাগ

৪.৩.২ পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয়ের গতি-প্রকৃতি

সরকারী ব্যয়ের সাম্প্রতিক চিত্র থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশের বাজেটে পরিচালন ব্যয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষত ২০২২-২৩ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর সময়কালে। চিত্র ৪.৩ অনুযায়ী, মোট সরকারি ব্যয়ের মধ্যে পরিচালন ব্যয়ের অংশ ২০১৯-২০ অর্থবছরের ৬১ শতাংশ থেকে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৭৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে গৃহীত সংকোচনমূলক নীতির ফলে উন্নয়ন বরাদ্দ হ্রাস এবং অভ্যন্তরীণ ঋণের উচ্চ সুদব্যয়ের কারণে সুদ পরিশোধের দায় বৃদ্ধিই মূলত পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধির কারণ। অন্যদিকে, দীর্ঘমেয়াদি উৎপাদনশীলতা ও প্রবৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ব্যয়ের অংশ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরের ৩৯ শতাংশ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মাত্র ২৪ শতাংশে নেমে এসেছে।

তবে মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণে একটি সুস্পষ্ট ও টেকসই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, যা নতুন সরকারের উৎপাদনশীল বিনিয়োগভিত্তিক ব্যয় পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ প্রেক্ষাপটে, মোট সরকারি ব্যয়ের মধ্যে পরিচালন ব্যয়ের অংশ ২০২৬-২৭ অর্থবছরে কমে ৬৬ শতাংশে নেমে আসবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছরে তা আরও হ্রাস পেয়ে ৬১ শতাংশে পৌঁছাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, উন্নয়ন ব্যয়ের অংশে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। উন্নয়ন ব্যয় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ২৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৮-২৯ অর্থবছরে ৩৯ শতাংশে উন্নীত হবে। এই কাঠামোগত পরিবর্তন অবকাঠামো, মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রযুক্তি এবং জলবায়ু-সহিষ্ণু খাতে বিনিয়োগ সম্প্রসারণে সরকারের অঙ্গীকারের প্রতিফলন। একই সঙ্গে ভর্তুকি সংস্কার, অপচয় ও লিকেজ হ্রাস এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পুনরাবৃত্তিমূলক ব্যয় যৌক্তিকীকরণের উদ্যোগও এ প্রক্রিয়াকে সহায়তা করবে।

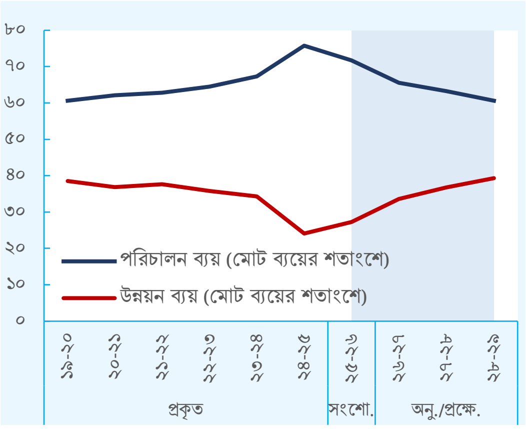

চিত্র ৪.৩ পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয়ের ধারা ও প্রক্ষেপণ

সূত্র: অর্থ বিভাগ

৪.৩.৩ সরকারি ব্যয়ের প্রধান খাতসমূহ

পরিচালন ব্যয় ধারাবাহিকভাবে সরকারি ব্যয়ের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। এ ব্যয় ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপির ৮.০ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৮.৭ শতাংশে পৌঁছায় এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দে তা আরও বৃদ্ধি করে ৯.৩ শতাংশে প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ (সারণি ৪.২)। পরিচালন ব্যয়ের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বেতন-ভাতা খাত তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল রয়েছে। এ খাতে ব্যয় ২০১৯-২০ অর্থবছরের জিডিপির ১.৮ শতাংশ থেকে ধীরে ধীরে কমে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১.৩ শতাংশে নেমে আসে; তবে সংশোধিত ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তা সামান্য বেড়ে ১.৪ শতাংশে পৌঁছায়। একইভাবে, পণ্য ও সেবা খাতে ব্যয়ও পুরো সময়জুড়ে জিডিপির প্রায় ০.৮-০.৯ শতাংশের মধ্যে সীমিত রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া সুদ পরিশোধ ব্যয় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ২.৫ শতাংশ থেকে কমে সংশোধিত ২০২৫-২৬ অর্থবছরে জিডিপির ২.১ শতাংশে নেমে আসতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অন্যদিকে, জ্বালানি, কৃষি এবং সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে সরকারি সহায়তার চাহিদা বৃদ্ধির ফলে ভর্তুকি ও স্থানান্তর ব্যয় ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ব্যয় ২০১৯-২০ অর্থবছরের জিডিপির ২.৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩.৯ শতাংশ হয়েছে এবং সংশোধিত ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৪.০ শতাংশে উন্নীত হওয়ার প্রাক্কলন করা হয়েছে। অন্যদিকে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) ব্যয় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্যভাবে কমে জিডিপির ২.৬ শতাংশে নেমে এলেও, সংশোধিত ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তা পুনরায় বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৩ শতাংশে পৌঁছাতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, মোট ব্যয়ের মধ্যে জনসেবা খাতে বরাবরের মতো বরাদ্দের পরিমান সবচেয়ে বেশী এবং এ খাতে বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে (চিত্র ৪.৪)। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে নতুন সরকারের প্রথম বাজেটে উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা এ খাতসমূহে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সরকারের একটি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ। সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ খাতেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে, যা সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণে সরকারের অঙ্গীকারের প্রতিফলন। পরিবহন ও যোগাযোগ এবং কৃষি খাতে বরাদ্দ সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, প্রতিরক্ষা, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি এবং বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির মতো খাতগুলোতে বছরভিত্তিক সামান্য পরিবর্তন ছাড়া মোট বরাদ্দ মোটামুটি অপরিবর্তিত রয়েছে।

সারণি ৪.২ সরকারি ব্যয়ের বরাদ্দ বিভাজন (জিডিপি'র শতাংশে)

	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
	প্রকৃত						সংশোধিত
পরিচালন ব্যয়	৮.০	৮.১	৮.২	৮.২	৮.২	৮.৭	৯.৩
আবর্তক ব্যয়	৭.৪	৭.৫	৭.৭	৮.০	৮.০	৮.৪	৮.৪
বেতন ও ভাতা	১.৮	১.৭	১.৬	১.৪	১.৪	১.৩	১.৪
পণ্য ও সেবা	০.৯	০.৯	০.৮	০.৮	০.৮	০.৭	০.৮
সুদ পরিশোধ	১.৮	২.০	২.০	২.১	২.৩	২.৫	২.১
ভর্তুকি, প্রণোদনা ও স্থানান্তর ব্যয়	২.৯	২.৯	৩.৪	৩.৭	৩.৫	৩.৯	৪.০
থোক বরাদ্দ	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০
মূলধন ব্যয়	০.৬	০.৬	০.৫	০.৩	০.৩	০.৩	০.৯
উন্নয়ন ব্যয়	৫.১	৪.৮	৪.৯	৪.৬	৪.২	২.৮	৩.৫
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৪.৯	৪.৫	৪.৭	৪.৩	৩.৯	২.৬	৩.৩
নন এডিপি, স্কিম ও অন্যান্য	০.২	০.৩	০.২	০.৩	০.৩	০.২	০.২
অন্যান্য (খাদ্য হিসাব, নীট ঋণ ও অগ্রিম ইত্যাদি)	০.১	০.১	-০.১	০.০	-০.২	০.০	০.১
মোট ব্যয়	১৩.৩	১৩.০	১৩.০	১২.৮	১২.৩	১১.৪	১৩.০

সূত্র: অর্থ বিভাগ

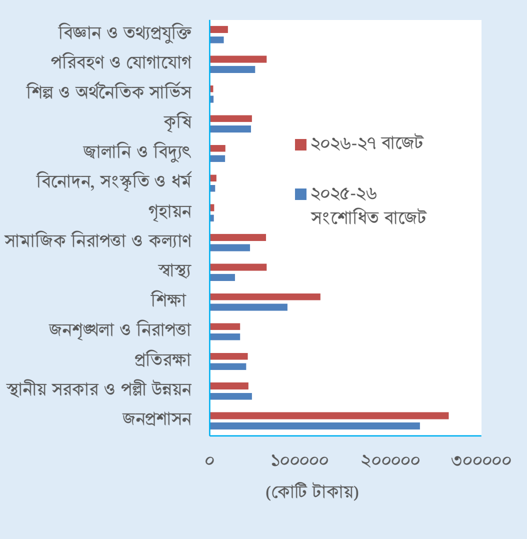

চিত্র ৪.৪ ২০২৫-২৬ এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরে খাতভিত্তিক বরাদ্দ

সূত্র: অর্থ বিভাগ

৪.৪ পরিচালন ব্যয়ের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

পরিচালন ব্যয় মূলত দুটি অংশে বিভক্ত, পরিচালন আবর্তক ব্যয় এবং পরিচালন মূলধন ব্যয়। এর মধ্যে পরিচালন আবর্তক ব্যয়ের পরিমান বেশি, পরিচালন মূলধন ব্যয়ের পরিমান তুলনামূলকভাবে কম। পরিচালন আবর্তক ব্যয়ের আওতায় বেতন-ভাতা, পণ্য ও সেবা ক্রয়, সুদ পরিশোধ, ভর্তুকি এবং চলতি স্থানান্তর ব্যয়সহ বিভিন্ন খাত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পরিচালন ব্যয় তুলনামূলকভাবে বেশী ছিল। এর পেছনে মূলত পরিশোধিত সুদের পরিমাণ বৃদ্ধি, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির ব্যয়ের ধারাবাহিক সম্প্রসারণ, ভর্তুকি ব্যয়ের উর্ধ্বগতি এবং বিনিময় হারজনিত ব্যয় বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ২০১৯-২০ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরে পরিচালন ব্যয় জিডিপির ৮.০ শতাংশ থেকে ধীরে ধীরে ৮.২ শতাংশে উন্নীত হয়। পরবর্তীতে ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তা ৮.২ শতাংশে স্থিতিশীল থাকলেও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আরও বৃদ্ধি পেয়ে ৮.৭

শতাংশে পৌঁছায়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে পরিচালন ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৯.৩ শতাংশে উন্নীত হয়, যা সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। মূলত জ্বালানি ও কৃষি খাতে ভর্তুকি এবং স্থানান্তর ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির পাশাপাশি পুনরাবৃত্তিমূলক ব্যয়ের সম্প্রসারণ এ প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছে। তবে মধ্যমেয়াদে পরিচালন ব্যয় ধীরে ধীরে কমে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে জিডিপির ৯.০ শতাংশে নেমে আসবে প্রাক্কলন করা হয়েছে এবং ২০২৭-২৮ থেকে ২০২৮-২৯ অর্থবছর সময়ে প্রক্ষেপণ অনুযায়ী তা প্রায় ৮.৭ শতাংশে স্থিতিশীল থাকবে। একই সময়ে মূল্যস্ফীতি কমে আসা এবং ধীরে ধীরে রেপো রেট হ্রাস পাওয়ার ফলে দেশীয় ঋণগ্রহণ ব্যয়ও কমবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এর ফলে ঋণ পরিশোধ ব্যয় থেকে সাশ্রয় হওয়া সম্পদ উৎপাদনশীল মূলধনী বিনিয়োগে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

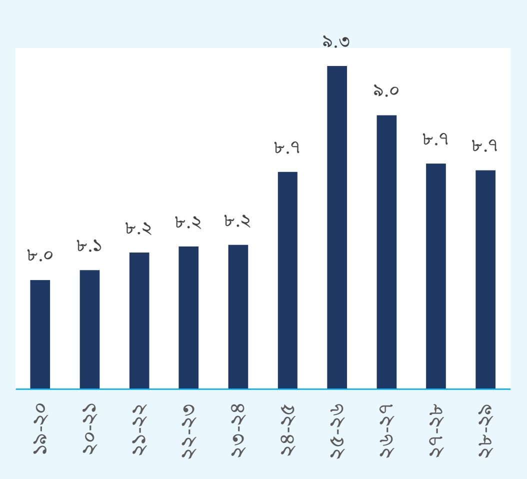

চিত্র ৪.৫ পরিচালন ব্যয় (জিডিপির শতাংশ হিসেবে)

সূত্র: অর্থ বিভাগ

৪.৪.১ বেতন ও ভাতাদি

বিগত কয়েক বছরে মোট ব্যয়ের অংশ হিসাবে বেতন-ভাতা খাতে বরাদ্দ ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ খাতের বরাদ্দ মোট ব্যয়ের ১৩.৫ শতাংশ হলেও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তা কমে ১১.০ শতাংশে নেমে এসেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এই হার ১০.৭ শতাংশ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং মধ্যমেয়াদে তা আরও কমে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৯.৬ শতাংশে নেমে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যা পরবর্তীতে ২০২৭-২৮ এবং ২০২৮-২৯ উভয় বছরেই ৯.৮ শতাংশে স্থিতিশীল থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। বেতন-ভাতা খাতে ব্যয় কমানোর মাধ্যমে সরকার আবর্তক ব্যয় সীমিত রেখে উন্নয়ন ও গুরুত্বপূর্ণ খাতে বেশি সম্পদ বরাদ্দের সুযোগ সৃষ্টি করছে।

৪.৪.২ পণ্য ও সেবা

পরিচালন আবর্তক ব্যয়ের মধ্যে অন্যতম নিয়ন্ত্রিত ও স্থিতিশীল অংশ হচ্ছে পণ্য ও সেবা খাতে ব্যয়। মোট সরকারি ব্যয়ের অনুপাতে এ ব্যয় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬.৯ শতাংশ থেকে ধীরে ধীরে কমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫.৯ শতাংশে নেমে আসে। পরবর্তীতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তা সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ৬.৭ শতাংশে উন্নীত হলেও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পুনরায় ৬.৪ শতাংশে নেমে আসে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এ হার ৬.৫ শতাংশ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং মধ্যমেয়াদে তা ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়ে ২০২৮-২৯ অর্থবছরে ৫.০ শতাংশে পৌঁছাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে এ ব্যয় হ্রাস মূলত ডিজিটাল ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা আরও কার্যকর ও সমন্বিত করার প্রচেষ্টার প্রতিফলন। এর ফলে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পাশাপাশি সরকারি ব্যয়ে অধিক দক্ষতা ও অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে সক্ষম হচ্ছে।

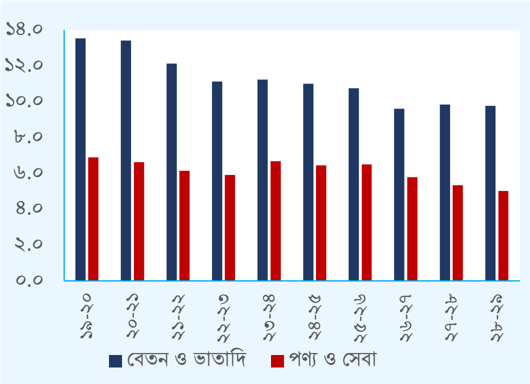

চিত্র ৪.৬ বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের ধরন (মোট ব্যয়ের শতাংশ হিসেবে)

সূত্র: অর্থ বিভাগ

৪.৪.৩ সামাজিক সুরক্ষা, ভর্তুকি ও হস্তান্তর

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায়ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতা সম্প্রসারণ, কল্যাণমূলক কর্মসূচিতে স্বচ্ছতা ও সুশাসন নিশ্চিতকরণ এবং নগদ সহায়তা, খাদ্য সহায়তা ও ডিজিটাল ট্রান্সফার ব্যবস্থার মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য লক্ষ্যভিত্তিক সহায়তা বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে (বক্স-৪.২)। নির্বাচনী ইশতেহারের সাথে সংগতি রেখে নতুনভাবে চালু করা ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির আওতায় ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৪১ লাখ নারী প্রধান নিম্ন-আয়ের পরিবারকে মাসিক ২,৫০০ টাকা প্রদান করা হবে। একইভাবে আগামী অর্থবছরে ৪২.৫ লাখ কৃষককে কৃষক কার্ডের মাধ্যমে বার্ষিক ২,৫০০ টাকা করে সহায়তা প্রদান করা হবে। এছাড়া, ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের জন্য মসজিদ ও অন্যান্য উপাসনালয়ের সম্মানী কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা এবং প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং মাসিক ভাতার হার বাড়ানোর মাধ্যমে মূল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো আরও সম্প্রসারিত করা হয়েছে। পাশাপাশি, দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের জন্য আর্থিক সহায়তার পরিমাণ দ্বিগুণ করে উপকারভোগী প্রতি ১.০০ লাখ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

বক্স ৪.২: সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যয় বিষয়ে সরকারের অগ্রাধিকার

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অগ্রাধিকারসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে-

- সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতা সম্প্রসারণ এবং বরাদ্দকৃত অর্থ শুধুমাত্র নির্ধারিত উপকারভোগীদের জন্য ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান।
- ফ্যামিলি কার্ড (নারী প্রধান পরিবারগুলোর জন্য নগদ সহায়তা) এবং কৃষক কার্ড (কৃষক ও মৎস্যজীবীদের জন্য ঋণ, বীমা ও প্রশিক্ষণ সুবিধা) চালু করা।
- বিধবা, দুস্থ নারী এবং ঝুঁকিপূর্ণ বয়স্ক জনগোষ্ঠীর ভাতা মূল্যস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বৃদ্ধি করা এবং প্রবীণ পেনশনভোগীদের জন্য চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করা।
- তৃতীয় লিঙ্গ, যাযাবর সম্প্রদায় এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মতো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণভাবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনা।
- উপকারভোগীদের ব্যাংক/মোবাইল অ্যাকাউন্টে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সরাসরি নগদ সহায়তা প্রদান বাধ্যতামূলক করা; দ্বৈত সুবিধা গ্রহণ ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ রোধ করা এবং এ সংক্রান্ত তদারকি উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করা।

বৈশ্বিক অভিঘাত এবং সরকারের বিভিন্ন নীতিগত পদক্ষেপের কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভর্তুকি ও নগদ ঋণ খাতে একটি বড় ধরণের পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। এ সময়ে নগদ ঋণ ও ভর্তুকি উভয় ক্ষেত্রেই ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে নগদ ঋণ বাবদ বরাদ্দ ৫৪.৪৭ বিলিয়ন টাকা থেকে পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দে ৯৫.০০ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে, যা মোট ব্যয়ের অংশ হিসেবে ১.২০ শতাংশ, ২০১৯-২০ অর্থবছরে যেখানে এ ব্যয় ছিল ১.৩০ শতাংশ (সারণি ৪.৩)। একইভাবে, মোট ভর্তুকি ব্যয়ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৫১.২৫ বিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ৯১০.৪৪ বিলিয়ন টাকায় পৌঁছায়, যা পরবর্তীতে সংশোধিত ২০২৫-২৬ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ৭৭২.৩১ বিলিয়ন টাকায় নেমে আসে। বিদ্যুৎ, খাদ্য ও জ্বালানি খাতে উচ্চ বরাদ্দ প্রদানের ফলে ভর্তুকি ব্যয়ে এ বৃদ্ধি ঘটেছে।

এই অর্থায়ন কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহে অব্যাহত সহায়তা প্রদান, জ্বালানি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা ও পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব কাটিয়ে উঠতে ধারাবাহিক নীতিগত উদ্যোগের প্রতিফলন। জ্বালানি সরবরাহের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক দায়সমূহ পরিশোধের জন্য বিদ্যুৎ খাত সরকারি বরাদ্দের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পেয়ে আসছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে এ খাতে প্রায় ৩৭০ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। অন্যদিকে, খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারের প্রণোদনা এবং কৃষি যান্ত্রিকীকরণের উদ্দেশ্যে ১৭০ বিলিয়ন টাকা ভর্তুকি বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

সারণি ৪.৩ নগদ ঋণ (বিলিয়ন টাকা)

	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
	প্রকৃত						সংশোধিত
মোট নগদ ঋণ	৫৪.৪৭	২১.০৪	৪২.৯০	২২.৩৪	৬৩.৫৭	৭৫.৫৪	৯৫.০০
মোট ব্যয়ের শতাংশে	১.৩০	০.৪৬	০.৮৩	০.৩৯	১.০৪	১.২০	১.২০

সূত্র: অর্থ বিভাগ

সারণি ৪.৪ ভর্তুকি (বিলিয়ন টাকা)

	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
	প্রকৃত						সংশোধিত
খাদ্য	৪১.৭০	৩৬.৬০	৪৬.৪১	৬৭.৭৭	৬৯.৭১	৭৪.৭৬	১০২.১৫
পিডিবি	৭৪.৩৯	৮৯.৪৫	১১৯.৬৩	২৩০.০০	৩৩০.০০	৫৯৬.০০	৩৬০.০০
গ্যাস ও অন্যান্য	৩৫.১৬	৫২.৯৭	১১৪.৮৭	২১৩.০০	৮২.২০	২৩৯.৬৮	৩১০.১৬
মোট ভর্তুকি	১৫১.২৫	১৭৯.০২	২৮০.৯১	৫১০.৭৭	৪৮১.৯১	৯১০.৪৪	৭৭২.৩১
মোট ব্যয়ের শতাংশে	৩.৬০	৩.৮৯	৫.৪২	৮.৯০	৭.৮৬	১৪.৪২	৯.৭৮

সূত্র: অর্থ বিভাগ

২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ভর্তুকি খাতে বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি না পেলেও মধ্যপ্রাচ্যে চলমান অস্থিরতার ফলে নতুন ধরণের আর্থিক চাপের সৃষ্টি হয়েছে। এ অঞ্চলের ভূরাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে জ্বালানি আমদানি সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়েছে এবং জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সংশোধিত বাজেটে অন্তর্ভুক্ত না থাকলেও সম্পূরক ভর্তুকি সহায়তা দিতে হচ্ছে। উদ্ভূত এ আর্থিক ঘাটতি মোকাবিলায় সরকার প্রয়োজনীয় আর্থিক সমন্বয় কার্যক্রম গ্রহণ করছে এবং উন্নয়ন সহযোগী, দাতা সংস্থা ও বিকল্প

অর্থায়নের সম্ভাব্য উৎস অনুসন্ধান করছে। একই সঙ্গে জ্বালানি সরবরাহের ধারাবাহিকতা ও ভোক্তা পর্যায়ে মূল্যস্থিতি বজায় রাখার লক্ষ্যে অর্থ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ সমন্বিতভাবে প্রশমনমূলক পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করছে, যাতে সামগ্রিক রাজস্ব ও আর্থিক ব্যবস্থার ওপর চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

সরাসরি ভর্তুকির পাশাপাশি, বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনাও দেশের কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক খাতসমূহকে বেগবান করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট প্রণোদনার পরিমাণ ৪২৬.৪০ বিলিয়ন টাকায় পৌঁছেছে। এটি মূলত রপ্তানি, কৃষি এবং প্রবাসী আয় (রেমিট্যান্স) প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের নীতিগত প্রচেষ্টার প্রতিফলন। সামগ্রিকভাবে, ভর্তুকি ও স্থানান্তর খাতের সাম্প্রতিক ব্যয়ের প্রবণতা একদিকে যেমন ক্রমবর্ধমান আর্থিক চাপের ইঙ্গিত দেয়, অন্যদিকে তেমনি বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ নানাবিধ চ্যালেঞ্জের মুখে দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা ও গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহকে সহায়তা প্রদানে সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফল।

সারণি ৪.৫ নগদ প্রণোদনা (বিলিয়ন টাকা)

	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
				প্রকৃত			সংশোধিত
কৃষি	৭২.৫০	৭৬.৩২	১১৮.৬৪	২৬০.০০	৮২.২০	২৭৯.৪০	১৭০.০০
রপ্তানি	৬০.৪৪	৫৮.৪৬	৭৮.০০	৭৮.০০	৭৪.০০	৭৫.০০	৭৮.২৫
পাটজাত পণ্য	৫০.০০	৮.০০	১০.০০	১০.০০	৮.০০	১০.০০	১২.০০
প্রবাস আয়	৩০.৬০	৩৯.৭৮	৪৪.০০	৫৩.০০	৬০.০০	৬২.০০	৬২.০০
মোট প্রণোদনা	২১৩.৫৪	১৮২.৫৬	২৫০.৬৪	৪০১.০০	২২৪.২০	৪২৬.৪০	৩২২.২৫
মোট ব্যয়ের শতাংশে	৫.০৮	৩.৯৭	৪.৮৪	৬.৯৯	৩.৬৬	৬.৭৫	৪.০৯
জিডিপির শতাংশে	০.৬৭	০.৫২	০.৬৩	০.৮৯	০.৪৫	০.৭৭	০.৫৩

সূত্র: অর্থ বিভাগ

৪.৫ উন্নয়ন ব্যয়ের সাম্প্রতিক গতিধারা ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

স্থিতিশীল ও উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে উন্নয়ন ব্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উন্নয়ন ব্যয় দেশের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আঞ্চলিক সংযোগ সম্প্রসারণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং সামাজিক খাতের সেবা সম্প্রসারণে অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। হালনাগাদ মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণে দেখা যায়, সাম্প্রতিক সময়ে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার স্বার্থে সরকারি ব্যয়ে কিছুটা সংযম প্রদর্শন করা হলেও মধ্যমেয়াদে প্রবৃদ্ধি-সহায়ক মূলধন ব্যয় ধীরে ধীরে বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সরকারি বিনিয়োগের গুণগত মান বৃদ্ধি, প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা জোরদার এবং উন্নয়ন ব্যয়ের কার্যকারিতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন অভীষ্টের সঙ্গেও এ ব্যয়নীতি সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাংলাদেশকে দীর্ঘমেয়াদে একটি উচ্চ-প্রবৃদ্ধির অর্থনীতি তথা ট্রিলিয়ন-ডলার অর্থনীতির পথে এগিয়ে নিতে হলে সুপরিকল্পিত ও কার্যকর সরকারি বিনিয়োগের বিকল্প নেই (বক্স ৪.৩)।

এ লক্ষ্য অর্জনে অবকাঠামো, জ্বালানি নিরাপত্তা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং শহর ও গ্রামের মধ্যে সংযোগ সম্প্রসারণে ধারাবাহিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রয়োজন। তাই মধ্যমেয়াদে উন্নয়ন ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করার পাশাপাশি বরাদ্দকৃত অর্থের সঠিক ব্যবহার, প্রকল্পের সময়মতো

বাস্তবায়ন এবং উৎপাদনশীল সম্পদ সৃষ্টির বিষয়টি নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে দেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির ভিত্তি আরও শক্তিশালী হবে।

বক্স ৪.৩ দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ দৃষ্টিভঙ্গি ও সরকারি ব্যয়ের অগ্রাধিকার

উচ্চ প্রবৃদ্ধি ও ট্রিলিয়ন-ডলার অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রণীত সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার থেকে সরকারি বিনিয়োগের পরিসর বাড়ানো এবং বিনিয়োগকে আরও উৎপাদনশীল করার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। এ লক্ষ্য অর্জনে উন্নয়ন ব্যয়ের অগ্রাধিকার হবে: (ক) উচ্চ প্রবৃদ্ধিসহায়ক অবকাঠামো, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখা; (খ) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি ও দক্ষতা উন্নয়নে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা; (গ) বেসরকারি বিনিয়োগ ও রপ্তানি সম্প্রসারণে সহায়ক জ্বালানি, পরিবহন ও সরবরাহব্যবস্থা শক্তিশালী করা; (ঘ) প্রকল্প মূল্যায়ন, ক্রয় প্রক্রিয়া ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকর করা; এবং (ঙ) উন্নয়ন ব্যয় বাড়ানোর প্রয়োজনীয় অর্থায়ন নিশ্চিত করতে রাজস্ব আহরণ জোরদার করা, যাতে সরকারের ঋণ গ্রহণ ভারসাম্যহীন বা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে না পড়ে।

৪.৫.১ সরকারি মূলধন ব্যয় ও বিনিয়োগের দৃশ্যকল্প

মূলধন ব্যয় দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন, উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকার মূলত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এবং পরিচালন বাজেটের আওতাধীন মূলধন ব্যয়ের মাধ্যমে এ ধরণের বিনিয়োগ করে থাকে। সারণি ৪.৬ পর্যালোচনায় দেখা যায়, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মূলধন ব্যয়ের হার ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মূলধন ব্যয় ছিল জিডিপি'র ৫.৪৯ শতাংশ, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কমে ৪.২৯ শতাংশে দাঁড়ায়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ ব্যয় আরও কমে জিডিপি'র ৩.০৭ শতাংশে নেমে এসেছে। তবে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মূলধন ব্যয় জিডিপি'র ৪.৪২ শতাংশ ধরা হয়েছে। মধ্যমেয়াদে এ ব্যয় ধীরে ধীরে বাড়বে এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৫.৫৭ শতাংশ, ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ৫.৯৫ শতাংশ এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছরে জিডিপি'র ৬.৪৩ শতাংশে উন্নীত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

সারণি ৪.৬ মূলধন ব্যয়ের গতিধারা ও দৃশ্যকল্প (জিডিপি'র শতাংশে)

	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯
	প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত	সংশোধিত বাজেট	বাজেট	প্রক্ষেপণ	প্রক্ষেপণ
মূলধন ব্যয়	৫.৪৯	৫.৩০	৪.৮২	৪.২৯	৩.০৭	৪.৪২	৫.৫৭	৫.৯৫	৬.৪৩

নোট: এ সারণিতে মূলধন ব্যয় বলতে পরিচালন বাজেটের মূলধন ব্যয় এবং উন্নয়ন ব্যয়ের সমষ্টিকে বোঝানো হয়েছে, যা চলতি মূল্যে জিডিপির শতাংশ হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে।

সূত্র: অর্থ বিভাগ

এ প্রেক্ষাপটে সরকারের নীতিগত অগ্রাধিকার হবে দুইটি। প্রথমত, প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মূলধন ব্যয় ধীরে ধীরে বাড়ানো। দ্বিতীয়ত, প্রকল্প বাছাই, ক্রয় প্রক্রিয়া, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং সময়মতো প্রকল্প সমাপ্তির ক্ষেত্রে আরও শৃঙ্খলা আনা। এর ফলে উন্নয়ন ব্যয়ের প্রতিটি টাকা থেকে অধিকতর অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুফল পাওয়া সম্ভব হবে এবং সরকারি বিনিয়োগ দেশের উৎপাদনশীলতা, কর্মসংস্থান ও সেবা প্রদানের মান উন্নয়নে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

৪.৫.২ এডিপি বরাদ্দ, বাস্তবায়ন ও খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার

সরকারের উন্নয়ন ব্যয়ের প্রধান অংশ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। সারণি ৪.৭ পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০২০-২১ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মধ্যে সংশোধিত বাজেটের বিপরীতে এডিপি বাস্তবায়নের হার ছিল ৮০.২ শতাংশ থেকে ৮৮.৬

শতাংশের মধ্যে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ হার ছিল ৮১.২ শতাংশ, ২০২১-২২ অর্থবছরে ৮৮.৬ শতাংশ, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৮৪.৩ শতাংশ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৮০.২ শতাংশ।

সারণি ৪.৭ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন (বিলিয়ন টাকায়)

	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬*
	প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত	মার্চ পর্যন্ত
বাজেট বরাদ্দ	২,০৫১.৪	২,২৫৩.২	২,৪৬০.৭	২,৬৩০.০	২,৬৫০.০	২,৩০০.০
সংশোধিত বাজেট	১,৯৭৬.৪	২,০৯৯.৮	২,২৭৫.৭	২,৪৫০.০	২,১৬০.০	২,০০০.০
প্রকৃত বাস্তবায়ন	১,৬০৪.০	১,৮৬০.৬	১,৯১৯.২	১,৯৬৪.৮	১,৪২৩.৩	৮১৪.০*
বাস্তবায়ন (জিডিপির %)	৪.৫০	৪.৭০	৪.৩০	৩.৯৩	২.৫৮	১.৩৩*
সংশোধিত বাজেটের বিপরীতে বাস্তবায়ন (%)	৮১.২	৮৮.৬	৮৪.৩	৮০.২	৬৫.৯	৪০.৭*

** ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাস্তবায়ন তথ্য আইএমইডি থেকে নেওয়া হয়েছে এবং মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত হিসাব নির্দেশ করে।*

সূত্র: অর্থ বিভাগ

তবে, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং সরকারি ব্যয় যৌক্তিকীকরণের অংশ হিসেবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নের হার কমে ৬৫.৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে সংশোধিত বরাদ্দের ৪০.৭ শতাংশ বাস্তবায়িত হয়েছে। এ পরিস্থিতি নির্দেশ করে যে, প্রকল্প গ্রহণের পূর্বপ্রস্তুতি, ক্রয় পরিকল্পনা, ভূমি-সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন, নগদ অর্থপ্রবাহ ব্যবস্থাপনা এবং অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রকল্প পরিবীক্ষণ আরও জোরদার করা প্রয়োজন।

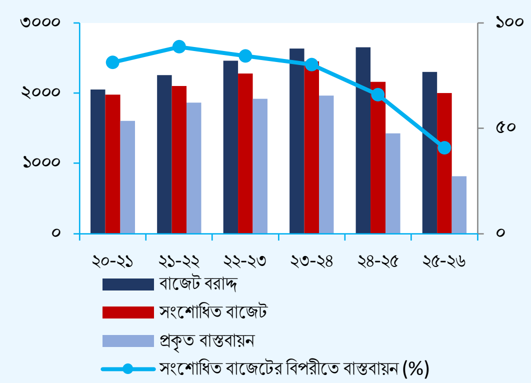

চিত্র ৪.৭ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন

** ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাস্তবায়ন তথ্য আইএমইডি থেকে নেওয়া হয়েছে এবং এটি জুলাই-মার্চ সময়ের সমন্বিত অগ্রগতি নির্দেশ করে।*

নোট: রেখাটি সংশোধিত বাজেটের বিপরীতে বাস্তবায়নের হার নির্দেশ করে।

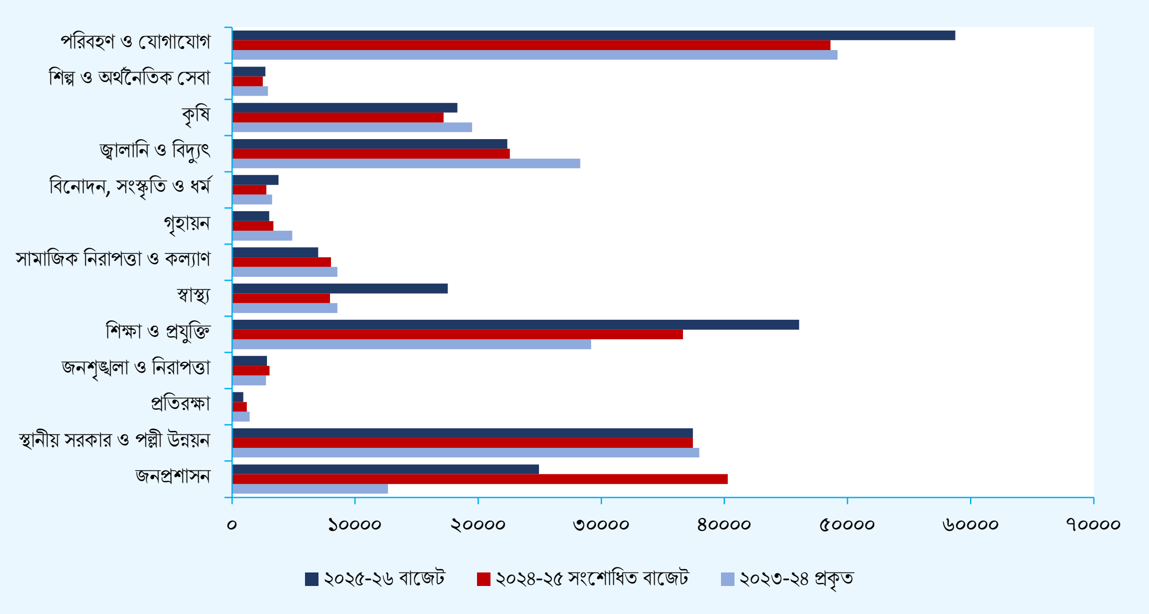

চিত্র ৪.৭ক খাতভিত্তিক উন্নয়ন ব্যয়

সূত্র: অর্থ বিভাগ

উন্নয়ন ব্যয়ের খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার পর্যালোচনায় দেখা যায়, অবকাঠামো উন্নয়ন, মানবসম্পদ গঠন, জ্বালানি নিরাপত্তা, কৃষি উন্নয়ন এবং মৌলিক সেবা সম্প্রসারণে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। পরিবহন ও যোগাযোগ, শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ, কৃষি এবং স্বাস্থ্য খাত উন্নয়ন ব্যয়ের প্রধান অগ্রাধিকারভুক্ত খাত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। মধ্যমেয়াদে সরকারের লক্ষ্য হবে প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও জনকল্যাণে অধিক অবদান রাখতে সক্ষম প্রকল্পসমূহে বরাদ্দ অব্যাহত রাখা এবং কম গুরুত্বপূর্ণ, বিলম্বিত বা পর্যাপ্ত প্রস্তুতিহীন প্রকল্পসমূহ বরাদ্দ পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে উন্নয়ন ব্যয়ের গুণগত মান বৃদ্ধি করা। এর ফলে সরকারি বিনিয়োগের কার্যকারিতা বাড়বে এবং উন্নয়ন ব্যয়ের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, সেবা প্রদানের মানোন্নয়ন ও আঞ্চলিক উন্নয়ন ভারসাম্য রক্ষায় এটি আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

৪.৫.৩ এডিপি বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ

সাম্প্রতিক সময়ে এডিপি বাস্তবায়নের গতি কিছুটা মন্থর হয়ে পড়েছে। এর পেছনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। প্রকল্প অনুমোদনের সময় পর্যাপ্ত প্রস্তুতির ঘাটতি, ক্রয় প্রক্রিয়া ও ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্ব, বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের দুর্বলতা, মাঝপথে প্রকল্প ব্যয় সংশোধন, নকশা পরিবর্তন এবং প্রকল্পভিত্তিক অর্থছাড় ও নগদ প্রবাহ ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, সামষ্টিক অর্থনৈতিক চাপের কারণে কম অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়টি আরও সতর্কভাবে যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। ব্যয়ের গুণগত মান ও আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার জন্য এটি প্রয়োজনীয় হলেও, উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকায় ধীরগতির প্রকল্প বেশি থাকলে স্বল্পমেয়াদে বাস্তবায়ন হার কমে যেতে পারে।

৪.৫.৪ প্রকল্প বাস্তবায়ন উন্নত করার সংস্কার উদ্যোগ

এডিপি বাস্তবায়নের গতি বাড়াতে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় আরও শৃঙ্খলা আনা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে এমন একটি কার্যকর প্রকল্প যাচাই ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার, যাতে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছাড়া কোনো প্রকল্প এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত না হয়। পাশাপাশি বাস্তবসম্মত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, ক্রয় কার্যক্রম সময়মতো শুরু করা, দরপত্র প্রক্রিয়া দ্রুত ও স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করা এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের নিয়মিত পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। প্রকল্পভিত্তিক পর্যালোচনার মাধ্যমে কোন প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে, কোনটি পুনর্গঠন বা একীভূত করা হবে এবং কোনটি পর্যায়ক্রমে বাদ দেওয়া হবে - তা নির্ধারণ করা যেতে পারে। একই সঙ্গে iBAS++, আইএমইডি পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা এবং মন্ত্রণালয় পর্যায়ের ড্যাশবোর্ডের কার্যকর ব্যবহার বাড়ানো হলে প্রকল্প বাস্তবায়নে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।

৪.৬ সরকারি ব্যয় নীতির মূল্যায়ন

বাংলাদেশের সরকারি ব্যয়নীতি এমন এক সময়ে পুনর্বিন্যস্ত করা হচ্ছে, যখন একদিকে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধার এবং অন্যদিকে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এ প্রেক্ষাপটে সরকারি ব্যয়ে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রাধিকার সঠিকভাবে নির্ধারণ করা, প্রবৃদ্ধি-সহায়ক সরকারি বিনিয়োগ বাড়ানো এবং সরকারি সম্পদের ব্যবহারে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

মধ্যমেয়াদে উচ্চতর প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখা এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকারি খাতকে আরও কার্যকর ও সক্ষম করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। এজন্য রাজস্ব আহরণ জোরদার করা, সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা উন্নত করা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা জরুরি। এসব পদক্ষেপের মাধ্যমে সীমিত সম্পদের আরও দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং সরকারি ব্যয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সেবা প্রদানের মানোন্নয়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনে অধিক কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে।

৪.৬.১ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সরকারি ব্যয়ের চিত্র

আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক মানদন্ড বিবেচনায় বাংলাদেশে সরকারি ব্যয়ের হার এখনও তুলনামূলকভাবে কম। আইএমএফের World Economic Outlook/Data Mapper ভিত্তিক আন্তঃদেশীয় উপাত্ত পর্যালোচনায় দেখা যায়, জিডিপি'র অনুপাতে বাংলাদেশের সরকারি ব্যয় ভারত, ভুটান, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, নেপাল ও পাকিস্তানের মতো অর্থনীতির চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে কম। এর অন্যতম কারণ হলো অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণের সীমাবদ্ধতা এবং দীর্ঘদিন ধরে বাজেট ঘাটতি সতর্কতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রবণতা।

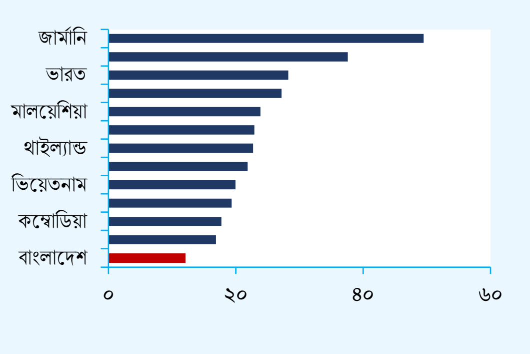

চিত্র ৪.৮ মোট সরকারি ব্যয়

সূত্র: আইএমএফ World Economic Outlook/DataMapper

রাজস্ব আহরণে টেকসই বৃদ্ধি নিশ্চিত করা না গেলে অবকাঠামো, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং লক্ষ্যভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে প্রয়োজনীয় মাত্রায় অর্থায়ন করা কঠিন হবে। একই সঙ্গে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং বাংলাদেশকে ট্রিলিয়ন-ডলার অর্থনীতির পথে এগিয়ে

নেওয়ার জন্য যে পরিমাণ সরকারি বিনিয়োগ প্রয়োজন, তার জন্যও পর্যাপ্ত রাজস্ব সক্ষমতা গড়ে তোলা জরুরি।

৪.৬.২ বাজেট সম্প্রসারণ ও বরাদ্দের গতিধারা

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাজেট বরাদ্দের প্রবৃদ্ধি সমভাবে হয়নি। সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা, চাহিদাজনিত চাপ নিয়ন্ত্রণ এবং ঋণ গ্রহণের ব্যয় সীমিত রাখার লক্ষ্যে ব্যয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারের সতর্ক অবস্থান লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দেও এ সতর্ক অবস্থানের প্রতিফলন দেখা যায়। তবে, মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণে ২০২৬-২৭ অর্থবছর থেকে মূলধন ব্যয় ও উন্নয়ন ব্যয় ধীরে ধীরে বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

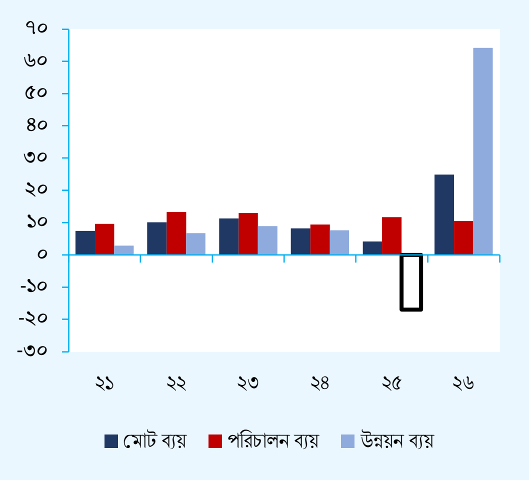

চিত্র ৪.৯ বাজেট বরাদ্দের বছরভিত্তিক প্রবৃদ্ধি (%)
সূত্র: অর্থ বিভাগ

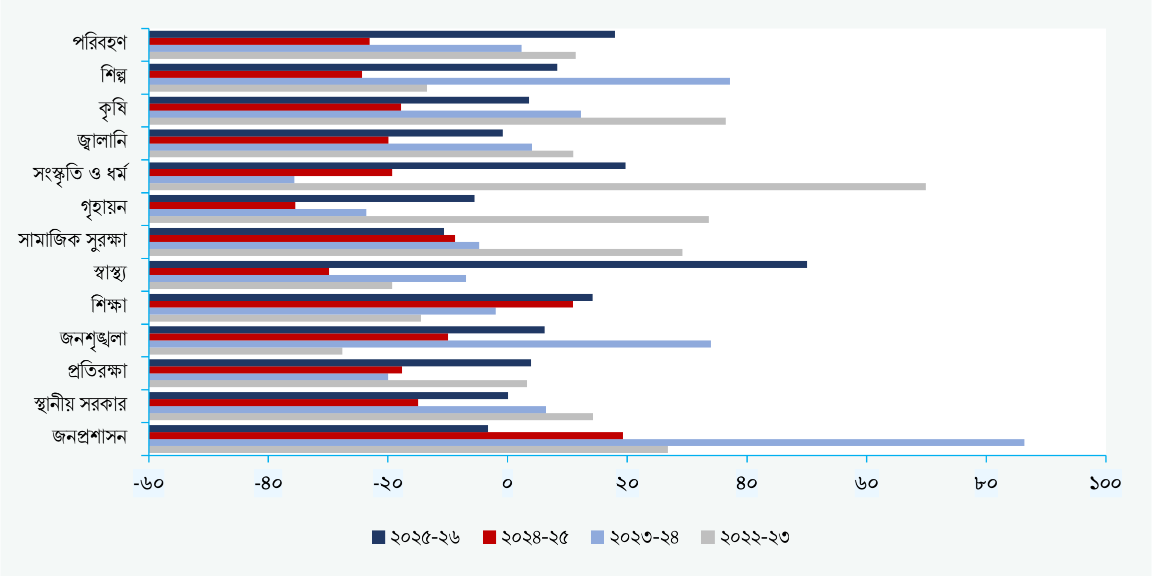

চিত্র ৪.১০ খাতভিত্তিক বরাদ্দের বছরভিত্তিক প্রবৃদ্ধি (%)
সূত্র: অর্থ বিভাগ

এ ব্যয় সম্প্রসারণ কতটা প্রবৃদ্ধি-সহায়ক হবে, তা মূলত নির্ভর করবে ব্যয়ের গুণগত মানের ওপর। প্রকল্প বাছাই যথাযথ না হলে, বাস্তবায়ন সক্ষমতা দুর্বল থাকলে এবং অর্থছাড় ও নগদ প্রবাহ ব্যবস্থাপনা বাস্তবসম্মত না হলে কেবল বরাদ্দ বৃদ্ধি কাঙ্ক্ষিত ফল দেবে না। তাই মধ্যমেয়াদে বাজেট সম্প্রসারণের পাশাপাশি উন্নয়ন

প্রকল্পের গুণগত মান, বাস্তবায়ন শৃঙ্খলা এবং অর্থ ব্যবহারের দক্ষতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪.৬.৩ বাজেট বাস্তবায়ন ও বরাদ্দ-ব্যয়ের ব্যবধান

বাজেট বরাদ্দ এবং প্রকৃত ব্যয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান থাকলে বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা ও কার্যকারিতা উভয়কে দুর্বল করে। একই সঙ্গে সরকারি সম্পদের দক্ষ ব্যবহারও বাধাগ্রস্ত হয়। এ ধরণের ব্যবধানের পেছনে সাধারণত অতিরিক্ত উচ্চাভিলাষী প্রকল্প পরিকল্পনা, অনুমোদন পর্যায়ে প্রকল্পের পর্যাপ্ত প্রস্তুতির ঘাটতি, ক্রয় প্রক্রিয়ায় বিলম্ব, ভূমি অধিগ্রহণের জটিলতা এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে অগ্রাধিকার পরিবর্তনের মতো কারণ কাজ করে।

নির্বাচিত খাতসমূহের বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন পর্যালোচনায় দেখা যায়, কিছু সামাজিক ও অবকাঠামো খাতে বরাদ্দের তুলনায় প্রকৃত ব্যয় তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। তবে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে বরাদ্দ এবং বাস্তবায়নের মধ্যে সামঞ্জস্য তুলনামূলকভাবে ভালো ছিল। এ ধরণের ব্যবধান কমানো সরকারি ব্যয়ের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে উন্নয়ন ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি-সহায়ক ভূমিকা জোরদার হবে, সেবা প্রদানের মান উন্নত হবে এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়ানো সম্ভব হবে।

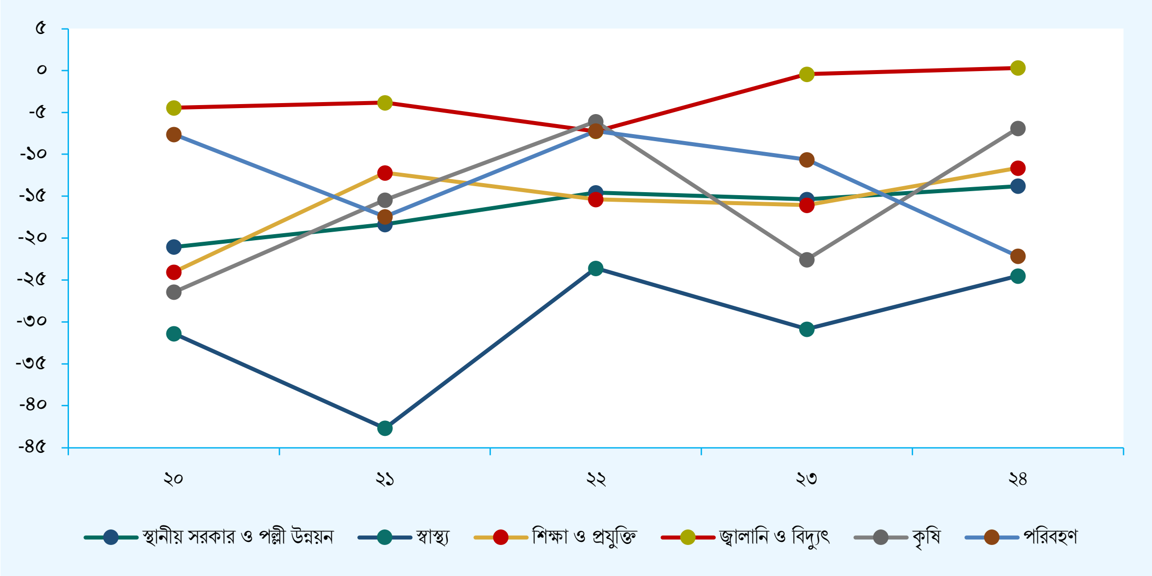

চিত্র ৪.১১ বরাদ্দের তুলনায় বাস্তবায়ন বিচ্যুতি

সূত্র: অর্থ বিভাগ ও আইএমইডি।

৪.৬.৪ বাজেট পরিস্থিতি ও Fiscal Stance

মধ্যমেয়াদে বাংলাদেশের Cyclically Adjusted Primary Balance (CAPB) ঋণাত্মক থাকবে, যা সম্প্রসারণমূলক Fiscal Stance নির্দেশ করে। প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা করার প্রয়োজনের সঙ্গে এ অবস্থান সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে উচ্চ মূল্যস্ফীতি, সুদ ব্যয় বৃদ্ধি এবং সীমিত রাজস্ব আহরণ সক্ষমতার প্রেক্ষাপটে এ নীতি খুব সতর্কভাবে পরিচালনা করা প্রয়োজন।

অর্থনীতিতে চাহিদাজনিত চাপ বিদ্যমান থাকলে দীর্ঘসময় ধরে প্রাথমিক ঘাটতি বজায় রাখা সামষ্টিক অর্থনৈতিক ঝুঁকি বাড়াতে পারে। তাই প্রবৃদ্ধি-সহায়ক ব্যয় অব্যাহত রাখার পাশাপাশি রাজস্ব আহরণ বাড়ানোর বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা বৃদ্ধি করা জরুরি। এর মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয় ব্যয় অব্যাহত রাখার পাশাপাশি সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং সরকারি ঋণের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে।

সারণি ৪.৮ রাজস্ব নীতির ধারা ও ফিসক্যাল ইমপালস সূচক

	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯
	প্রকৃত	প্রকৃত	সংশো.	বাজেট	প্রক্ষেপণ	প্রক্ষেপণ
প্রা. ভারসাম্য	-১.৭৬	-১.৮৫	-১.৬৭	-১.৭৪	-১.৭৪	-১.৮১
CAPB	-১.৮৮	-২.০৯	-১.৯৭	-২.১০	-২.১১	-১.৬১
স্ট্যান্স	১.৮৮	২.০৯	১.৯৭	২.১০	২.১১	১.৬১
ইমপাল্স	-০.৬৫	০.২২	-০.১২	০.১৩	০.০১	-০.৫০

টীকা: *CAPB* < *০* হলে ফিসক্যাল স্ট্যান্স সম্প্রসারণমূলক; ধনাত্মক ফিসক্যাল ইমপাল্স পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় অধিক সম্প্রসারণমূলক নীতি নির্দেশ করে।

সূত্র: অর্থ বিভাগ

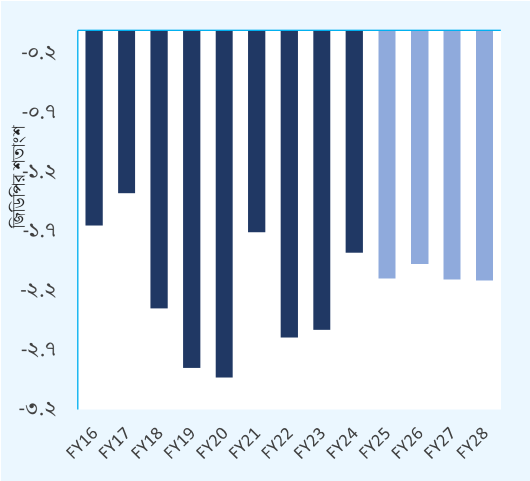

চিত্র ৪.১২ চক্র-সমন্বিত প্রাথমিক ভারসাম্য

সূত্র: অর্থ বিভাগ

৪.৬.৫ Fiscal Impulse ও মধ্যমেয়াদি গতিধারা

Fiscal Impulse-এর মাধ্যমে বোঝা যায়, সরকারের রাজস্ব নীতি আগের বছরের তুলনায় কতটা সম্প্রসারণমূলক হচ্ছে। মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণে দেখা যায়, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রাজস্ব নীতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের তুলনায় কিছুটা কম সম্প্রসারণমূলক হবে। তবে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে মূলধন ব্যয় ও উন্নয়ন ব্যয় বাড়ার কারণে রাজস্ব নীতিতে আবার কিছুটা সম্প্রসারণ হবে। মধ্যমেয়াদি সময়ে এ পরিবর্তন তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল থাকবে, যা সরকারি ব্যয়ে ধারাবাহিকতা বজায় থাকার ইঙ্গিত দেয়।

সার্বিকভাবে, হালনাগাদ ব্যয়নীতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে সাম্প্রতিক ব্যয় সংযমের পর সরকার ধীরে ধীরে প্রবৃদ্ধি-সহায়ক উন্নয়ন ব্যয় বাড়ানোর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তবে এ নীতির সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করবে রাজস্ব আহরণ জোরদার করা, প্রকল্প মূল্যায়ন ও বাছাই প্রক্রিয়া উন্নত করা এবং বাস্তবায়ন বিলম্ব কমানোর ওপর। পাশাপাশি উন্নয়ন ব্যয় যেন সরাসরি উৎপাদনশীলতা, কর্মসংস্থান, উন্নত সেবা প্রদান এবং আঞ্চলিক বৈষম্য

হ্রাসে অবদান রাখতে পারে, সে বিষয়েও বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

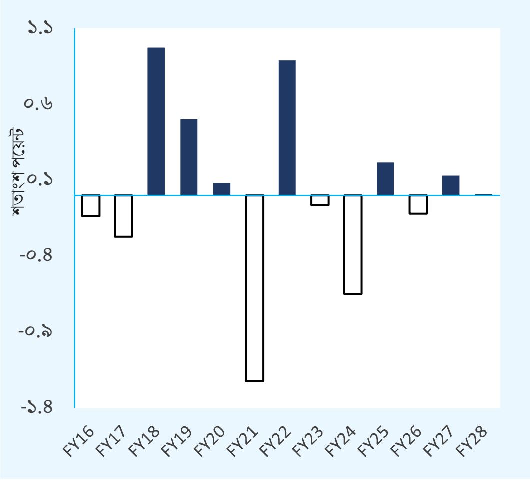

চিত্র ৪.১৩ সরকারের ফিসক্যাল ইমপাল্স

সূত্র: অর্থ বিভাগ

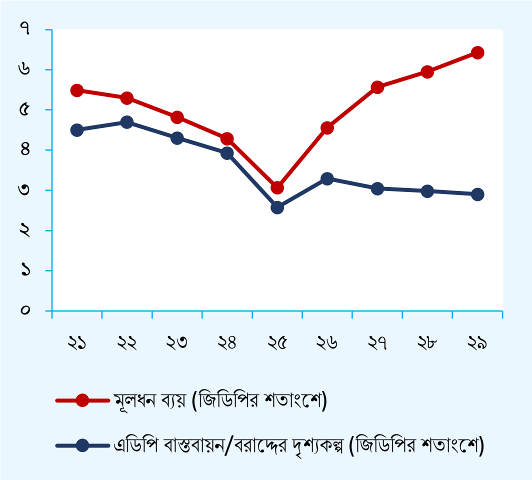

চিত্র ৪.১৪ উন্নয়ন ব্যয় ও মূলধন গঠনের দৃশ্যকল্প

সূত্র: অর্থ বিভাগ

৪.৭ ঘাটতি অর্থায়ন ও ঋণ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ সরকার দক্ষ আর্থিক নীতি, টেকসই ঘাটতি অর্থায়ন এবং সুষ্ঠু ঋণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশ্ব অর্থনীতি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা, মুদ্রাস্ফীতির চাপ, উচ্চ সুদের হার, জ্বালানি বাজারের অস্থিরতা এবং বিনিময় হারের অস্থিতিশীলতাসহ একাধিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে, সরকারের মধ্যমেয়াদী ঋণ ব্যবস্থাপনা কৌশলের প্রধান লক্ষ্য হলো রাজস্ব ও ঋণের স্থিতিশীলতা বজায় রেখে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সহায়তা করা। ধারনা করা হচ্ছে যে, সহজ শর্তে অর্থায়নের সুযোগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে। যা ঋণের ব্যয় বৃদ্ধি এবং পুনঃঅর্থায়নের (Refinancing) ঝুঁকি বাড়াবে। পরিবর্তিত এই পরিস্থিতে, ঋণ ব্যবস্থাপনায় বিচক্ষণতা, কার্যকর নগদ ব্যবস্থাপনা এবং অর্থায়নের উৎসের বৈচিত্র্যকরণ ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অতিরিক্ত ঋণের চাপ এড়িয়ে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকার বাজেট ঘাটতি অর্থায়নে সতর্ক নীতি অনুসরণ করে আসছে। সরকার এই লক্ষ্যে বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

৪.৭.১ ঘাটতি অর্থায়ন

বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের জন্য সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। ভর্তুকি ব্যয়, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি, অবকাঠামো বিনিয়োগ এবং ঋণ পরিশোধজনিত দায়ের কারণে আর্থিক চাপ অব্যাহত থাকলেও সরকার রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি এবং ব্যয় যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে বাজেট ঘাটতিকে সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে কাজ করছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছর থেকে ২০২৮-২৯ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশের বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের গতিধারা ও মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে নীট অর্থায়নের পরিমান ছিল ১,৯০৪ বিলিয়ন টাকা যা ২০২৮-২৯ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৩,২০০ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হতে পারে। সরকার মূলত ট্রেজারি বিল ও ট্রেজারি বন্ডকে বাজারভিত্তিক ঋণগ্রহণের প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া সরকারের দৈনন্দিন নগদ

অর্থের চাহিদা পূরণে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাপনা হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের Ways and Means Advances (WMA) এবং Overdraft সুবিধা ব্যবহৃত হয়। সরকার ২০২০ সাল থেকে ইসলামিক 'সুকুক' চালু করেছে। আগামী অর্থবছর থেকে স্বল্পমেয়াদি ইসলামী ট্রেজারি বিল চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।

অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ১৩৪৮ বিলিয়ন টাকা থেকে ২০২৮-২৯ অর্থবছরে অর্থায়ন ১,৮৪০ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হলেও, জিডিপির শতাংশ হিসাবে তা প্রায় স্থিতিশীল রয়েছে এবং যা একই সময়ে ২.৪ শতাংশ থেকে ২.১ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যা বন্ড বাজারকে উৎসাহিত করা এবং পুঁজিবাজারকে শক্তিশালী করার জন্য ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। অন্যান্য দেশীয় অর্থায়ন উপকরণের মধ্যে খুচরা বিনিয়োগভিত্তিক সঞ্চয়পত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে অন্যান্য দেশীয় অর্থায়ন উৎসে সময়ভেদে কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার সাধারণত কম সুদের হার, দীর্ঘ গ্রেস পিরিয়ড এবং দীর্ঘ মেয়াদকালসহ নমনীয় ঋণকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। বৈদেশিক নিট অর্থায়ন জিডিপির অনুপাতে স্থিতিশীল রয়েছে এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছর থেকে ২০২৮-২৯ অর্থবছর পর্যন্ত প্রায় ১.৬০ শতাংশে স্থিতিশীল থাকবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এটি ঋণের বৈদেশিক উৎসের ওপর একটি নিয়ন্ত্রিত ও পরিমিত নির্ভরতার ইঙ্গিত বহন করে। অর্থায়নের ব্যয় ও ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি, সরকার তার অর্থায়নের উৎস বহুমুখীকরণের মাধ্যমে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও টেকসই অর্থায়ন কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে।

নিচের সারণিতে অর্থায়ন পরিস্থিতি এবং মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস উপস্থাপন করা হয়েছে:

সারণি ৪.৯ ঘাটতি অর্থায়ন ২০২৪-২৫ হতে ২০২৮-২৯ অর্থবছর (বিলিয়ন টাকা)

সূচক	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রাক্কলন	প্রক্ষেপণ	
	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯
নীট অর্থায়ন	১৯০৪	২,২৬০	১৯৫০	২,৩৮০	২,৬৬০	৩,২০০
	(৩.৫)	(৩.৬২)	(৩.২০)	(৩.৪৮)	(৩.৪৫)	(৩.৬৮)
অভ্যন্তরীণ (নীট)	১৩৪৮	১,২৫০	১,৩৪০	১,২৭০	১,৪৭২	১৮৪০
	(২.৪)	(২.০)	(২.২)	(১.৯)	(১.৯)	(২.১)
বৈদেশিক (নীট)	৫৫৬	১,০১০	৬১০	১১১০	১১৮৮	১৩৬০
	(১.০)	(১.৬)	(১.০)	(১.৬)	(১.৫)	(১.৬)
ব্যাংক	১,১৪২	১,০৪০	১,১৪২	১,১২০	১,২৬২	১৫৯০
নন-ব্যাংক	২০৬	২১০	১৪৩.৩	১৫০	২১০	২৫০
সঞ্চয়পত্র	১২৮	১২৫	৩৪	৮৫	১২৫	১৫০
অন্যান্য	৭৮	৮৫	১০৯.৩	৬৫	৮৫	১০০

() বন্ধনীর ভিতরের অংক জিডিপি'র শতাংশ নির্দেশ করে।

সূত্র: অর্থ বিভাগ

৪.৭.২ অর্থায়ন ব্যয়

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ মূলত সহজ শর্তে স্বল্প ব্যয়ের বৈদেশিক অর্থায়নের সুবিধা ভোগ করে আসছে। তবে, নমনীয় ঋণপ্রাপ্তির সুযোগ ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে এবং বৈদেশিক ঋণ ক্রমান্বয়ে আংশিক-নমনীয় (Semi-concessional) ও বাজারভিত্তিক (Market-based) শর্তে গ্রহণ করা হচ্ছে। সরকারের সুদ পরিশোধ ব্যয়ের

প্রক্ষেপণে দেখা যাচ্ছে, আগামী বছরগুলোতে সুদ ব্যয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে। ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি, দেশীয় সুদের হারের উর্ধ্বগতি, বাংলাদেশি টাকার অবমূল্যায়ন, বৈশ্বিক অর্থায়ন পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ এবং বৈদেশিক ঋণের দায় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সুদ ব্যয় বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সুদ পরিশোধের পরিমাণ ছিল ১,৩৬১ বিলিয়ন টাকা, যা ২০২৮-২৯ অর্থবছরে বেড়ে ১,৬২৭ বিলিয়ন টাকায় পৌঁছাতে পারে। তবে, জিডিপির অনুপাতে সুদ ব্যয় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ২.৫ শতাংশ থেকে কমে ২০২৮-২৯ অর্থবছরে ১.৯ শতাংশ হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মোট সুদ ব্যয়ের অধিকাংশই দেশীয় ঋণের সুদ পরিশোধজনিত। ট্রেজারি বন্ড ও জাতীয় সঞ্চয়পত্রের ইস্যু বৃদ্ধি, বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিগত সুদের হার বৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা এবং আর্থিক বাজারে উচ্চ সুদের হারের কারণে সুদ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও অভ্যন্তরীণ ঋণ বিনিময় হারের ঝুঁকি (Exchange Rate Risk) কমাতে সাহায্য করে, তথাপি উচ্চ সুদের হার অর্থায়নের সামগ্রিক ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ পরিশোধ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১,১৮৩ বিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৮-২৯ অর্থবছরে ১,২২৪ বিলিয়ন টাকায় পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অন্যদিকে, বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধ মোট সুদ ব্যয়ের তুলনায় কম। তবে, এটি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৭৮ বিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৮-২৯ অর্থবছরে ৪০৩ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হতে পারে। এপ্রেক্ষিতে বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধের কার্যকর ব্যবস্থাপনা শুধু আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যই নয়; বরং এটি সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রক্ষা, টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা, আন্তর্জাতিক ঋণমান বজায় রাখা এবং ভবিষ্যতের উন্নয়ন সম্ভাবনা সুরক্ষিত করার জন্য অপরিহার্য। সাম্প্রতিক সময়ে বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বিষয়টির গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ৪.১০ সুদ পরিশোধ ২০২৪-২৫ হতে ২০২৮-২৯ অর্থবছর (বিলিয়ন টাকা)

সূচক	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রাক্কলন	প্রক্ষেপণ	
	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯
মোট	১৩৬১	১,২৭০	১,২৭০	১,২৭৫	১,৪২১	১,৬২৭
	(২.৫)	(২.০)	(২.০)	(১.৯)	(১.৮)	(১.৯)
অভ্যন্তরীণ	১১৮৩	১,০৫০	১০৫০	১০৫০	১১২১	১২২৪
	(২.১)	(১.৬)	(১.৬)	(১.৫৪)	(১.৪৬)	(১.৪১)
বৈদেশিক	১৭৮	২২০	২২০	২২৫	৩০০	৪০৩
	(০.৩২)	(০.৩৫)	(০.৩৫)	(০.৩৩)	(০.৩৯)	(০.৪৬)

() বন্ধনীর ভিতরের অংক জিডিপি'র শতাংশ নির্দেশ করে।

সূত্র: অর্থ বিভাগ

৪.৭.৩ অর্থায়ন কৌশল

সরকারের অর্থায়ন কৌশলের মূল লক্ষ্য হলো অর্থায়নের ব্যয় ও আর্থিক ঝুঁকির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে উন্নয়ন অগ্রাধিকারসমূহ বাস্তবায়ন এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান নিশ্চিত করা। তবে, বিনিময় হারের ওঠানামা, অভ্যন্তরীণ ঋণের ব্যয় বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ ক্রমবর্ধমান চাপের সম্মুখীন হচ্ছে। জিডিপির তুলনায় কর-রাজস্ব আহরণের হার কম হওয়ায়

সরকারের আর্থিক পরিসর (Fiscal Space) সীমিত। অন্যদিকে, উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য দেশজুড়ে বিস্তৃত ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো তৈরি প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটে, সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে একটি মধ্যমেয়াদি ঘাটতি অর্থায়ন কৌশল অনুসরণ করছে। ঘাটতি অর্থায়নের অভ্যন্তরীণ উৎস হিসেবে ট্রেজারি বন্ড ও বিল এবং জাতীয় সঞ্চয় স্কিম প্রধান ভূমিকা পালন করছে। বৈদেশিক উৎস সমূহের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উৎস থেকে প্রাপ্ত নমনীয় ও অ-নমনীয় ঋণ উল্লেখযোগ্য।

মধ্যমেয়াদে কোন উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করা হবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সরকার ২০২৬-২৭ অর্থবছর থেকে ২০২৮-২৯ অর্থবছরের জন্য একটি মধ্যমেয়াদি ঋণ কৌশল (MTDS) প্রণয়ন ও অনুমোদন করেছে। MTDS-এর সর্বাধিক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত Strategy-1 অনুযায়ী স্বল্পমেয়াদি ট্রেজারি বিলের পরিবর্তে অধিক পরিমাণে ট্রেজারি বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে দেশীয় অর্থায়ন বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদে বৈদেশিক মুদ্রাজনিত ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে সরকার দেশীয় ঋণ বাজারকে আরও গভীর ও কার্যকর করার ওপর গুরুত্বারোপ করছে। তবে আর্থিক খাতে তারল্য পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে সংকুচিত থাকায় এ কৌশল বাস্তবায়নে কিছু চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান থাকবে। এ চাপ মোকাবিলায় সরকার দেশীয় ঋণ বাজারে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

সরকার ২০২৬ সালের জানুয়ারী থেকে কার্যকর প্রাইমারি ডিলার ব্যবস্থায় সংস্কার এনেছে, যা প্রাইমারি ডিলারদের জন্য ভারসাম্যপূর্ণ Rewards and Responsibilities নিশ্চিত করবে। নতুন ব্যবস্থাটি সরকারি সিকিউরিটিজের সেকেন্ডারি মার্কেটে তারল্য বাড়াবে, যা স্থানীয় মুদ্রার বন্ড বাজার বিকাশের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখবে। এছাড়াও, জানুয়ারী ২০২৫ হতে সরকার জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের সুদের হারকে বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এখন জাতীয় সঞ্চয় স্কিম সমূহের সুদের হার সরকারী বন্ড (যেমন ৫ বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ড) এর সুদের হারের সঙ্গে সংযুক্ত, যা বাজার পরিস্থিতি অনুযায়ী সমন্বিত হবে। এর ফলে জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহ ও বাজারভিত্তিক হারের মধ্যে বড় ধরণের পার্থক্য হ্রাস পাবে। সরকারের অর্থায়ন কৌশল একটি গতিশীল কাঠামো যা দেশের উন্নয়ন ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণে পরিবর্তিত হয়। এ কৌশলে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা, স্থানীয় পুঁজিবাজারের উন্নয়ন এবং দক্ষ ঋণ ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে দেশের টেকসই প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করা যায়।

৪.৭.৪ ঋণ প্রোফাইল

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের শেষে মোট সরকারি ঋণের পরিমাণ ছিল জিডিপির ৩৮.৯ শতাংশ, যার মধ্যে ২১.৭ শতাংশ এসেছে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে এবং ১৭.২ শতাংশ এসেছে বৈদেশিক উৎস থেকে। জুন ২০২৫ পর্যন্ত, অভ্যন্তরীণ ঋণের (মোট ঋণের ৫৫.৭৩ শতাংশ) মধ্যে সর্বোচ্চ ছিল বাজার ব্যবস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ, এরপরেই রয়েছে জাতীয় সঞ্চয়পত্র (NSC)। এই প্রবৃদ্ধি মূলত সরকারি বন্ড ও অন্যান্য ঋণ উপকরণের মাধ্যমে দেশীয় উৎস হতে অধিক অর্থায়ন সংগ্রহের কৌশলগত প্রচেষ্টার প্রতিফলন, যা স্থানীয় পুঁজিবাজারের বিকাশ এবং আর্থিক বাজারের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। অন্যদিকে, জিডিপির অনুপাতে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১০.৮ শতাংশ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ ১৭.২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। যদিও বর্তমানে বাংলাদেশের ঋণ-জিডিপি অনুপাত আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) নির্ধারিত সহনীয় সীমার মধ্যে রয়েছে, তবুও ঋণের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দীর্ঘমেয়াদে আর্থিক ও ঋণ স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সতর্ক পর্যবেক্ষণ এবং সময়োপযোগী নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কম রাজস্ব আহরণ এবং ঋণ পরিশোধ ব্যয় বৃদ্ধিজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা দেশের

অর্থনীতি স্থিতিশীল ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।

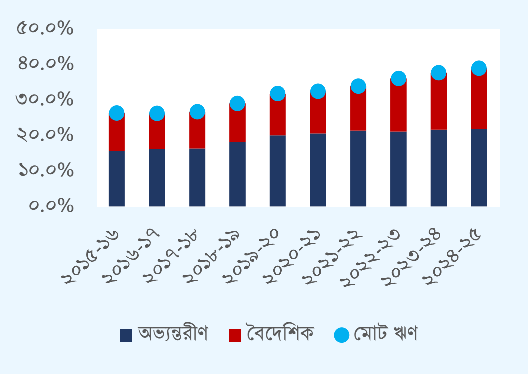

চিত্র ৪.১৫ ঋণ জিডিপির অনুপাত

সূত্র: অর্থ বিভাগ

৪.৭.৫ ঋণ স্থিতির মধ্যমেয়াদী প্রক্ষেপণ

মধ্যমেয়াদে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ জিডিপির অনুপাতে মোটামুটি স্থিতিশীল থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২০২৮-২৯ অর্থবছরের শেষে মোট ঋণ জিডিপির ৩৮.৯০ শতাংশে স্থিতিশীল থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। যার মধ্যে অভ্যন্তরীণ ঋণ জিডিপির ২১.৬ শতাংশ এবং বৈদেশিক ঋণ ১৭.২৪ শতাংশ হতে পারে। বিগত বছরগুলোর অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের বণ্টন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সরকার অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণ নেওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এলডিসি হিসেবে বাংলাদেশ বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন অংশীদারদের কাছ থেকে অনুদান এবং নমনীয় ঋণ (কম সুদের হার, দীর্ঘ পরিশোধকাল) প্রাপ্তির সুবিধা ভোগ করে আসছে। তবে, ধারনা করা হচ্ছে অর্থায়নের এ সহজ উৎস ধীরে ধীরে কমে আসবে। সেসময় বাংলাদেশকে উচ্চ সুদের হার ও স্বল্প মেয়াদের বাণিজ্যিক ঋণের ওপর আরও বেশি নির্ভর করতে হতে পারে, যার ফলে সার্বিকভাবে ঋণ পরিশোধ ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। এই প্রেক্ষাপটে, ঋণের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন হবে বিচক্ষণ আর্থিক ব্যবস্থাপনা, শক্তিশালী ঋণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এবং একটি পরিকল্পিত ঋণ কৌশল, যার লক্ষ্য হবে পুনঃঅর্থায়ন ও বিনিময় হারের ঝুঁকি কমানো এবং একই সাথে অর্থায়নের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা। মধ্যমেয়াদী ঋণের চিত্র মূলত কাঠামোগত ও আর্থিক সংস্কারের সফল বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করবে। এক্ষেত্রে প্রধান অগ্রাধিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি, দেশীয় বন্ড বাজারকে আরও শক্তিশালী করা, রপ্তানি বৈচিত্র্যময় করা, সরকারি বিনিয়োগে দক্ষতা উন্নয়ন এবং ঋণ ও নগদ অর্থ ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা শক্তিশালী করা।

সারণি ৪.১১ ঋণ স্থিতি ২০২৪-২৫ হতে ২০২৮-২৯ অর্থবছর (বিলিয়ন টাকা)

সূচক	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রাক্কলন	প্রক্ষেপণ	
	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯
মোট ঋণ	২১,৪৪০	২৩,৪২০	২৩,২২৩	২৬,৩৩১	২৯,৫৬৭	৩৩,৭৭৬
	(৩৮.৯)	(৩৭.৫০)	(৩৮.২)	(৩৮.৬০)	(৩৮.৪)	(৩৮.৯)
অভ্যন্তরীণ	১১,৯৪৯	১৩,২৬৮	১৩,৫২১	১৫,০২৪	১৬,৭২৮	১৮,৮০০
	(২১.৭)	(২১.২৫)	(২২.২)	(২২.০)	(২১.৭)	(২১.৬)
	{৫৭.২১}	{৫৬.৬৫}	{৫৮.২২}	{৫৭.০৫}	{৫৬.৫৭}	{৫৫.৬৬}
বৈদেশিক	৯,৪৯২	১০১৫২	৯,৭০২	১১,৩০৭	১২,৮৩৯	১৪,৯৭৬
	(১৭.২)	(১৬.২৬)	(১৫.৯৫)	(১৬.৫৫)	(১৬.৬৯)	(১৭.২৪)
	{৪২.৭৯}	{৪৩.৩৫}	{৪১.৭৮}	{৪২.৯৫}	{৪৩.৪২}	{৪৪.৩৩}

() বন্ধনীর ভিতরের অংক জিডিপির অনুপাত এবং { } মোট ঋনের অনুপাত নির্দেশ করে।

সূত্র: অর্থ বিভাগ

৪.৭.৬ বৈদেশিক ঋণের পরিশোধসূচি

২০২৪-২৫ অর্থবছরের শেষে সরকার বৈদেশিক ঋণের আসল পরিশোধ বাবদ ২৬১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিশোধ করেছে এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এই পরিমাণ বেড়ে ৩১৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে। ২০২৮-২৯ অর্থবছরে আসল পরিশোধের পরিমাণ ৪২৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ঋণের মেয়াদপূর্তি, মুদ্রার অবমূল্যায়ন এবং কিছু ঋণের গ্রেস পিরিয়ড শেষ হওয়ায় আগামী বছরগুলোতে বর্ধিত ঋণ পরিশোধের বাধ্যবাধকতা বেড়ে যাবে। মার্কিন ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার অবমূল্যায়ন বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়।

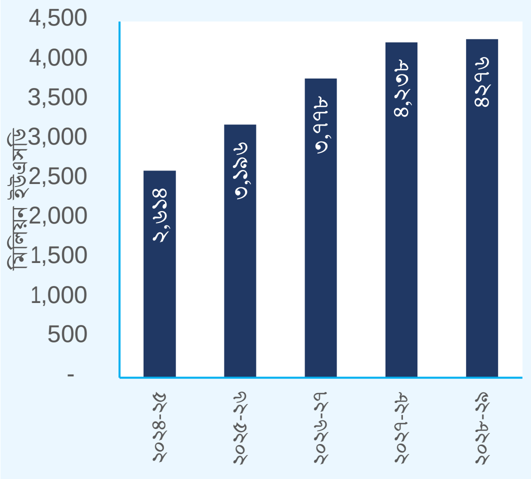

চিত্র ৪.১৬ বৈদেশিক ঋণের পরিশোধ সূচি

সূত্র: অর্থ বিভাগ

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে টাকার মূল্যমান উল্লেখযোগ্যভাবে অবনমন হওয়ায় এ সমস্যা আরও প্রকট হয়েছে। আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে এবং তারল্য সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য ঋণ পরিশোধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও সরকারের অর্থায়নের উৎস বৈচিত্র্যময় এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির জন্য সরকারের নানা প্রচেষ্টার ফলে এটি সহনীয় সীমার মধ্যে থাকবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

৪.৭.৭ বৈদেশিক ঋণের মুদ্রাভিত্তিক চিত্র

বৈদেশিক ঋণের মুদ্রাভিত্তিক চিত্র (Currency Mix) সরকারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়, কারণ বিনিময় হার পরিবর্তনের ফলে ঋণ পরিশোধের ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ পোর্টফোলিও মূলত তিনটি প্রধান মুদ্রা যথাঃ মার্কিন ডলার (USD), স্পেশাল ড্রইং রাইটস (SDR) এবং জাপানি ইয়েন (JPY)-এ কেন্দ্রীভূত ছিল। এ তিনটি মুদ্রায় সম্মিলিতভাবে মোট বৈদেশিক ঋণের পরিমান ছিল প্রায় ৯১ শতাংশ। শুধুমাত্র মার্কিন ডলার (USD) এবং এসডিআর (SDR) ভিত্তিক ঋণই মোট পোর্টফোলিওর প্রায় ৭১ শতাংশ, যা বহুপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অর্থায়ন উৎসের ওপর বাংলাদেশের অব্যাহত নির্ভরতার প্রতিফলন। তবে ঋণের একটি বড় অংশ এসডিআর (SDR) ভিত্তিক হওয়ার কারণে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) এবং বিশ্বব্যাংকসহ বহুপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কনসেশনাল ঋণ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। এছাড়া, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার জনিত হ্রাস-বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক আর্থিক বাজারের পরিবর্তনের ফলে ঋণ পরিশোধজনিত ঝুঁকি বৃদ্ধি পেতে পারে, কারণ ঋণের বড় একটি অংশ মার্কিন ডলার (USD) ভিত্তিক। অন্যদিকে, জাপানি ইয়েন ভিত্তিক ঋণ মোট পোর্টফোলিওর প্রায় ২০ শতাংশ, যা মূলত জাপানের দীর্ঘমেয়াদি কনসেশনাল প্রকল্প ঋণের সঙ্গে সম্পর্কিত। এছাড়া ইউরো এবং চীনা রেনমিনবি (RMB) ভিত্তিক ঋণের অংশ যথাক্রমে ৫ শতাংশ ও ৩ শতাংশ। অন্যান্য মুদ্রার অংশ ছিল অবশিষ্ট ১ শতাংশ।

বর্তমান বৈদেশিক ঋণ পোর্টফোলিও এর মুদ্রাভিত্তিক বিন্যাস তুলনামূলকভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ। তবে প্রধান

বৈদেশিক মুদ্রাসমূহের, বিশেষত ইউএসডি-এর বিনিময় হারের ওঠানামা বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ ব্যয় এবং সামগ্রিক আর্থিক ব্যবস্থাপনার ওপর ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহারের কৌশলগত মিশ্রণ (Strategic Mix of Choices) এর মূল লক্ষ্য হলো বিনিময় হারের ঝুঁকি কার্যকরভাবে ব্যবস্থাপনা করা এবং প্রধান মুদ্রাগুলোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। বাংলাদেশ তার বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে বিনিময় হারের সম্ভাব্য প্রতিকূল গতিবিধির ঝুঁকি কমাতে আর্থিক উপকরণ (Financial Instruments) এর বিপরীতে হেজিং (Hedge) ব্যবহারের পরিকল্পনা করছে।

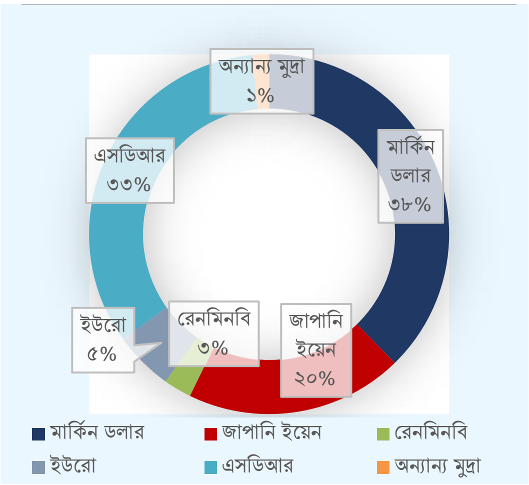

চিত্র ৪.১৭ বৈদেশিক মুদ্রার মিশ্রণ

সূত্র: অর্থ বিভাগ

৪.৭.৮ প্রচ্ছন্ন দায়

দেশের ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ চাহিদা মেটাতে প্রবৃদ্ধি-সঞ্চারক বিদ্যুৎ, জ্বালানি, কৃষি ও বেসামরিক বিমান চলাচলসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতের ঋণের বিপরীতে সরকার গ্যারান্টি (নিশ্চয়তা) বা কাউন্টার-গ্যারান্টি প্রদান করে থাকে। ২০২৬ সালের মার্চ পর্যন্ত সরকারের মোট সার্বভৌম গ্যারান্টির স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১,০৩৯.৭৪ বিলিয়ন টাকা, যা জিডিপির প্রায় ১.৬ শতাংশ। বৈশ্বিক বাজারের ক্রমবর্ধমান অস্থিতিশীলতা মোকাবিলা, জাতীয় খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং পুঁজিবাজারে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন গঠনের মতো কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনে সরকার গ্যারান্টি প্রদানকে অন্যতম প্রধান আর্থিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। ভর্তুকি মূল্যে দেশব্যাপী নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ সচল রাখতে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য এই সরকারি নিশ্চয়তা মূলত একটি বিশেষ 'ক্রেডিট এনহ্যান্সমেন্ট' হিসেবে কাজ করে। নিজস্ব স্থায়ী মূলধনের ঘাটতি থাকায় এসব প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক, দেশীয় রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বিদেশী ঋণদাতা থেকে স্বল্প সুদে ঋণ পেতে এই গ্যারান্টি সহায়তা দেয়। এরই ধারাবাহিকতায়, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সরকার ৯৩.৮৯ বিলিয়ন টাকার নতুন গ্যারান্টি ইস্যু করেছে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল টিসিবি, বিএডিসি ও বিসিআইসির মাধ্যমে জরুরি খাদ্য ও সার আমদানি নিশ্চিত করা এবং প্রান্তিক কৃষক ও তৃণমূলের কর্মসংস্থান তৈরিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিশেষ ঋণ স্কিমগুলোকে আর্থিক সুরক্ষা প্রদান করা। একই সাথে, দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে এই গ্যারান্টি কাঠামো বড় ভূমিকা রাখছে। মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংকটে যখন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর তীব্র চাপ তৈরি হয়েছে, তখন বিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপাদান এলএনজি আমদানির ব্যয় নিয়ন্ত্রণে ৩৫০ মিলিয়ন ডলারের বিশ্বব্যাংক সমর্থিত 'এনার্জি সেক্টর সিকিউরিটি এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট' গ্রহণ করা হয়। এটি পেট্রোবাংলাকে স্পট মার্কেট হতে চড়া মূল্যে এলএনজি ক্রয়ের পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদী ও সাশ্রয় চুক্তির আওতায় ঋণ পাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। মূলত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ ছাড়ের শর্ত হিসেবে বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাংককে একটি 'Indemnity Guarantee' বা কাউন্টার-গ্যারান্টি প্রদান করে।

সার্বভৌম গ্যারান্টির বিপরীতে নেওয়া এসব ঋণের যথাসময়ে পরিশোধ নিশ্চিত করতে অর্থ বিভাগ একটি আন্তঃ মন্ত্রণালয় মনিটরিং কমিটি গঠন করেছে। কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান খেলাপি হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ার আগেই

এই মনিটরিং কমিটি আগাম সতর্কবার্তা প্রদান করবে, যাতে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের ওপর সম্ভাব্য আর্থিক ঝুঁকি পূর্বেই রোধ করা সম্ভব হয়। এই নিবিড় নজরদারির পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে সার্বভৌম গ্যারান্টি প্রদান ও এর সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার নিয়মকানুন আরও কঠোর, আধুনিক ও সুনির্দিষ্ট করার উদ্যোগ নিয়েছে। এই সংস্কারের মূল লক্ষ্য হলো-গ্যারান্টিগুলোর যেকোনো ধরণের অপব্যবহার রোধ করা, সরকারের আর্থিক ঝুঁকি ধারণযোগ্য পর্যায়ে রাখা এবং আন্তর্জাতিক মানদন্ড মেনে সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৪.৭.৯ ঋণ ধারণ সক্ষমতা যাচাই

বাংলাদেশের সরকারি ঋণের অবস্থান সার্বিকভাবে টেকসই। তবে, পরিবর্তনশীল অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ঋণ-সম্পর্কিত দুর্বলতাগুলোর নিবিড় পর্যবেক্ষণ করা জরুরী হয়ে পড়েছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে ঋণ-জিডিপি অনুপাত মাঝারি পর্যায়ে থাকলেও, সরকারি ঋণের উর্ধ্বমুখী প্রবণতা ভবিষ্যতে আর্থিক বিচক্ষণতা ও ঋণ ব্যবস্থাপনা নীতির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। সর্বশেষ ডিএসএ (DSA) অনুযায়ী, প্রধান বৈদেশিক ও সরকারি ঋণ সূচক ঝুঁকি সীমার (Policy-Dependent Thresholds) নিচে রয়েছে। তবে, বৈদেশিক ঋণ-রপ্তানি সংক্রান্ত অনুপাত ঝুঁকিতে রয়েছে, যার অগ্রগতি সাধিত না হলে মধ্যমেয়াদে ঋণ ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। আশার কথা, সরকার এই ঝুঁকিগুলো প্রশমিত করতে ঋণ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ, অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি, সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা উন্নয়ন এবং অভ্যন্তরীণ ঋণ বাজারকে আরও গভীর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আর্থিক স্বচ্ছতা ও ঝুঁকি মূল্যায়ন জোরদার করার চলমান প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, সরকার দুর্বলতাগুলো পুনঃমূল্যায়ন করতে এবং তথ্যভিত্তিক নীতি প্রণয়নে সহায়তা করার জন্য হালনাগাদকৃত সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য ব্যবহার করে ৩০ জুন, ২০২৭-এর মধ্যে আরেকটি ঋণ ঝুঁকি বিশ্লেষণ (ডিএসএ) কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা করছে।

এটি অনস্বীকার্য যে, অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সরকারের অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ বেসরকারি খাতের ঋণপ্রবাহকে সংকুচিত করে এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য যা অপরিহার্য সেই বিনিয়োগকে বাধাগ্রস্ত করে। এ কারণে মধ্যমেয়াদে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো অভ্যন্তরীণ অর্থায়নের উপর নির্ভরতা কমানো । তবে, একই সময়ে সরকারের এমন কতগুলো ব্যয়ের খাত রয়েছে যা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই, যেমন, ঋনের মেয়াদ পূর্তিতে পুনঃঅর্থায়ন, সুদ পরিশোধ এবং অর্থনীতিকে প্রবৃদ্ধির ধারায় নিয়ে আসতে প্রয়োজনীয় সরকারি ব্যয় অব্যাহত রাখা। এই বাস্তবতায় স্বল্পমেয়াদে সরকারের অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন কিছুটা বাড়তি থাকবে, তবে তার সার্বিক গতিমুখ হবে নিম্নমুখী। এই লক্ষ্য অর্জনে সরকার দুটি পদক্ষেপে অঙ্গীকারবদ্ধ: সরকারি ব্যয়ের মান ও উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করা, যাতে প্রতিটি ঋণের বিপরীতে অর্থনীতিতে আয়ের সৃজন হয় এবং ঋণ পরিশোধ সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া, রাজস্ব সংস্কারের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে বাজেট ঘাটতি সংকুচিত করা। রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি পেলে এবং ঘাটতি কমলে, মোট বাজেট ঘাটতি ও জিডিপি উভয়ের অনুপাতে অভ্যন্তরীণ অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা স্বাভাবিকভাবেই কমে আসবে — যা বেসরকারি খাতের ঋণপ্রাপ্তির সুযোগ প্রশস্ত করবে এবং বিনিয়োগের গতি বৃদ্ধি করবে।

৪.৮ উপসংহার

বাংলাদেশের মধ্যমেয়াদি সরকারি ব্যয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা কাঠামো মূলত দুটি লক্ষ্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করে — একদিকে রাজস্ব খাতের স্থায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করা, অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক রূপান্তরের জন্য বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করা। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে চাহিদা নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ ও রাজস্ব আহরণের দুর্বলতার কারণে সরকারি ব্যয় জিডিপির ১১.৪ শতাংশে

নেমে আসে, যা সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সম্পদের আরও কার্যকর বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট করে তুলেছে। ২০৩৪ সালের মধ্যে এক ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মধ্যমেয়াদে অবকাঠামো উন্নয়ন, মানবপুঁজি গঠন এবং বেসরকারি খাতনির্ভর প্রবৃদ্ধিকে সহায়তা করতে ২০২৮-২৯ অর্থবছর নাগাদ সরকারের মোট ব্যয় ধাপে ধাপে জিডিপির ১৪.৪ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এই কাঠামোর একটি মূল বৈশিষ্ট্য হলো পরিচালন ব্যয়ের

তুলনায় উন্নয়ন ও মূলধন ব্যয়ের অংশ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা, বিশেষত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মাধ্যমে। এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হলো উৎপাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধি, অবকাঠামো ও সেবার মান উন্নয়ন এবং দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক সহনশীলতা জোরদার করা। পাশাপাশি রাজস্ব ঘাটতিকে সংযত সীমার মধ্যে রাখতে সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা বৃদ্ধি, ভর্তুকির যৌক্তিকীকরণ এবং রাজস্ব আহরণ সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের পথে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নমনীয় শর্তে বৈদেশিক অর্থায়নের সুযোগ সংকুচিত হতে থাকবে এবং অর্থায়নের পরিবেশ ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠবে। ক্রমবর্ধমান সুদ ব্যয়, বিনিময় হারের চাপ এবং ঋণ পরিশোধের ক্রমবর্ধমান চাহিদা সরকারি ঋণ পোর্টফোলিওর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যমেয়াদি ঋণ কৌশল (এমটিডিএস) অভ্যন্তরীণ বন্ড বাজারের উন্নয়ন, অর্থায়ন উপকরণে বৈচিত্র্য আনা এবং সরকারি ঋণে বৈদেশিক মুদ্রার অতিরিক্ত এক্সপোজার কমানোকে অগ্রাধিকার দেবে। বিনিময় হারের অস্থিরতা, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলো সংশ্লিষ্ট প্রচ্ছন্ন দায় এবং এক্সটার্নাল শক থেকে উদ্ভূত ঝুঁকি নিরন্তর পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখা জরুরি। রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টির উপর কার্যকর তদারকি, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক সক্ষমতা উন্নয়ন এবং রাজস্ব ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাঠামো শক্তিশালী করা নীতিগত অগ্রাধিকারের তালিকায় গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রয়েছে। ক্রমবর্ধমান অনিশ্চিত বৈশ্বিক পরিবেশে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ধরে রাখতে এবং রাজস্ব খাতের স্থায়িত্বশীলতা রক্ষা করতে অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সমন্বয় বজায় রাখা অপরিহার্য।

৫

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি

(২০২৬-২৭ হতে ২০২৮-২৯)

আর্থিক ঝুঁকি বিবৃতি

অধ্যায় ৫

আর্থিক ঝুঁকি বিবৃতি

সংক্ষিপ্তসার-

- *এই অধ্যায়ে মূলত তিনটি উৎস থেকে উদ্ভূত অভিঘাতের (Shocks) প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়েছে: বৈশ্বিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের (SOEs) ব্যবসায়িক কার্যক্রম এবং প্রাকৃতির দুর্যোগ। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট পণ্যের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী অভিঘাত দেশের মূল্যস্ফীতি এবং আমদানি ব্যয়ের ক্ষেত্রে একটি বড় ধরণের ঝুঁকি তৈরি করেছে; যেখানে ২০২৬ সালের শুরুতে ব্রেন্ট ক্রুডের মূল্য ব্যারেল প্রতি সর্বোচ্চ ১২৬ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।*
- *মূল প্রক্ষেপণের চেয়ে ওয়ান স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন (১.৮ শতাংশ) বেশি মূল্যস্ফীতির অভিঘাত ঋণ ও জিডিপির অনুপাত এবং সরকারি ব্যয় উভয়কেই বাড়িয়ে দেয়; পাশাপাশি মূল প্রক্ষেপণ থেকে ১৬ শতাংশ পর্যন্ত রাজস্ব ঘাটতির ঝুঁকি এই মডেলে নিরূপণ করা হয়েছে।*
- *১২২টি রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা থেকে উদ্ভূত সম্ভাব্য দায় (Contingent Liabilities) মধ্যমেয়াদে মাঝারি থেকে উচ্চ মাত্রার আর্থিক ঝুঁকি নির্দেশ করছে, যেখানে অর্থবছর ২০২৩-২৪-এ এদের মোট ঋণ ও দায়ের পরিমাণ ছিল জিডিপির আনুমানিক ১৬.৬৪ শতাংশ।*
- *ঐতিহাসিকভাবে গড় মাত্রার একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ (বন্যা), যা জিডিপির ৩.৮৮ শতাংশ ভৌত ক্ষতিসাধন করে, যা প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি হ্রাস করে, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করে এবং বাজেট ঘাটতিকে আরও বৃদ্ধি করে।*
- *প্রধান নীতিগত অগ্রাধিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোকে শক্তিশালী করা এবং ২০৩৪ সালের মধ্যে এক ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি অর্জনের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যকে ত্বরান্বিত করা; যার মধ্যে বিনিয়ন্ত্রণকরণ (Deregulation), কাঠামোগত সংস্কার, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে সুশাসন উন্নয়ন, রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি এবং জলবায়ু অভিঘাত সহনশীলতা বৃদ্ধি অন্যতম কিন্তু শুধুমাত্র এই নীতিগুলোর মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়।*

৫.১ ভূমিকা

অধ্যায়টি সরকারের সামষ্টিক আর্থিক পূর্বাভাসের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে এমন সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তাগুলোর ওপর গভীর আলোকপাত করে।

সার্বভৌম আর্থিক ঝুঁকিগুলো মূলত বিভিন্ন ধরণের বাহ্যিক অভিঘাত, সম্ভাব্য বা আকস্মিক দায় এবং সুনির্দিষ্ট চরম-ঝুঁকিপূর্ণ ঘটনা থেকে উদ্ভূত হয়। এই ঝুঁকির ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে—জিডিপি প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি, বিনিময় হার এবং সুদের হারকে প্রভাবিতকারী সামষ্টিক অর্থনৈতিক অভিঘাত; রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান (SOEs) ও সার্বভৌম গ্যারান্টি থেকে সৃষ্ট আকস্মিক ও পুঞ্জীভূত দায়; এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ভূ-রাজনৈতিক ঘটনা থেকে উদ্ভূত সুনির্দিষ্ট কিছু ঝুঁকি। আর্থিক ঝুঁকিগুলো স্বভাবজাতভাবেই অনিশ্চিত এবং এগুলো আকস্মিকভাবে আবির্ভূত হতে পারে, যা প্রায়শই সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও বাজেটের ওপর মারাত্মক বিরূপ প্রভাব ফেলে। অনেক ক্ষেত্রে এই অভিঘাতগুলো একে অপরের সাথে সম্পর্কিত এবং সামগ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক চাপকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। এই ক্রমবর্ধমান ঝুঁকিগুলোর পাশাপাশি আর্থিক ঝুঁকি বিবরণীর (Fiscal Risk Statement) এই সংস্করণে ইরান-ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার সংঘাতের কারণে উদ্ভূত ভূ-কৌশলগত প্রভাবগুলোর একটি মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে বৈশ্বিক জ্বালানি ও আমদানি

পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে প্রভাব বিস্তারের প্রক্রিয়াটিও রয়েছে। এছাড়া এই অধ্যায়ে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারের মাধ্যমে এর প্রভাবিত করার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচিত প্রধান ঝুঁকিগুলোর মূল্যায়ন সারণি ৫.১-এ সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ৫.১ আর্থিক ঝুঁকি কাঠামো

ঝুঁকির ধরন	ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি
সামষ্টিক অর্থনৈতিক ঝুঁকি	অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি, মুদ্রা বিনিময় হার, সুদের হার, সরকারি ব্যয়, বাজেট ঘাটতি, সরকারি ঋণ এবং রপ্তানি
প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি	পূর্বাভাস পক্ষপাত, অনুমান-জনিত ভুল ও তথ্যের অপ্রতুলতা
প্রচ্ছন্ন ও সঞ্চিত দায়	রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান (এসওই) সম্পর্কিত ঝুঁকি, সার্বভৌম গ্যারান্টি ও পিপিপি চুক্তি উদ্ভূত ঝুঁকি
জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি	দীর্ঘমেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ও মধ্যমেয়াদে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি (যেমন-বন্যা)

উৎস: অর্থ বিভাগ

৫.২ মূল প্রক্ষেপণ (Baseline Projection)[8]

৫.২.১ মূল সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রক্ষেপণ

মূল প্রক্ষেপণের (Baseline Projections) জন্য তিন ধরণের ইনপুট বা তথ্য বিবেচনা করা হয়েছে: সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলকগুলোর ঐতিহাসিক মূল্যায়ন, চলতি বছরের অর্থনৈতিক গতি-প্রকৃতি এবং সরকারি পরিকল্পনা। এর ওপর ভিত্তি করে, পরবর্তী বছরগুলোতে বাজেটের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব বা ফলাফল পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন ঝুঁকি পরিস্থিতি অনুকরণ বা সিমুলেশন করা হয়েছে।

২০২৬-২৭ অর্থবছর থেকে ২০২৮-২৯ অর্থবছর পর্যন্ত মেয়াদের মূল সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রক্ষেপণ নিচে উপস্থাপন করা হলো। কাঠামোগত সংস্কার এবং উন্নত সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে প্রকৃত জিডিপি (Real GDP) প্রবৃদ্ধি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ৩.৫ শতাংশ থেকে পুনরুদ্ধার পেয়ে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৫.০ শতাংশে পৌঁছাবে এবং পরবর্তীতে তা আরও বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৬.৫ শতাংশ এবং অর্থবছর ২০২৭-২৮-এ ৭.০ শতাংশে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, বৈশ্বিক পরিস্থিতির উন্নতি ও অভ্যন্তরীণ পদক্ষেপের ফলে মূল্যস্ফীতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ৭.৫ শতাংশে নেমে আসবে এবং

[8] আইএমএফ (IMF) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত Macroeconomic Framework Foundations Tool (MFT)-কে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কাস্টমাইজ বা প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করে ব্যবহার করা হয়েছে।

অর্থবছর ২০২৮-২৯ নাগাদ তা আরও কমে ৬.৫ শতাংশে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে[৫]।

বক্স ৫.১: ম্যাক্রোইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্ক ফাউন্ডেশনস টুল (MFT)

আইএমএফ (IMF) কর্তৃক তাদের 'ফিন্যান্সিয়াল প্রোগ্রামিং অ্যান্ড পলিসি' (FPP) কাঠামোর একটি প্রায়োগিক সংস্করণ হিসেবে এমএফটি (MFT) টুলটি প্রস্তুত করা হয়েছিল। বাংলাদেশের অর্থ বিভাগ এটি গ্রহণ করেছে এবং বাংলাদেশের তথ্য পরিবেশ ও নীতি প্রেক্ষাপটের উপযোগী করে পরিমার্জন (Customise) করেছে।

ফ্রেমওয়ার্কটি অর্থনীতির চিরায়ত ৪-খাত ভিত্তিক কাঠামো — প্রকৃত, রাজস্ব, মুদ্রা এবং বহিঃখাত — উপর প্রণীত, যা সমস্ত সামষ্টিক অর্থনৈতিক সামগ্রিকতার (macroeconomic aggregates) মধ্যে অভ্যন্তরীণ ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করে। এটি একটি আধা-গতিশীল, এক্সেল-ভিত্তিক মডেল হিসেবে পরিচালিত হয়, যা হিসাব সমীকরণ (Accounting Identities) এর সাথে আচরণগত সমীকরণকে (Behavioural Equation) সমন্বয় করে কাজ করে। এর প্রধান প্রধান স্থিতিস্থাপকতা (Elasticities) এবং মডেলের সহগসমূহ (Coefficients) বাংলাদেশের ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ক্যালিব্রেট বা বিন্যাস করা হয়েছে। প্রকৃত উৎপাদন ও সম্ভাব্য উৎপাদনের মাঝে ব্যবধান (Output Gap) ক্রমান্বয়ে ন্যূনতমকরণের মাধ্যমে এই মডেলে ভারসাম্য অর্জিত হয়।

এই মডেলের কিছু সীমাবদ্ধতা হলো- আচরণগত সম্পর্ক এবং স্থিতিস্থাপকতাগুলো অপরিবর্তনশীল ও রৈখিক (Fixed And Linear); তীব্র সংকটের সময়ে কাঠামোগত বা প্রান্তিক প্রভাবগুলো (Threshold Effects) এই মডেল হয়তো পুরোপুরি ধারণ করতে পারে না। এতে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয় পরিকল্পনাগুলোকে ইনপুট হিসেবে বিবেচনা করা হয়, কোনো অন্তর্জাত ফলাফল (Endogenous Outcomes) হিসেবে নয়। একটি চাহিদা-ভিত্তিক (Demand Side) ফিন্যান্সিয়াল প্রোগ্রামিং টুল হওয়ায় এটি যোগান-সংশ্লিষ্ট (Supply Side) প্রতিবন্ধকতা, খাতভিত্তিক উৎপাদনশীলতা কিংবা কাঠামোগত রূপান্তরকে স্পষ্টভাবে মডেল করতে পারে না।

এছাড়া, এখানে ঝুঁকির পরিস্থিতিগুলো আলাদা আলাদাভাবে মূল্যায়ন করা হয়। বাস্তব সংকটের সময়ে সচরাচর দেখা যায় এমন যৌগিক বা যুগপৎ অভিঘাতগুলোর (Compound or Simultaneous Shocks) মডেলিং এখানে করা হয় না, অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে এসবের সম্মিলিত আর্থিক প্রভাব একক পরিস্থিতিগুলোর সমষ্টির চেয়েও বেশি হতে পারে। সর্বোপরি, এই প্রক্ষেপণের নির্ভরযোগ্যতা অন্তর্নিহিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক উপাত্তের মান ও সময়োপযোগিতার ওপর নির্ভরশীল; জাতীয় হিসাব বা রাজস্ব পরিসংখ্যানের কোনো সংশোধন এর ক্যালিব্রেশন ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে।

সারণি ৫.১ মূল সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রক্ষেপণ

সূচকসমূহ	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রাক্কলন	প্রক্ষেপণ	প্রক্ষেপণ
অর্থবছর	**২০২৩-২৪**	**২০২৪-২৫**	**২০২৫-২৬**	**২০২৬-২৭**	**২০২৭-২৮**	**২০২৮-২৯**
অভিহিত জিডিপি (বিলিয়ন টাকা)	৫০,০২৭	৫৫,১৫০	৬০,৮০৩	৬৮,৩০০	৭৬,৯২৫	৮৬,৮৬৩
অভিহিত প্রবৃদ্ধি	১১.৪	১০.২	১০.৩	১২.৩	১২.৬	১২.৯
অভিহিত জিডিপি (বিলিয়ন ইউএসডি)	৪২৪.২	৪৫৭.৯	৪৯৭.১	৫৩৮	৫৮৩	৬৩৯
প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	**৪.২**	**৪.২**	**৩.৫**	**৫.০**	**৬.৫**	**৭.০**
জিডিপি ডিফ্লেটর (%)	৬.৯	৬.৫	৫.০	৫.৫	৫.৩	৫.০
মূল্যস্ফীতি (%)	৯.৭	১০.০	৭.০	৭.৫	৬.৫	৬.০

মন্তব্য: অধ্যায় ২, পরিচ্ছেদ ২.৮, বক্স ২.১-ও দেখুন।

[৫] এখানে প্রক্ষেপণের জন্য ব্যবহৃত উপাত্ত বা তথ্যাবলি ২০২৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সময়কালকে অন্তর্ভুক্ত করে।

মোট রাজস্ব (অনুদান ব্যতীত) (বিলিয়ন টাকা)	৪০৮৬	৪৩৬০	৫৮৮০	৬৯৫০	৭৯৯০	৯২৪৫
মোট ব্যয় (বিলিয়ন টাকা)	৬,১০৩	৬,৩১৩	৭,৮৮০	৯,৩৮০	১০,৭০০	১২,৫০০
বাজেট ঘাটতি (বিলিয়ন টাকা)	(১,৯৫৪)	(১,৯০৪)	(১,৯৫০)	(২,৩৮০)	(২,৬৬০)	(৩,২০০)
প্রাথমিক ভারসাম্য (বিলিয়ন টাকা)	(৮০৬)	(৫৪৩)	(৬৮০)	(১,১০৫)	(১,২৩৯)	(১,৫৭৩)
ঋণ (বিলিয়ন টাকা)	১৮,৮৮৮	২১,৪৪০	২৩,২২৩	২৬,৩৩১	২৯,৫৬৭	৩৩,৭৭৬

উৎস: এমএফটি'র (MFT) মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত প্রক্ষেপণ

৫.৩ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ঝুঁকি মূল্যায়ন

সামষ্টিক অর্থনৈতিক ঝুঁকি অর্থনীতির চারটি প্রধান প্রধান খাতকে অন্তর্ভুক্ত করে: প্রকৃত (Real), রাজস্ব (Fiscal), মুদ্রা (Monetary) এবং বহিঃ (External) খাত। বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ঝুঁকি বিশ্লেষণের জন্য মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার, সুদের হার, তেলের দাম এবং রাজস্ব আদায়ের মতো প্রধান চলকসমূহ (Variables) বিবেচনা করা হয়েছে। এই প্রধান চলকগুলোর সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলো মূল্যায়ন করার জন্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ (Scenario Analysis) করা হয়েছে।

উপরে উল্লিখিত ভিত্তি প্রক্ষেপণের বিপরীতে মধ্যমেয়াদের জন্য তিনটি ঝুঁকি পরিস্থিতি চিহ্নিত ও পরিমাপ করা হয়েছে। প্রথমত, ইরান-ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার চলমান সংঘাত বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট তেলের দামের একটি আকস্মিক অভিঘাত (Oil Price Shock), যা ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের (Brent Crude) মূল্যকে বিগত চার বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গেছে এবং যা বাংলাদেশের আমদানি ব্যয়, মূল্যস্ফীতি ও জ্বালানি ভর্তুকি ব্যয়ের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলার ঝুঁকি তৈরি করেছে। দ্বিতীয়ত, মূল্যস্ফীতির একটি আকস্মিক অভিঘাত (Inflation Shock)—যা মূল লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে এক আদর্শ বিচ্যুতি (One Standard Deviation) বাড়িয়ে মডেলিং করা হয়েছে—এটি পারিবারিক প্রকৃত আয়, প্রকৃত সরকারি ব্যয় এবং সামগ্রিক আর্থিক ভারসাম্যের (Fiscal Balance) ওপর চাপ সৃষ্টি করে। তৃতীয়ত, প্রত্যাশার চেয়ে কম রাজস্ব আদায়ের একটি পরিস্থিতি, যা বাংলাদেশের রাজস্ব আদায়ের ধারাবাহিক দুর্বলতার প্রতিফলন। বিগত পাঁচটি অর্থবছরে প্রকৃত রাজস্ব আদায় বাজেট প্রাক্কলনের চেয়ে গড়ে ১৬ শতাংশ কম হয়েছে এবং সাম্প্রতিক প্রবণতা নির্দেশ করছে যে এই ব্যবধান হয়তো আরও বাড়তে পারে। প্রতিটি সম্ভাব্য অভিঘাত পরিস্থিতি এমএফটি-র মাধ্যমে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে অভিঘাত শুরু করে ২০২৮-২৯ অর্থবছর পর্যন্ত এর মধ্যমেয়াদি রাজস্ব ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিণতি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এই তিনটি পরিস্থিতি যৌথভাবে বাংলাদেশের আগামী দিনগুলোর আর্থিক আউটলুকের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ও বস্তুনিষ্ঠ নিম্নমুখী ঝুঁকিগুলোকে (Downside Risks) নির্দেশ করে।

৫.৩.১ তেলের মূল্য বৃদ্ধিজনিত অভিঘাত

সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে ঝুঁকি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম প্রধান নতুন ঝুঁকি হলো মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক সংঘাত। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির শেষভাগে শুরু হওয়া ধারাবাহিক সামরিক উস্কানি ও সংঘাতের জের ধরে হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল (Strait of Hormuz) বন্ধ হয়ে যায়, যা বৈশ্বিক জ্বালানি তেল সরবরাহে একটি অভূতপূর্ব বিপর্যয় ডেকে এনেছে।

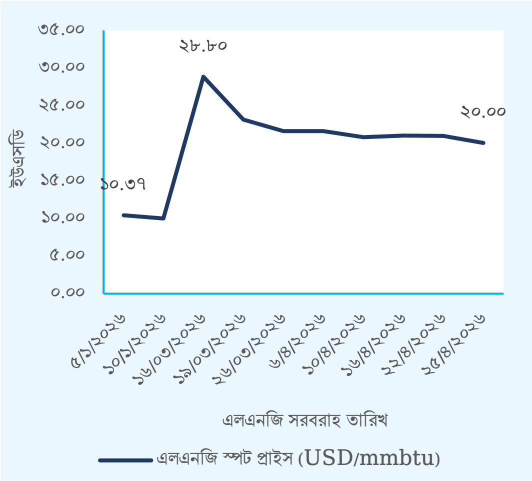

চিত্র ৫.১ জ্বালানি মূল্য বৃদ্ধি (এলএনজি)

সূত্র: ইমআরডি

ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের মূল্য ভিত্তিরেখা (Baseline) থেকে ৫৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে বিগত চার বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়—প্রতি ব্যারেল ১২৬ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। বিশ্বব্যাংক পূর্বাভাস দিয়েছে যে, ২০২৬ সালে জ্বালানির দাম গড়ে ২৪ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে; যেখানে ২০২৫ সালের গড় মূল্য ব্যারেল প্রতি ৬৯ মার্কিন ডলারের তুলনায় ২০২৬ সালে ব্রেন্ট ক্রুডের গড় মূল্য দাঁড়াতে পারে ব্যারেল প্রতি ৮৬ মার্কিন ডলারে। ডিজেলের দাম ৭৫.৭৯ ডলার/ব্যারেল থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৩১.৩৯ ডলারে/ব্যারেল-এ পৌঁছে।

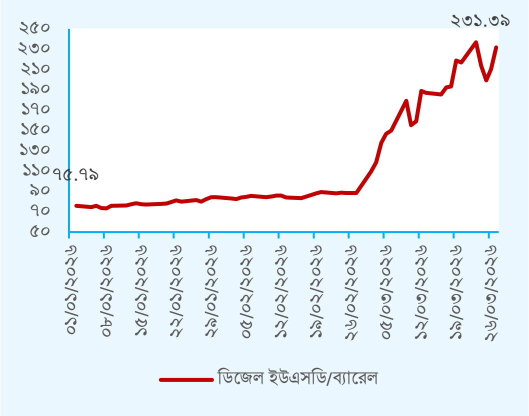

চিত্র ৫.২ জ্বালানি তেলের মূল্য বৃধি (ডিজেল)

সূত্র: ইমআরডি

তেলের দামের এই আকস্মিক অভিঘাত (Oil Price Shock) তিনটি প্রধান চ্যানেলের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সঞ্চারিত হয়:

১. **মূল্যস্ফীতি:** বৈশ্বিক বাজারে তেলের মূল্যবৃদ্ধি সরাসরি জ্বালানি খরচ বাড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে ভোক্তা মূল্য সূচক (CPI)-কে উর্ধ্বমুখী করে; এবং পরোক্ষভাবে সব খাতের পরিবহন ও উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি ঘটায়।

২. **উৎপাদন:** উপকরণের উচ্চমূল্য শিল্প ও কৃষি উৎপাদনকে বাধাগ্রস্ত বা সংকুচিত করে, যা বাস্তব জিডিপি প্রবৃদ্ধিকে মূল প্রক্ষেপণরেখার নিচে নামিয়ে আনে।

৩. **লেনদেন ভারসাম্য বা বিওপি:** পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের জন্য বাংলাদেশের আমদানি ব্যয় তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়, যা বাণিজ্য ঘাটতিকে আরও প্রসারিত করে, চলতি হিসাবের ভারসাম্যের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওপর অবমূল্যায়নের চাপ তৈরি করে।

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রক্ষেপণের ওপর বিশ্ব বাজারে জ্বালানি অস্থিরতার ঝুঁকি মূল্যায়নের লক্ষ্যে একটি পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়েছে; যেখানে ২০২৬-২৭- অর্থবছরে অতিরিক্ত ৩০ শতাংশ বৃদ্ধির অনুমান ধরা হয়েছে। এই সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোর পর, ২০২৭-২৮ অর্থবছরে মূল্য ২০ শতাংশ হ্রাস পাবে এবং পরবর্তীতে স্থিতিশীল থাকবে বলে অনুমান করা হয়েছে। এর ফলে মূল্যস্ফীতি, খাতভিত্তিক উৎপাদন, লেনদেন ভারসাম্য এবং সামগ্রিক জিডিপি প্রবৃদ্ধিসহ প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক সূচকগুলোর ওপর যে প্রভাব পড়বে—তা পরবর্তী অংশগুলোতে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হলো।

৫.৩.১.১ মূল্যস্ফীতির উপর প্রভাব

২০২৬-২৭ অর্থবছরে বিদ্যমান মূল্যের চেয়ে জ্বালানি তেলের দাম ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে তা বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি হ্রাসের চলমান ধারাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করবে এবং মূল্যস্ফীতির হারকে ৭.৫ শতাংশের ভিত্তিরেখা (Baseline) থেকে ৯.১ শতাংশে উন্নীত করবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ১.৬ শতাংশ পয়েন্টের এই উল্লম্ফন পরিবহন ও উৎপাদন খাতে ওপর তাৎক্ষণিক 'ব্যয়-বৃদ্ধিজনিত চাপ' (Cost-Push Pressure)-কে প্রতিফলিত করে। যদিও পরবর্তী বছরগুলোতে এই অভিঘাতের প্রভাব ক্রমান্বয়ে কমতে শুরু করবে, তবুও মূল্যস্ফীতি মূল প্রক্ষেপণের চেয়ে বেশিই থাকবে; যা ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ৭.৯ শতাংশ (মূল প্রক্ষেপণ ৬.৫ শতাংশের বিপরীতে) এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছরে ৬.২ শতাংশ (মূল প্রক্ষেপণ ৬.০ শতাংশের বিপরীতে) প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। পরিশেষে, তেলের দামের এই আকস্মিক অভিঘাত একটি নিম্ন-মূল্যস্ফীতির প্রবণতাকে বিলম্বিত করে এবং প্রক্ষেপণ মেয়াদে উচ্চ মূল্যস্ফীতি বজায় রাখে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মূল প্রক্ষেপণগুলো মধ্যপ্রাচ্য সংকট শুরু হওয়ার পূর্বেই প্রণয়ন করা হয়েছিল। যার ফলে এই ক্রমবর্ধমান বাহ্যিক অভিঘাতগুলোর প্রভাব অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অর্থ বিভাগের সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ কর্তৃক সামষ্টিক অর্থনৈতিক পূর্বাভাসের একটি পুনঃমূল্যায়ন আবশ্যক হয়ে পড়ে। এই হালনাগাদকৃত প্রক্ষেপণে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য মূল্যস্ফীতি ৮.৯ শতাংশ পুনরায় প্রাক্কলন করা হয়েছে, যেখানে বাজেটে এই লক্ষ্যমাত্রা ৭.০ শতাংশ ধরা হয়েছিল।

প্রণিধানযোগ্য যে, বৈশ্বিক বাজারে তেলের মূল্যবৃদ্ধি তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মূল্যস্ফীতিতে সঞ্চারিত হয় না; কারণ অভ্যন্তরীণ মূল্য সমন্বয় একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মতান্ত্রিক কাঠামোর মাধ্যমে ধীরে সমন্বয় করা হয়। তদুপরি, মূল্যস্ফীতির এই চাপ কেবল তেলের দামের ওঠানামার কারণেই ঘটে না। তেলের মূল্যবৃদ্ধি বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের অবমূল্যায়নে ভূমিকা রাখে, যা পরবর্তীতে আমদানি ব্যয় চ্যানেলের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ মূল্যের ওপর অতিরিক্ত ঊর্ধ্বমুখী চাপ সৃষ্টি করে। অলিগোপলিস্টিক বা ব্যবসায়ীক সিন্ডিকেটের রেন্ট-সিকিং বা অতিরিক্ত মুনাফা করার প্রবণতা থেকে উদ্ভূত সরবরাহে বাধা এবং বাজার ব্যবস্থার ব্যর্থতা মূল্যস্ফীতির এই গতিশীলতাকে আরও জটিল করে তোলে। এটি স্থিতিশীল মূল্যস্ফীতির বৃহত্তর চিত্রের প্রতিফলন, যেখানে প্রতিকূল অর্থনৈতিক অভিঘাতের প্রতিক্রিয়ায় মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পায়, কিন্তু অন্তর্নিহিত পরিস্থিতি স্থিতিশীল হওয়ার পরেও তা সহজে কমতে চায় না বরং দীর্ঘসময় ধরে বিরাজ করতে থাকে। ফলস্বরূপ, প্রাথমিক অভিঘাত বা শকের প্রভাব কেটে যাওয়ার পরও বাংলাদেশে দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজ করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, যা দেশের আর্থিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে স্থায়ী ঝুঁকি তৈরি করে।

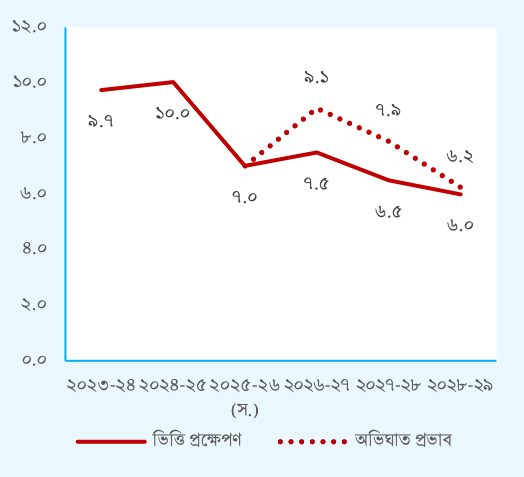

চিত্র ৫.৩ মূল্যস্ফীতির উপর সম্ভাব্য প্রভাব

৫.৩.১.২ উৎপাদনের উপর প্রভাব

২০২৬-২৭ অর্থবছরে প্রক্ষেপিত জ্বালানি তেলের দামের আকস্মিক অভিঘাত, ভিত্তিরেখা গতিপথের তুলনায় বাংলাদেশের শিল্প ও কৃষি উভয় খাতের প্রবৃদ্ধির হারকে উল্লেখযোগ্যভাবে মন্থর করবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধির হার ২০২৬-২৭ অর্থবছরে মূল প্রক্ষেপণ ৭.০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়ে ৪.৫ শতাংশে নেমে আসতে পারে এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছর পর্যন্ত এই বড় ব্যবধান বজায় থাকবে যেখানে প্রবৃদ্ধি ৮.০ শতাংশের ভিত্তিরেখার বিপরীতে ৬.২ শতাংশে পৌঁছাবে। একইভাবে, কৃষি খাতও প্রবৃদ্ধির সংকোচনের মুখোমুখি হবে, যা ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৪.৫ শতাংশের মূল প্রক্ষেপণ থেকে কমে ৩.০ শতাংশে দাঁড়াবে এবং ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ৪.৫ শতাংশ মূল প্রক্ষেপণের তুলনায় ৩.৫ শতাংশে স্থবির থাকবে। জ্বালানি তেলের মূল্যের অস্থিরতার প্রেক্ষিতে উৎপাদন-নিবিড় খাতগুলোর সংবেদনশীলতা বা নাজুকতা স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যাচ্ছে। পরিচালন ও উপকরণের ব্যয় বৃদ্ধি প্রক্ষেপণ মেয়াদ জুড়ে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের গতি ক্রমাগতভাবে বাধাগ্রস্ত বা সংকুচিত করে।

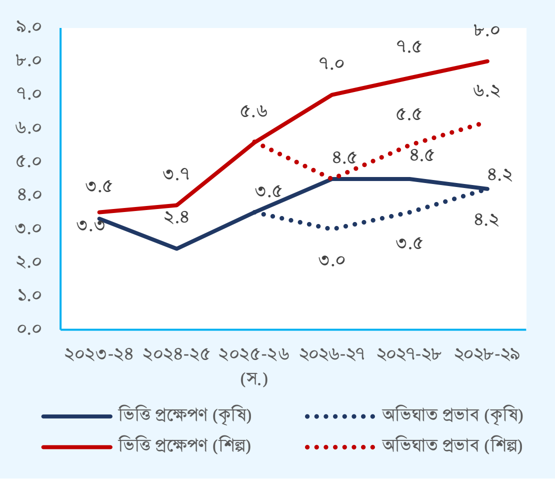

চিত্র ৫.৪ উৎপাদনের উপর সম্ভাব্য প্রভাব

৫.৩.১.৩ লেনদেন ভারসাম্যের (BoP) ওপর প্রভাব

২০২৬-২৭ অর্থবছরে জ্বালানি তেলের অভিঘাত বাংলাদেশের বহিঃখাতের সূচকগুলোতে উল্লেখযোগ্য ও দীর্ঘস্থায়ী অবনমন ঘটায়। বাণিজ্য ঘাটতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরে জিডিপির -৬.৯ শতাংশের মূল প্রক্ষপণ (Baseline) থেকে আরও বেড়ে হয়ে -৭.৬ শতাংশে পৌঁছাতে পারে এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছর নাগাদ তা -৭.৯ শতাংশে গিয়ে দাঁড়াবে, যেখানে এর মূল প্রক্ষেপণ ছিল -৬.৮ শতাংশ। এই চাপ চলতি হিসাবের ভারসাম্যের (CAB) ওপরও প্রভাব বিস্তার করে, যা ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ঘাটতি বেড়ে -১.২ শতাংশে অবনমিত হয়—যা মূল প্রক্ষেপিত ঘাটতির প্রায় দ্বিগুণ—এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছর নাগাদও তা মূল প্রক্ষপণের স্তরে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়। ফলস্বরূপ, এই বর্ধিত আমদানি ব্যয় দেশের মোট আন্তর্জাতিক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে (Gross International Reserves) উল্লেখযোগ্যভাবে সংকুচিত করে; যার ফলে ২০২৮-২৯ অর্থবছর নাগাদ রিজার্ভের প্রক্ষেপিত পরিমাণ দাঁড়ায় ৫২.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে, যা ৬২.৬ বিলিয়নের মূল প্রক্ষেপণ থেকে ৯.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি বড় ঘাটতি নির্দেশ করে।

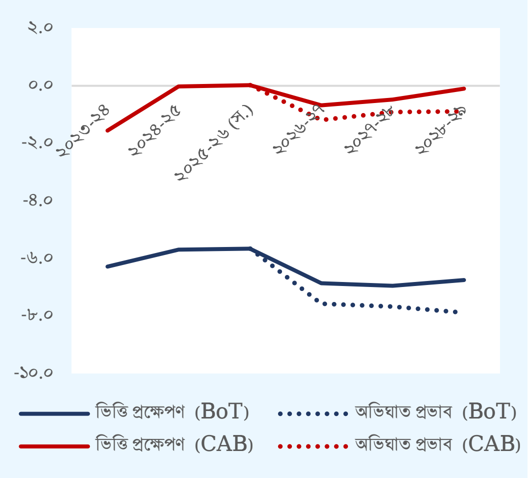

চিত্র ৫.৫ লেনদেন ভারসাম্যের (BoP) ওপর প্রভাব

২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির ফলে এই খাতটির জন্য বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় অনেক বেড়ে গেছে। এর ফলে, স্বাভাবিকভাবেই বাজেটে বরাদ্দকৃত পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় ভর্তুকির প্রয়োজন হয়েছে, যা সরকারের ওপর অতিরিক্ত এবং অনভিপ্রেত আর্থিক চাপ সৃষ্টি করেছে।

৫.৩.১.৪ জিডিপি প্রবৃদ্ধির উপর প্রভাব

২০২৬-২৭ অর্থবছরে জ্বালানি তেলের অভিঘাতটি উৎপাদন ও পরিবহন খরচ বাড়িয়ে দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার ওপর একটি বড় ধরণের নেতিবাচক প্রভাব বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে (চিত্র ৫.৬)। এই অভিঘাতের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ২০২৬-২৭ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার মূল প্রক্ষেপণ ৬.৫ শতাংশ থেকে কমে ৪.৫ শতাংশে নেমে আসতে পারে। যদিও পরবর্তী বছরগুলোতে অর্থনীতি কিছুটা গতি ফিরে পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে, তবুও এটি মূল প্রবৃদ্ধির ধারার সাথে বিদ্যমান ব্যবধান ঘোচাতে ব্যর্থ হবে; যেখানে ২০২৭-২৮ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ৫.৫ শতাংশ এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছরে ৬.৫ শতাংশে পৌঁছাবে, যা ধারাবাহিকভাবে যথাক্রমে ৭.০ শতাংশ এবং ৭.৫ শতাংশের মূল প্রক্ষেপণ থেকে কম। এই মধ্যমেয়াদি ব্যবধানটি নির্দেশ করে যে, জ্বালানি তেলের মূল্যের এই ধরণের একটি আকস্মিক অভিঘাত অর্থনীতিতে একটি স্থায়ী 'প্রবৃদ্ধি ঘাটতি' পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে, যা মধ্যমেয়াদে অর্থনীতিকে তার পূর্ণ উৎপাদন সক্ষমতা অর্জনে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর আশঙ্কা বিদ্যমান।

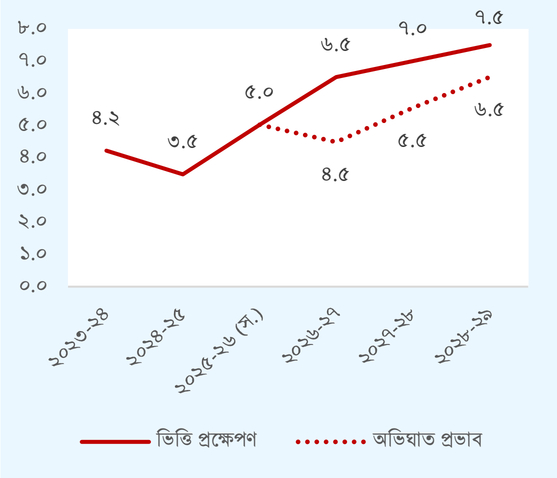

চিত্র ৫.৬ জিডিপি প্রবৃদ্ধির উপর প্রভাব

২০২৬-২৭ অর্থবছরে তেলের মূল্যের আকস্মিক অভিঘাত বাংলাদেশের মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় একটি গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো অর্থনীতি একটি 'উচ্চ-মূল্যস্ফীতি ও নিম্ন-প্রবৃদ্ধি'-র ভারসাম্যের (High-Inflation, Low-Growth Equilibrium) দিকে ধাবিত হয়। এই অভিঘাতের ফলে তাৎক্ষণিকভাবে মূল্যস্ফীতি ৯.১ শতাংশে উন্নীত হয় এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধি তীব্রভাবে সংকুচিত হয়ে ৪.৫ শতাংশে নেমে আসে; যা মূলত শিল্প ও কৃষি খাতের উৎপাদনশীলতা হ্রাসের কারণে ঘটে থাকে। অভ্যন্তরীণ এই অস্থিরতা দেশের ক্রমাগত অবক্ষয়মুখী লেনদেন ভারসাম্যের কারণে আরও জটিল রূপ ধারণ করে; অতিরিক্ত আমদানি ব্যয় বাণিজ্য ঘাটতি ও চলতি হিসাবের ঘাটতিকে আরও বৃদ্ধি করে, যার ফলে মূল প্রক্ষেপণের তুলনায় ২০২৮-২৯ অর্থবছর নাগাদ মোট আন্তর্জাতিক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে ৯.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি বড় ঘাটতি দেখা দেয়। পরিশেষে, এই আকস্মিক অভিঘাতটি কেবল একটি সাময়িক সংকট তৈরি করে না, বরং সমগ্র সামষ্টিক অর্থনৈতিক গতিপথকেই বদলে দেয়; যা প্রক্ষেপণ মেয়াদ জুড়ে অর্থনীতিতে একটি স্থায়ী মূল্যস্ফীতির চাপ, নিম্নতর উৎপাদন সক্ষমতা এবং একটি দুর্বল External Buffer রেখে যায়।

৫.৩.২ মূল্যস্ফীতির আকস্মিক অভিঘাত ঝুঁকি

মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ মেয়াদে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। মূল আর্থিক কাঠামোতে (Baseline Fiscal Framework) ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা ৭.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। মূল্যস্ফীতির চাপের আর্থিক সংবেদনশীলতা (fiscal sensitivity) মূল্যায়নের লক্ষ্যে, একটি 'এক আদর্শ বিচ্যুতি' ঊর্ধ্বমুখী অভিঘাত বা শক আরোপ করা হয়েছে, যা মূল্যস্ফীতির হারকে ৯.৩ শতাংশে উন্নীত করে। এই পরিস্থিতিটি মূলত 'চাহিদা-বৃদ্ধিজনিত' (Demand-Pull) অথবা 'ব্যয়-

বৃদ্ধিজনিত' (Cost-Push) চাপের ঝুঁকিকে প্রতিফলিত করে—যার মধ্যে আমদানি পণ্যের মূল্যের অস্থিরতা, জ্বালানি মূল্যের পরোক্ষ প্রভাব কিংবা সরবরাহ-ব্যবস্থার বিঘ্ন অন্তর্ভুক্ত—যা মূল্যস্ফীতিকে তার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বিচ্যুত করতে পারে। মূল্যস্ফীতির এই আকস্মিক অভিঘাতের সঞ্চালন মাধ্যমসমূহ রাজস্ব, ব্যক্তিগত ভোগ, আর্থিক ভারসাম্য (Fiscal Balance), সরকারি ঋণ এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধির নিরিখে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

৫.৩.২.১ রাজস্ব আয়ের উপর প্রভাব

সরকারি রাজস্ব আয়ের ওপর মূল্যস্ফীতির একটি আকস্মিক অভিঘাতের দ্বিমুখী এবং আংশিক প্রতিসাম্যমূলক প্রভাব রয়েছে। স্বল্পমেয়াদে, উচ্চ মূল্যস্তর করের ভিত্তিকে (Tax Bases) অভিহিত অর্থে (Nominally) বর্ধিত করে—বিশেষ করে মূল্য সংযোজন কর (VAT) আদায়, যা ভোগের মূল্যস্তরের প্রতি সংবেদনশীল, এবং আয়কর, যা অভিহিত মজুরি বৃদ্ধি (Nominal Wage Growth) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এই অভিঘাতের পরিস্থিতিটি (Shock Scenario) নির্দেশ করে যে, অভিহিত রাজস্ব আয় ভিত্তি প্রক্ষেপণ গতিপথের (Baseline Trajectory) কাছাকাছিই অবস্থান করে; যেখানে অর্থবছর ২০২৪-২৫-এর ৪,৪০৮ বিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০২৮-২৯ নাগাদ ভিত্তিরেখার অধীনে আনুমানিক ৯,১৫১ বিলিয়ন টাকা দাঁড়ায়, যার বিপরীতে অভিঘাতের পরিস্থিতিতে এটি দাঁড়ায় প্রায় ৯,৩০০ বিলিয়ন টাকা—যা অভিহিত রাজস্ব আয়ে একটি সামান্য ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি (Nominal Revenue Upside) প্রদর্শন করে। মূল্যস্ফীতির আকস্মিক অভিঘাতের (Inflation Shock) কারণে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে রাজস্ব আদায় ৭,০০০ বিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭,০৬৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। তবে, প্রকৃত অর্থে (in Real Terms) এই অভিহিত বৃদ্ধি কেবলই একটি মরীচিকা বা বিভ্রম (Illusory): উচ্চ মূল্যস্ফীতি আদায়কৃত রাজস্বের প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতাকে হ্রাস করে, প্রকৃত ব্যয় সক্ষমতাকে সংকুচিত করে এবং ঋণ সেবা ব্যয়ের (Cost of Debt Servicing) পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। তদুপরি, দীর্ঘমেয়াদে পারিবারিক আয়ের ওপর মূল্যস্ফীতিজনিত নেতিবাচক প্রভাব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মন্দাভাব তৈরি হতে পারে এবং প্রকৃত করের ভিত্তি হ্রাস করতে পারে, যার ফলে টেকসই রাজস্ব আহরণের ওপর একটি সামগ্রিক নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

৫.৩.২.২ ব্যক্তিগত ভোগের উপর প্রভাব

মূল্যস্ফীতির এই আকস্মিক অভিঘাতের ফলে অভিহিত (Nominal) এবং প্রকৃত (Real) ভোগের মধ্যে তীব্র বিপরীতমুখী অবস্থা তৈরি হয়। অভিঘাতের পরিস্থিতিতে অভিহিত বেসরকারি ভোগ প্রক্ষেপণ মেয়াদ জুড়ে ভিত্তি প্রক্ষেপণের (Baseline) ওপরে অবস্থান করে; কারণ উচ্চ মূল্যস্তর স্বাভাবিকভাবেই ভোক্তা ব্যয়ের অভিহিত মূল্যকে বাড়িয়ে দেয়। তবে, প্রকৃত বেসরকারি ভোগ—যা মূলত প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা এবং জীবনযাত্রার মানকে পরিমাপ করে—তা এই অভিঘাতের ফলে হ্রাস পায়।

অভিঘাতের পরিস্থিতিতে প্রকৃত ভোগের গতিপথ ২০২৬-২৭ অর্থবছর থেকেই ভিত্তিরেখার নিচে নেমে আসে; যা অর্থবছর ২০২৮-২৯ নাগাদ আনুমানিক ৩০,৫১২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যেখানে এর ভিত্তি প্রক্ষেপণ ছিল ৩১,৩৪১ বিলিয়ন টাকা। অভিহিত এবং প্রকৃত ভোগের মধ্যকার এই ব্যবধান মূল্যস্ফীতিজনিত জীবনযাত্রার ব্যয়ের (Welfare Cost) প্রকৃত চিত্রটিকে ফুটিয়ে তোলে: পরিবারগুলো অভিহিত (Nominal) অর্থে বা টাকার অঙ্কে বেশি ব্যয় করছে ঠিকই, কিন্তু প্রকৃত অর্থে কম ভোগ করছে; যা মানুষের উদ্বৃত্ত আয়ের (Disposable Incomes) হ্রাস এবং জীবনযাত্রার মানের অবনমনকে নির্দেশ করে, বিশেষ করে নিম্ন-আয়ের জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে যারা এই মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কা সামলাতে সবচেয়ে কম সক্ষম।

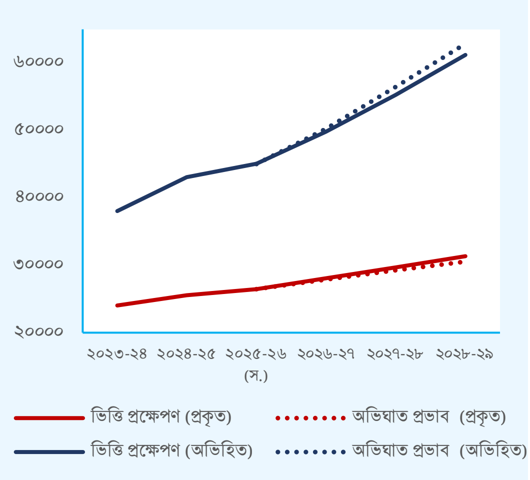

চিত্র ৫.৭ ব্যক্তিগত ভোগের উপর সম্ভাব্য প্রভাব

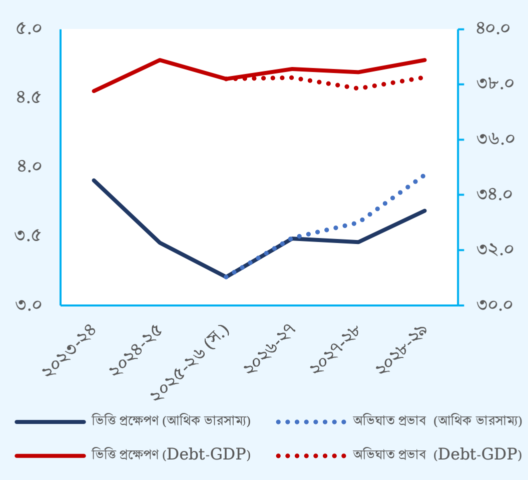

চিত্র ৫.৮ আর্থিক ভারসাম্য ও ঋণের উপর প্রভাব

৫.৩.২.৩ আর্থিক ভারসাম্য ও ঋণের উপর প্রভাব

মূল্যস্ফীতির এই অভিঘাতটি সরকারের আর্থিক বা রাজস্ব অবস্থার (Fiscal Position) ওপর একটি মিশ্র কিন্তু সামগ্রিকভাবে সহনীয় প্রভাব ফেলে। ইতিবাচক দিক হলো, যেহেতু অভিঘাতের পরিস্থিতিতে অভিহিত জিডিপি (Nominal GDP) অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়, তাই জিডিপির শতাংশ হিসেবে পরিমাপকৃত আর্থিক ঘাটতি মূল প্রক্ষেপণের থেকে কিছুটা কমে।

এই অভিঘাতের ফলে প্রকৃত অংকে আর্থিক ঘাটতি কিছুটা বৃদ্ধি পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে—যা ২০২৫-২৬ (সংশোধিত) অর্থবছরের জিডিপির ৩.২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০২৬-২৭ নাগাদ প্রায় ৩.৪৯ শতাংশ এবং অর্থবছর ২০২৮-২৯ নাগাদ আনুমানিক ৩.৯৫ শতাংশে দাঁড়াবে; যেখানে এর মূল প্রক্ষেপণ ছিল ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৩.৫ শতাংশ এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছরে ৩.৭ শতাংশ। যদিও অভিঘাতের পরিস্থিতিতে শেষদিকের বছরগুলোতে বাজেট ঘাটতি ও জিডিপির অনুপাত মূল প্রক্ষেপণের চেয়ে ওপরে থাকে, তবুও এটি নির্ধারিত সীমার (জিডিপি'র ৫ শতাংশের মধ্যে) মধ্যেই অবস্থান করে।

একইভাবে, অভিঘাতের পরিস্থিতিতে ঋণ-জিডিপির অনুপাত সার্বিকভাবে স্থিতিশীল থাকে, যা মূল প্রক্ষেপণের কাছাকাছি কিন্তু সামান্য নিচে অবস্থান করে; কারণ মূল্যস্ফীতিজনিত প্রভাবে অভিহিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অনুপাতের দিক থেকে ঋণের পরিমাণকে আংশিকভাবে কমিয়ে দেয়। মূল প্রক্ষেপণে ঋণ ও জিডিপির অনুপাত ২০২৫-২৬ (সংশোধিত) অর্থবছরে আনুমানিক ৩৮.২ শতাংশ প্রক্ষেপণ করা হয়েছে, যা ২০২৮-২৯ অর্থবছর নাগাদ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮.৯ শতাংশে দাঁড়াবে; অভিঘাতের পরিস্থিতিটিও সার্বিকভাবে এই ভিত্তি প্রক্ষেপণের গতিপথই অনুসরণ করে। তা সত্ত্বেও, সরকারকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে: যদি মূল্যস্ফীতির এই অভিঘাত দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং মুদ্রা সংকোচনের নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য করে- যার ফলে অভ্যন্তরীণ সুদের হার বৃদ্ধি পায়- তবে সামগ্রিক সরকারি ঋণের ওপর সুদের খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যেতে পারে, যা মূল অনুপাতগুলোর তুলনায় আর্থিক পরিস্থিতিকে আরও বেশি নাজুক করে তুলবে।

৫.৩.২.৪ জিডিপি প্রবৃদ্ধির ওপর প্রভাব

মূল্যস্ফীতির এই অভিঘাত অভিহিত এবং প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্যবধানের সৃষ্টি করে। এই অভিঘাতের পরিস্থিতিতে অভিহিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি মূল প্রক্ষেপণের চেয়ে বৃদ্ধি পায়;

যা ২০২৭-২৮ অর্থবছরে প্রায় ১৪.০৮ শতাংশ এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছরে ১৪.০৫ শতাংশে পৌঁছায়, যেখানে মূল প্রক্ষেপণে অভিহিত প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস ছিল যথাক্রমে ১২.৬ শতাংশ এবং ১২.৯ শতাংশ। তবে, এই অভিহিত প্রবৃদ্ধির দ্রুত বৃদ্ধি মূলত প্রকৃত অর্থনৈতিক কর্মক্ষমতার অবক্ষয়কে আড়াল করে।

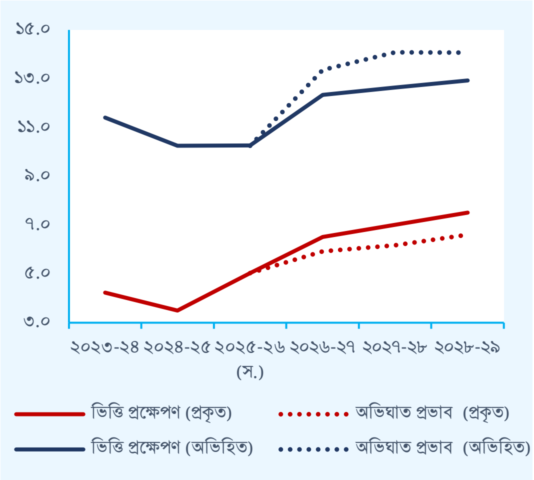

চিত্র ৫.৯ জিডিপি প্রবৃদ্ধির ওপর প্রভাব

অভিঘাতের পরিস্থিতিতে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি তার মূল প্রক্ষেপণের নিচে নেমে আসবে এমন প্রক্ষেপণ করা হয়েছে—যা ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৬.৫ শতাংশের প্রক্ষেপণের বিপরীতে হ্রাস পেয়ে আনুমানিক ৫.৯১ শতাংশে দাঁড়াতে পারে এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছর নাগাদ ৭.৫ শতাংশের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে দাঁড়াবে প্রায় ৬.৬০ শতাংশ। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মূল্যস্ফীতির আকস্মিক অভিঘাত পরিশেষে প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত বা মন্থর করে: এটি ব্যবসায়িক আত্মবিশ্বাসকে ক্ষুণ্ন করে, বিনিয়োগের প্রকৃত রিটার্ন হ্রাস করে, পারিবারিক ক্রয়ক্ষমতাকে সংকুচিত করে এবং বেসরকারি ও সরকারি উভয় খাতের অংশীজনদের জন্য নীতি-পরিকল্পনা প্রণয়নে অনিশ্চয়তা তৈরি করে। ফলে, লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চ মূল্যস্ফীতি বজায় থাকা মধ্যমেয়াদি প্রবৃদ্ধির গতিধারার জন্য প্রকট নিম্নমুখী ঝুঁকি তৈরি করে। মূল্যস্ফীতির একটি আকস্মিক অভিঘাত স্বল্পমেয়াদে অভিহিত রাজস্ব (Nominal Revenue) এবং আর্থিক বা রাজস্ব অনুপাতগুলোতে (Fiscal Ratio) আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা উন্নতি ঘটালেও, মধ্যমেয়াদে তা মারাত্মক কাঠামোগত সমস্যা তৈরি করতে পারে। প্রকৃত ভোগের (Real Consumption) সংকোচন, প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির শ্লথগতি এবং ঋণ সেবা ব্যয়ের (Debt Servicing Costs) সম্ভাব্য বৃদ্ধিই হলো এ ক্ষেত্রে প্রধান আর্থিক ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক দুর্বলতা। অতএব, সমন্বিত মুদ্রা ও রাজস্ব নীতির (Coordinated Monetary And Fiscal Policy) মাধ্যমে মূল্যস্ফীতিকে তার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে বজায় রাখার বিষয়ে সরকারের অঙ্গীকার মধ্যমেয়াদি আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং নাগরিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত অপরিহার্য।

৫.৩.৩ রাজস্ব ঘাটতিজনিত ঝুঁকি

অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ টেকসই রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ভিত্তি এবং অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ ছাড়াই উন্নয়ন ব্যয় অর্থায়নে সরকারের সক্ষমতার মূল উৎস। তবে, বাংলাদেশের রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকভাবেই বাজেট লক্ষ্যের তুলনায় ক্রমাগত ঘাটতি দেখা গেছে। তবে ঐতিহাসিকভাবে, সমকক্ষ দেশগুলোর তুলনায় এবং বাজেট লক্ষ্যমাত্রার সাপেক্ষে বাংলাদেশের রাজস্ব আদায় ক্রমাগতভাবে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম হচ্ছে, যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকা সম্পদের ঘাটতি পূরণে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের ওপর একটি কাঠামোগত নির্ভরতা তৈরি করেছে। রাজস্ব আদায়ের এই দীর্ঘমেয়াদি বা ক্রনিক দুর্বলতা গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোতে অর্থায়ন, মানবসম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ সম্প্রসারণ এবং বাহ্যিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক অভিঘাতগুলো মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সক্ষমতাকে সংকুচিত বা সীমিত করে ফেলে।

বিগত পাঁচটি অর্থবছরের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকৃত রাজস্ব আদায় বাজেট লক্ষ্যমাত্রা থেকে গড়ে ১৬ শতাংশ কম হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই ঘাটতির

ব্যবধান আরও বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৩.০৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৯.৪১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অর্থবছর ২০২৫-২৬-এ (মার্চ পর্যন্ত), মোট রাজস্ব আদায় হয়েছে ৩,৩১৫ বিলিয়ন টাকা, যা নির্ধারিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৫৬ শতাংশ। রাজস্ব আয়ের ঝুঁকি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণে প্রক্ষেপিত রাজস্ব থেকে অভিন্নভাবে ১৬ শতাংশ কম রাজস্বের অভিঘাত প্রয়োগ করা হয়েছে। এই রক্ষণশীল অভিঘাত সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাজস্ব বাস্তবায়নে যে কাঠামোগত ঘাটতির ঝুঁকি পরিলক্ষিত হয়েছে তা প্রতিফলিত করার জন্য পরিমাপযোগ্যভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

৫.৩.৩.১ সরকারি ব্যয়ের উপর প্রভাব

ধারাবাহিকভাবে রাজস্ব ঘাটতি থাকলে তা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্ব সমন্বয়কে অপরিহার্য করে তুলবে, যেখানে পরিচালন ও মূলধন উভয় ব্যয়ের উপরই এই চাপ পড়বে। অভিঘাত পরিস্থিতিতে পরিচালন ব্যয় মধ্যমেয়াদ জুড়ে ভিত্তি মাত্রার নিচে থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে, যদিও রাজস্ব ভিত্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে এই ব্যবধান ক্রমশ কমে যাবে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মূলধনী ব্যয়- যা সরকারি বিনিয়োগ এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের প্রধান চালিকাশক্তি—তা আরও বেশি কাটছাঁটের মুখে পড়বে কারণ পরিচালন ব্যয় কমানোর সুযোগ কম থাকে। অভিঘাত পরিস্থিতিতে ২০২৮-২৯ অর্থবছরের মধ্যে মূলধন ব্যয় মাত্র ৪,৬২৫ বিলিয়ন টাকায় প্রক্ষেপিত হয়েছে — যা শুধু ২০২৮-২৯ অর্থবছরেই প্রায় ৯৬০ বিলিয়ন টাকার ঘাটতি নির্দেশ করে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) এই সংকোচন অবকাঠামো উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ এবং সরকারের মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর বিরূপ প্রভাব তৈরি করবে।

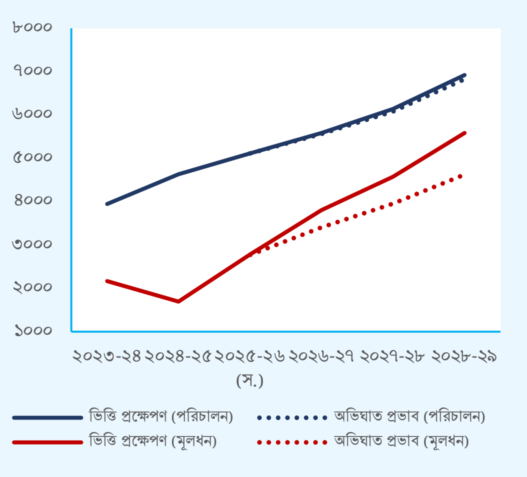

চিত্র ৫.১০ সরকারি ব্যয়ের উপর সম্ভাব্য প্রভাব

৫.৩.৩.২ আর্থিক ভারসাম্য ও ঋণের উপর প্রভাব

রাজস্বের ঘাটতির ফলে আর্থিক ভারসাম্যের উল্লেখযোগ্য অবনতি ঘটে এবং পুঞ্জিভূত সরকারি ঋণ বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। বাজেট লক্ষ্যমাত্রা থেকে ১৬ শতাংশ রাজস্ব ঘাটতির পরিস্থিতিতে, বাজেট ঘাটতি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং জিডিপি-র ৫ শতাংশের যে আর্থিক সীমা (Prudent Fiscal Threshold) রয়েছে, সেটা অতিক্রম করার কাছাকাছি পৌঁছায়—যা ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৪.৬৭ শতাংশ, ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ৪.৫৮ শতাংশ এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছরে ৪.৯১ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে। যদিও অভিঘাত পরিস্থিতির মধ্যমেয়াদী প্রক্ষেপণের অধীনে পরবর্তী বছরগুলোতে এটি আর্থিক ভারসাম্য সীমার সামান্য নিচে অবস্থান করছে, তবুও এর গতিপথ উদ্বেগজনক এবং এই আর্থিক ভারসাম্য সীমার এত কাছাকাছি অবস্থান করার ফলে ভবিষ্যতের অন্য কোনো বৈরী পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মতো পর্যাপ্ত বাফার বা সুরক্ষা অবশিষ্ট থাকে না।

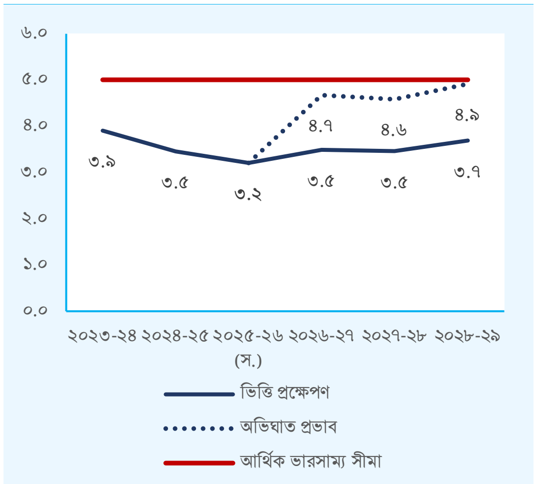

চিত্র ৫.১১ আর্থিক ভারসাম্যের উপর প্রভাব

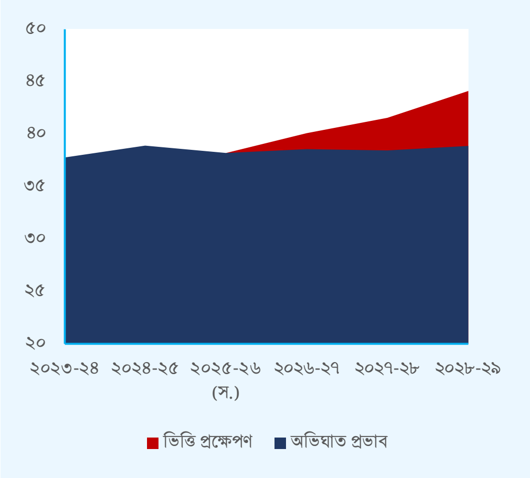

চিত্র ৫.১২ সরকারি ঋণ-জিডিপি অনুপাতের উপর প্রভাব

অভিঘাত পরিস্থিতিতে ঋণ-জিডিপি অনুপাত উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ভিত্তি প্রক্ষেপণে জিডিপির প্রায় ৩৭-৩৮ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা ঋণ অনুপাত ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৪০.০৮ শতাংশ, ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ৪১.৫৩ শতাংশ এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছরের মধ্যে ৪৪.১২ শতাংশে উন্নীত হবে এমনটা পরিলক্ষিত হয়। এই গতিপথ যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে তা বাংলাদেশের টেকসই ঋণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অবনতিশীল অবস্থা নির্দেশ করে যা পরবর্তী বছরগুলোতে সরকারের ঋণ গ্রহণের সক্ষমতা ও রাজস্ব পরিসরকে সংকুচিত করতে পারে।

৫.৩.৩.৩ বেসরকারি বিনিয়োগের উপর প্রভাব

রাজস্ব ঘাটতির সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক প্রভাবগুলোর একটি হলো বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের 'ক্রাউডিং আউট' বা বিনিয়োগের সুযোগ সংকুচিত হওয়া। সরকারি রাজস্ব যখন লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম হয়, তখন ব্যয়নির্বাহের জন্য অভ্যন্তরীণ ঋণের ওপর নির্ভরতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। অভ্যন্তরীণ আর্থিক বাজারে এর ফলে বেসরকারি খাতের ঋণের চাহিদার সাথে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে। ঋণ গ্রহণের ব্যয়ের ওপর এই উর্ধ্বমুখী চাপ বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের জন্য ঋণের প্রাপ্যতা এবং সামর্থ্য উভয়ই কমিয়ে দেয়। অভিঘাত পরিস্থিতি অনুযায়ী বেসরকারি বিনিয়োগ—যা বেইজলাইনের প্রক্ষেপণে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ৮,০৯৪ বিলিয়ন টাকা থেকে ২০২৮-২৯ অর্থবছরের মধ্যে শক্তিশালীভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে ১১,৫০৬ বিলিয়ন টাকায় পৌঁছানোর প্রক্ষেপণ করা হয়েছিল—তা এই ধাক্কার ফলে ২০২৮-২৯ অর্থবছরের মধ্যে হ্রাস পেয়ে আনুমানিক ১০,৬৪৯ বিলিয়ন টাকায় নেমে আসতে পারে। এটি বেইজলাইনের তুলনায় প্রায় ৮৫৭ বিলিয়ন টাকা কম। বেসরকারি বিনিয়োগের এই সংকোচন বিশেষভাবে ক্ষতিকর, কারণ বেসরকারি পুঁজি গঠনই হলো উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং রপ্তানি সক্ষমতার মূল চালিকাশক্তি, যা বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধির কাঠামোর চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে।

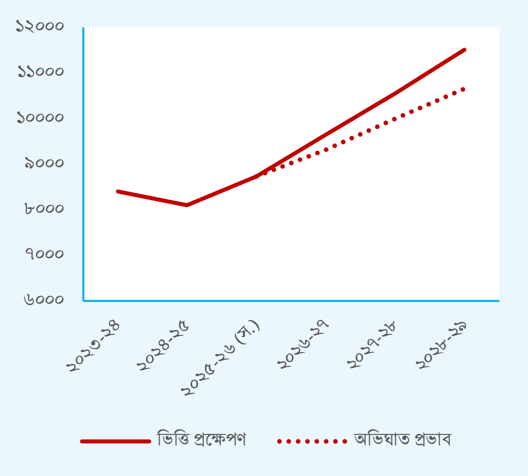

চিত্র ৫.১৩ বেসরকারি বিনিয়োগের উপর প্রভাব

৫.৩.৩.৪ প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির উপর প্রভাব

সরকারি উন্নয়ন ব্যয়ের সংকোচন, বেসরকারি বিনিয়োগের সীমাবদ্ধতা এবং কঠোর অর্থায়ন পরিস্থিতির সম্মিলিত প্রভাব মধ্যমেয়াদে জিডিপি প্রবৃদ্ধিকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে পারে। ভিত্তি প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২০২৫ অর্থবছরের ৩.৫ শতাংশ থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ২০২৭ অর্থবছরে ৬.৫ শতাংশ, ২০২৮ অর্থবছরে ৭.০ শতাংশ এবং ২০২৯ অর্থবছরের মধ্যে ৭.৫ শতাংশে পৌঁছাতে পারে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে, রাজস্ব ঘাটতি পরিস্থিতিতে (Revenue Shock Scenario) প্রবৃদ্ধির এই গতিপথ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে দৃশ্যমানভাবে নিচে নেমে আসবে—যা ২০২৭ অর্থবছরে আনুমানিক ৫.৫৭ শতাংশ, ২০২৮ অর্থবছরে ৬.০৩ শতাংশ এবং ২০২৯ অর্থবছরে ৬.৪৫ শতাংশে পৌঁছাতে পারে। এর অর্থ হলো, একটি ১৬ শতাংশ রাজস্ব ঘাটতির কারণে মধ্যমেয়াদী কাঠামোর পরবর্তী বছরগুলোতে বাংলাদেশকে প্রতি বছর আনুমানিক ১.০ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি হারাতে হতে পারে। এই প্রবৃদ্ধি হ্রাস দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ২০৩৪ সালের মধ্যে ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতিতে রূপান্তেরর ক্ষেত্রে একটি বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ।

বক্স ৫.২: রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার বাজেট, রিপোর্টিং এবং মূল্যায়ন (SABRE+)

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান (SOEs) ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর (ABs) ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নত করার জন্য, অর্থ বিভাগ SABRE+ নামক একটি টুল ব্যবহার করে। এই টুলে বাজেট ব্যবস্থাপনা, ঋণ ও সম্ভাব্য দায়, কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন, জনবল ও সংগঠন কাঠামো এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত ফিচার অন্তর্ভুক্ত আছে। SABRE+ টুলের মূল উদ্দেশ্য হলো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা, তথ্যভিত্তিক নীতিনির্ধারণে সহায়তা করা এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা উন্নত করা।

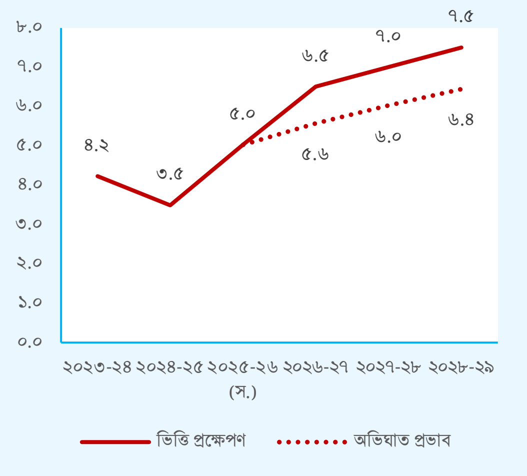

চিত্র ৫.১৪ প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির উপর সম্ভাব্য প্রভাব

রাজস্ব ঘাটতির ঝুঁকি মধ্যমেয়াদী কাঠামোর জন্য সবচেয়ে প্রত্যক্ষ এবং পরিমাপযোগ্য আর্থিক ঝুঁকিগুলোর একটি। অভ্যন্তরীণ রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে টেকসই অগ্রগতি ছাড়া, সরকারকে আর্থিক সুসংহতকরণ (Fiscal Consolidation) এবং উন্নয়ন ব্যয় চাহিদার মধ্যে একটি কঠিন ভারসাম্যের (Trade-Off) মুখোমুখি হতে হবে। তাই করের আওতা বাড়ানো, কর অব্যাহতি যৌক্তিকীকরণ, কর প্রশাসনের ডিজিটাইজেশন এবং কমপ্লায়েন্স জোরদার করার মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহের প্রচেষ্টা শক্তিশালী করা কেবল একটি আর্থিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যই নয়, বরং মধ্যমেয়াদে টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি অন্যতম পূর্বশর্ত।

৫.৪ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান (SOE) এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো (AB) জ্বালানি, পরিবহন, নির্মাণ, টেলিযোগাযোগ, পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্যসেবা এবং কৃষিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতে কার্যক্রম পরিচালনা করে। পণ্য ও সেবা সরবরাহ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং শিল্প মানদণ্ড নির্ধারণে এসওইসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় তাদের আর্থিক সক্ষমতা সরকারের রাজস্ব অবস্থানের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান (SOE) সম্পর্কিত আর্থিক ঝুঁকিগুলো মূলত তিনটি প্রধান মাধ্যমে প্রকাশ পায়: (১) সার্বভৌম ঋণ গ্যারান্টি থেকে উদ্ভূত সুনির্দিষ্ট আকস্মিক দায়; (২) লোকসানি প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্ভাব্য মূলধন পুনর্ভরণ (Recapitalisation) প্রয়োজনীয়তা থেকে উদ্ভূত পরোক্ষ দায়; এবং (৩) সরকারি ইক্যুইটি বিনিয়োগ থেকে অপ্রাপ্ত মুনাফা (Unrealised returns)।

৫.৪.১ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান (SOE) এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো (AB) জ্বালানি, পরিবহন, নির্মাণ, টেলিযোগাযোগ, পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্যসেবা এবং কৃষিসহ বিস্তৃত বিভিন্ন কৌশলগত খাতে পরিচালিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয় অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; বিশেষ করে যেসব এলাকায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ পর্যাপ্ত নয়, সেখানে জরুরি পণ্য ও সেবার নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমে এরা অবদান রাখে।

সেবা প্রদানের পাশাপাশি, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো (SOE) কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে, শিল্পোন্নয়নে সহায়তা করে এবং পরিচালনগত মানদণ্ড ও সুশাসনের চর্চায় বেঞ্চমার্ক বা আদর্শ মান নির্ধারণে সাহায্য করে। তদুপরি, এগুলো অবকাঠামোগত সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্যগুলো এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। তাই, বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা এবং দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান (SOE) এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর (AB) দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও প্রতিযোগিতা সক্ষমতা জোরদার করা অত্যন্ত জরুরি।

একারণেই, বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা এবং দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান (SOE) এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর (AB) দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও প্রতিযোগিতা সক্ষমতা জোরদার করা অত্যন্ত জরুরি।

৫.৪.২ উদ্দেশ্য

২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর (SOE) আর্থিক ঝুঁকি মূল্যায়নের প্রধান উদ্দেশ্য হলো—যেসব প্রধান উপায়ে (channels) এই প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিক চাপ বা সংকট তৈরি করতে পারে তা চিহ্নিত করা, এবং সেই ঝুঁকিগুলো নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমনের জন্য নীতিগত পদক্ষেপের প্রস্তাব করা। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর সুশাসন, আর্থিক শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা এবং পরিচালনগত দক্ষতা জোরদার করা সম্ভব হবে। ফলস্বরূপ, এই ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা একদিকে যেমন আর্থিক স্থায়িত্ব ও উন্নত সেবা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করবে, অন্যদিকে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে সরকারের রাজস্ব পরিসর সম্প্রসারণে মুনাফা বৃদ্ধিতেও সহায়তা করবে।

৫.৪.৩ এসওই সমূহের ঋণ ও প্রচ্ছন্ন দায়

আইনগতভাবে পূর্ববর্তী অর্থবছরের অডিট বা নিরীক্ষা প্রতিবেদন অর্থবছর শেষ হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকলেও, কিছু রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান (SOE) এবং স্বায়ত্তশাসিত

সংস্থা (AB) তা জমা দেয়নি। এর ফলে, অর্থ বিভাগের এসওই (SOE) উইং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক স্টেটমেন্টে (FRS) অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ঋণ এবং প্রচ্ছন্ন দায় (Contingent liabilities) প্রক্ষেপণ ও মূল্যায়ন চূড়ান্ত করতে পারেনি। তবে, অডিট প্রতিবেদনগুলো সময়মতো জমা দেওয়া নিশ্চিত করতে এসওই উইং এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে, ১২২টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান (SOE) এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার (AB) মোট দায়ের পরিমাণ ৮,৩৩,২১৬.১০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা একটি উল্লেখযোগ্য ঋণ বোঝার প্রতিফলন। এই দায়ের সবচেয়ে বড় অংশ-৩,৫০,০৬৮.৫০ কোটি টাকা (৪২.০১%)-সাবসিডিয়ারি লোন এগ্রিমেন্ট (SLA) এবং লোন এগ্রিমেন্ট (LA)-এর অধীনে বাংলাদেশ সরকারের কাছে বকেয়া রয়েছে, যা সরকারি অর্থায়নের ওপর তাদের অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা প্রকাশ করে। অন্যান্য দায়, যার মধ্যে প্রধানত

পরিচালন এবং চলতি দায় (Operating and Current Liabilities) অন্তর্ভুক্ত, তার পরিমাণ ৩,১৫,৫৫০.৬০ কোটি টাকা (৩৭.৮৭%), যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর (Related parties) কাছে দায়ের পরিমাণ ১১৭,৯০৫.০১ কোটি টাকা (১৪.১৫%), যেখানে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে নেওয়া ঋণের পরিমাণ সবচেয়ে কম- ৪৯,৩৪১.৪৩ কোটি টাকা (৫.৯২%) এবং সবশেষে বিলম্বিত দায় (Deferred Payment Liabilities) হলো ৩৫০.৫৩ কোটি টাকা, যা মোট দায়ের মাত্র ০.০৫%। সামগ্রিকভাবে, এই দায়ের কাঠামোটি উল্লেখযোগ্য পরিচালনগত ও অভ্যন্তরীণ আর্থিক বাধ্যবাধকতার পাশাপাশি সরকারের আর্থিক হস্তক্ষেপ বা সহায়তার ওপর একটি বড় ধরণের নির্ভরশীলতার পরিচায়ক।

৫.৪.৪ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর (এসওই) ঝুঁকি বিশ্লেষণ

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান (SOE) এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর (AB) ঝুঁকি মূল্যায়ন মূলত তিনটি প্রধান আর্থিক দিক- মুনাফা সক্ষমতা (Profitability), তারল্য (Liquidity), এবং ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা (Solvency)- এর ওপর ভিত্তি করে করা হয়, যা সাতটি মূল আর্থিক অনুপাতের (২টি মুনাফা সক্ষমতা, ২টি তারল্য এবং ৩টি ঋণ পরিশোধ সক্ষমতার অনুপাত) মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) আর্থিক ঝুঁকি মূল্যায়ন কাঠামো অনুসরণ করে, এই নির্দেশকগুলো SABRE+ টুলের সাহায্যে তৈরি করা হয়, যা আর্থিক ঝুঁকি বিশ্লেষণের জন্য একটি সুবিন্যস্ত এবং পরিমাণগত ভিত্তি প্রদান করে। এই বিশ্লেষণী কাঠামোর আলোকে প্রতিষ্ঠানসমূহকে পাঁচটি স্বতন্ত্র ঝুঁকি স্তরে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়, যা সরকারের প্রতি অধিক আর্থিক ঝুঁকি সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। এই শ্রেণিবিন্যাস কার্যকর পর্যবেক্ষণ, সুনির্দিষ্ট তদারকি এবং দূরদর্শী নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করে। সামগ্রিকভাবে, এই কাঠামোটি আর্থিক কর্মক্ষমতা ও স্থিতিশীলতা পদ্ধতিগতভাবে মূল্যায়নের মাধ্যমে আর্থিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করে এবং এভাবে সরকারি তহবিলের জন্য বেশি ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে সাহায্য করে।

এই আটটি অনুপাতের প্রত্যেকটি প্রথমে গণনা করা হয় এবং পূর্বনির্ধারিত সীমার (Thresholds) সাথে তুলনা করে ১ (খুব কম) থেকে ৫ (খুব উচ্চ) পর্যন্ত একটি ঝুঁকির গ্রেড দেওয়া হয়। এরপর প্রতিটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের (SOE) চূড়ান্ত ঝুঁকির শ্রেণীবিভাগ- যেমন: খুব কম, কম, মাঝারি, উচ্চ, বা খুব উচ্চ- নির্ধারণের জন্য এই আটটি স্কোরের একটি গড় হিসাব বের করা হয়।

সারণি ৫.২ স্বতন্ত্র গ্রেডিং সীমামান

গ্রেড	খুব কম	কম	মাঝারি	উচ্চ	খুব উচ্চ
	১	২	৩	৪	৫
গড় স্কোড়	১.৪৯ <	১.৫ - ২.৪৯	২.৫-৩.৪৯	৩.৫-৪.৪৯	৪.৫>=

৫.৪.৫ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার আর্থিক ঝুঁকির শ্রেণিবিন্যাস

২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য ১২২টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান (SOE) এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার (AB) আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ৫টি (৪%) প্রতিষ্ঠান খুব কম ঝুঁকিপূর্ণ, ১৮টি (১৫%) কম ঝুঁকিপূর্ণ, ৫০টি (৪১%) মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ, ৩০টি (২৫%) উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এবং ১৯টি (১৫%) খুব উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ হয়েছে।

২০২৪ অর্থবছরে ১২২টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান (SOE) এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার (AB) মূল্যায়নে সুশাসন ও কর্মক্ষমতার চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি মাঝারি মাত্রার আর্থিক ঝুঁকি পরিলক্ষিত হয়। মোট প্রচ্ছন্ন দায়ের (Contingent liabilities) পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৪,৪৩৮.৮৩ কোটি টাকা (জিডিপির ০.৭৭%), যা মূলত সংবিধিবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং মামলা-মোকদ্দমার কারণে সৃষ্টি হলেও আর্থিক বিবেচনায় তা নিয়ন্ত্রণযোগ্য অবস্থায় রয়েছে।

আর্থিক দিক থেকে, ৩৭টি প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী মুনাফাযোগ্যতা ও নগদ প্রবাহের মাধ্যমে স্বনির্ভর, অপরদিকে ২৪টি প্রতিষ্ঠান আর্থিক সংকটে রয়েছে, যা ধারাবাহিক ক্ষতি ও বাহ্যিক সহায়তার উপর নির্ভরশীল। অডিট বা নিরীক্ষা ফলাফলগুলো সুশাসনের ক্ষেত্রে কিছু উদ্বেগের বিষয় উন্মোচন করেছে: মাত্র ৫২টি প্রতিষ্ঠান নিঃশর্ত বা ত্রুটিহীন মতামত (Unqualified opinions) পেয়েছে, ৬০টি প্রতিষ্ঠান শর্তযুক্ত বা ত্রুটিপূর্ণ মতামত (Qualified opinions) পেয়েছে এবং ১০টি প্রতিষ্ঠান তাদের অডিট সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তদুপরি, ৫৩টি প্রতিষ্ঠান টানা তিন বছর ধরে শর্তযুক্ত মতামত পেয়ে আসছে, যা তাদের আর্থিক প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে ক্রমাগত দুর্বলতাকে নির্দেশ করে।

সারণি ৫.৩ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার আর্থিক ঝুঁকির শ্রেণিবিন্যাস

গ্রেড	খুব কম	কম	মাঝারি	উচ্চ	খুব উচ্চ
এসওই-এর র‍্যাঙ্কিং/স্কোর	১	২	৩	৪	৫
এসওই-এর সংখ্যা	৫	১৮	৫০	৩০	১৯
এসওই/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা (প্রকৃত মূল্য, কোটি টাকা)	১৮৩১.৬৪	৪৬১৫২.৩২	২৬৭২১৯.৫	২৯৫৬৩০.৭	২২২৩৮১.৯
জিডিপি-র শতাংশ	০.০৪%	০.৯২%	৫.৩৪%	৫.৯০%	৪.৪৪%
ঋণের শতাংশ	০.২২%	৫.৫৪%	৩২.০৭%	৩৫.৪৮%	২৬.৬৯%
মোট এসওই-তে সরকারের অংশ (%)	০.৪৫%	১১.৩৮%	৬৫.৮৯%	৭২.৯০%	৫৪.৮৪%

উৎস: SABRE+ টুল

সামগ্রিকভাবে, যদিও কিছু রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান (SOE) ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা দেখিয়েছে, তবুও অনেক প্রতিষ্ঠানেই কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা এবং জবাবদিহিতার ঘাটতি দেখা যাচ্ছে, যা শক্তিশালী তদারকি ও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাকে বিশেষভাবে তুলে ধরে।

৫.৪.৬ সামষ্টিক অর্থনীতির ঝুঁকি থেকে উদ্ভুত ঝুঁকি

সামষ্টিক অর্থনৈতিক অভিঘাত (Macroeconomic shocks) রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর (SOE) জন্য বড় ধরণের ঝুঁকি তৈরি করে। এর মধ্যে রয়েছে বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ জিডিপি প্রবৃদ্ধির ধীরগতি- যা বিভিন্ন খাতে সেবার চাহিদা কমিয়ে দেয়; উচ্চ মূল্যস্ফীতি, ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, যুদ্ধের প্রভাবে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি, টাকা-ডলারের বিনিময় হারের ওঠানামা এবং উচ্চ সুদের হার- যা উৎপাদন, ক্রয়, রক্ষণাবেক্ষণ ও ঋণ পরিশোধের ব্যয় বাড়িয়ে দেয়; এবং নীতিগত অনিশ্চয়তার কারণে ঋণের সহজলভ্যতাকে সীমিত করে তোলে। আইনি জটিলতার (Regulatory rigidities) কারণে সময়মতো শুল্ক বা ট্যারিফ সমন্বয় করা সম্ভব হয় না, যা রাজস্ব ও ব্যয়ের ব্যবধানকে আরও বাড়িয়ে দেয়। খাতভিত্তিক অভিঘাত মূলত এভিয়েশন (উড়োজাহাজ), বিদ্যুৎ, জ্বালানি, সার এবং পরিবহন খাতকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে। এর পাশাপাশি রেমিট্যান্স বা প্রবাস আয় কমে গেলে তা এই ঝুঁকিকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে, যার ফলে সাময়িক এই অভিঘাত দীর্ঘস্থায়ী আর্থিক বোঝায় পরিণত হয় এবং তা মোকাবিলায় সরকারের জরুরি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন পড়ে।

৫.৪.৭ সার্বভৌম গ্যারান্টি

২০২৬ অর্থবছরের শেষে পুঞ্জীভূত বকেয়া সার্বভৌম গ্যারান্টির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪০০.১২ বিলিয়ন টাকা। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর নেওয়া ঋণের বিপরীতে সরকার এই সার্বভৌম গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা প্রদান করে থাকে। সরকারি গ্যারান্টিগুলো মূলত বাণিজ্যিক বিমান পরিবহন খাত, বিদ্যুৎ খাত, সার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি ভোগ্যপণ্য খাতে পরিচালিত সংস্থাগুলোর অনুকূলে ইস্যু করা হয়েছিল। যদিও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে সার্বভৌম ঋণ খেলাপির কোনো ঘটনা ঘটেনি, তবুও এই প্রক্রিয়াটিকে আরও সুবিন্যস্ত করতে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা আরও শক্তিশালী করতে সরকার বিদ্যমান সার্বভৌম গ্যারান্টি নির্দেশিকা সংশোধনের পরিকল্পনা করছে।

৫.৪.৮ প্রশমন কৌশল

ঝুঁকি প্রশমন কৌশলগুলোর লক্ষ্য হওয়া উচিত আর্থিক সুরক্ষা এবং প্রতিষ্ঠানের ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতার (Resilience) মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখা, যা মুনাফা অর্জন সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণের বোঝা কমাতে সাহায্য করবে। মন্থর প্রবৃদ্ধি ও দুর্বল চাহিদার মোকাবেলায় ঘূর্ণায়মান পূর্বাভাস, ত্রৈমাসিক ব্যবসায়িক পরিকল্পনা এবং রাজস্ব বহুমুখীকরণমুখী নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। একটি পূর্বাভাসযোগ্য বা নিয়মমাফিক সমন্বয় কাঠামো তৈরি, সুনির্দিষ্ট ভর্তুকি নীতিমালা প্রণয়ন এবং সময়মতো অডিট বা নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা দেওয়ার মাধ্যমে ট্যারিফ নির্ধারণের জটিলতা যৌক্তিকীকরণ করতে হবে। কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা দূর করতে অর্থ বিভাগ কর্মসম্পাদন চুক্তির পরিধি বাড়াবে, পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা (যেমন: SABRE+) জোরদার করবে এবং আশানুরূপ কর্মক্ষমতা দেখাতে না পারা প্রতিষ্ঠানগুলোর (SOEs/ABs) জন্য সময়াবদ্ধ পুনর্গঠনের (Restructuring) নির্দেশনা প্রদান করবে।

৫.৫ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সামষ্টিক-আর্থিক ঝুঁকি

বাংলাদেশ বিশ্বে ৯ম সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশ যেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা অধিক হারে সংঘটিত হয় (ওয়ার্ল্ড রিস্ক ইনডেক্স, ২০২৪)। এসব দুর্যোগে প্রতিবছর প্রায় ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অধিক অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতি হয়, যা দেশের মোট জিডিপির প্রায় ১ শতাংশ (ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স, ২০২৫)। এই দুর্যোগগুলো প্রতিবছর ৬.৩ মিলিয়নেরও বেশি মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে। বাংলাদেশের নিচু ভূ-প্রকৃতি, উচ্চ জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং কৃষির ওপর ব্যাপক নির্ভরশীলতা

জলবায়ু-সম্পর্কিত দুর্যোগের প্রতি এর সংবেদনশীলতা বা নাজুকতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ২০১৬ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত গড়ে প্রতি বছর জিডিপির ১.৩২ শতাংশ ক্ষতি হয়েছে।

আইএমএফ-এর ক্লাইমেট ড্যাশবোর্ড এর তথ্যমতে, গত চার দশকে বাংলাদেশ ১৩টি বড় ধরণের বন্যা এবং ৮টি বড় ধরণের ঘূর্ণিঝড়ের মুখোমুখি হয়েছে। ঐতিহাসিক উপাত্তের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, বন্যার মতো দুর্যোগগুলো অর্থনীতির জন্য একটি পদ্ধতিগত 'টেইল রিস্ক' বা চরম ঝুঁকির (Systemic Tail Risks) প্রতিফলন: যেমন ১৯৮৮ এবং ১৯৯৮ সালের প্রলয়ঙ্করী বন্যার ফলে জিডিপির ৫ শতাংশেরও বেশি ক্ষতি হয়েছিল। বন্যা-সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে দীর্ঘমেয়াদি গড় কাঠামোগত ক্ষতির (Structural Loss) পরিমাণ বার্ষিক জিডিপির ৩.৮৮ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা জাতীয় কোষাগারের (National Exchequer) ওপর একটি পুনরাবৃত্তিমূলক বা নিয়মিত রাজস্ব বোঝা হিসেবে বিদ্যমান। এই প্রেক্ষাপট বিবেচনায়, মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক ঝুঁকি বিশ্লেষণের জন্য বন্যাকে একটি প্রতিনিধি বা আদর্শ প্রাকৃতিক দুর্যোগ (Natural Disaster - ND) জনিত অভিঘাত হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। এই বিশ্লেষণে আইএমএফ (IMF) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত 'ক্লাইমেট ম্যাক্রো-ফ্রেমওয়ার্ক টুলকিট' (CMT) ব্যবহার করা হয়েছে।

বক্স ৫.৩: ক্লাইমেট ম্যাক্রো-ফ্রেমওয়ার্ক টুলকিট (সিএমটি)

সিএমটি হলো আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের উদ্যোগ প্রণিত একটি টুলকিট যার মাধ্যমে সরকারের জন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিকে বিশ্লেষণ করা হয়। এই টুলকিটে তিনটি এক্সেলভিত্তিক টুল আছে: ১. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ড্যাশবোর্ড; ২. পরিসংখ্যানভিত্তিক বিশ্লেষণ টুল (Empirical Tool); ৩. সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (Macroeconomic Framework)। ড্যাশবোর্ড টুলে একটি দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কিত তথ্য এবং সেই দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতির মাত্রা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেয়া থাকে। পরিসংখ্যানভিত্তিক টুল (Empirical Tool) ব্যবহার করে দেখা যায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের অভিঘাতে (shock) দেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সূচকগুলো কীভাবে রেসপন্স করে। ড্যাশবোর্ড থেকে প্রাপ্ত বৈশ্বিক তথ্য এবং পরিসংখ্যানভিত্তিক টুল থেকে পাওয়া ফলাফল একত্রিত করে, এই প্রভাবগুলো সামষ্টিক অর্থনৈতিক মডেল-এ সংযুক্ত করা হয় এবং তা পরিমাপ করা হয়।

৫.৫.১ প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিস্থিতি

২০২৬-২৭ অর্থবছর থেকে ২০২৮-২৯ অর্থবছর পর্যন্ত সম্ভাব্য প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি বিশ্লেষণের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সিএমটি মডেলে সংযুক্ত করা হয়েছে । এই বিশ্লেষণে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, ২০২৬-২৭ অর্থবছরে একটি মাঝারি থেকে বড় ধরণের বন্যা হবে। বন্যা সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যগুলো নিচের সারণিতে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৫.৪ প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিস্থিতি

দেশভিত্তিক বৈশিষ্ট্যসমূহ	ইনপুট
দুর্যোগ-পূর্ব সরকারের আর্থিক ভারসাম্য (আর্থিক ভারসাম্য জিডিপি'র শতাংশে)	(-) ৩.৫০
অভিযোজন সক্ষমতা (০ = সর্বোচ্চ, ১ = সর্বনিম্ন)	০.৭৮
ভৌত ক্ষতির পরিমাণ (জিডিপির শতাংশে)	৩.৮৮
প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধরন (বন্যা, ঝড়, খরা, অন্যান্য)	বন্যা

৫.৫.২ প্রাকৃতিক দুর্যোগ অভিঘাতের আলোকে সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রক্ষেপণ

এই অভিঘাতের পরিস্থিতিটি (shock scenario) একটি বন্যা পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে পরিমাপ (calibrated) করা হয়েছে—যা বাংলাদেশের সবচেয়ে ঘন ঘন ঘটে যাওয়া এবং অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক দুর্যোগ। আইএমএফ (IMF)-এর 'গ্লোবাল ক্লাইমেট ড্যাশবোর্ড' থেকে প্রাপ্ত এবং 'ন্যাচারাল ডিজাস্টার এম্পিরিক্যাল টুলকিট'-এ অন্তর্ভুক্ত মানদন্ড ব্যবহার করে একটি বন্যা পরিস্থিতির সম্ভাব্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রভাব প্রাক্কলন করা হয়েছে। এই টুলকিটটি প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকগুলোর জন্য গড় প্রাক্কলনের (mean estimates) পাশাপাশি 'ওয়ান স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন' উর্ধ্বমুখী এবং নিম্নমুখী সীমার প্রক্ষেপণ (upper and lower bound projections) তৈরি করে।

সারণি ৫.৫ অভিঘাত প্রভাবের চিত্রকল্প

ভেরিয়েবল সমূহ	মিন এস্টিমেট (ডেভিয়েশন ফ্রম ট্রেন্ড)			এস্টিমেটের কনফিডেন্স ইন্টারভেল (%)	আপার বাউন্ড			লোয়ার বাউন্ড		
	t=০	t=১	t=২		t=০	t=১	t=২	t=০	t=১	t=২
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	-০.৪৮	-০.৬৩	+০.৩৪	৯০%	+০.০৫	-১.০১	-০.৪৮	-০.৬৩	+০.৩৪	৯০%
সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি (%)	+২.৯৩	-১.০৫	-২.৯৭	৯০%	+৪.৭৯	+১.০৮	+২.৯৩	-১.০৫	-২.৯৭	৯০%
চলতি হিসাবে ভারসাম্য (জিডিপি এর শতাংশ হিসেবে)	+১.৩৪	+১.০০	+০.৭৭	৯০%	+৩.২৯	-০.৬১	+১.৩৪	+১.০০	+০.৭৭	৯০%
সুদের হার (%)	+০.৪৩	-২.০৪	+২.৫৫	৯০%	+১.০৭	-০.২২	+০.৪৩	-২.০৪	+২.৫৫	৯০%
অভিহিত মুদ্রা বিনিময় হারের লগ	+০.০৪	+০.০১	-০.০২	৯০%	+০.৩৮	-০.২৯	+০.০৪	+০.০১	-০.০২	৯০%

উৎস: সিএমটি টুলকিট (আইএমএফ)

৫.৫.৩ প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলকসমূহের ওপর প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব

৫.৫.৩.১ উৎপাদন ও জিডিপি প্রবৃদ্ধির উপর প্রভাব

ফসলের ক্ষতি, গবাদিপশুর ক্ষয়ক্ষতি, অবকাঠামোর ক্ষতি এবং সরবরাহ ব্যবস্থার বিঘ্নের মাধ্যমে অভিঘাতের তাৎক্ষণিক প্রভাবে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন সংকুচিত হয়ে যায়। প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ মেয়াদে কমে যথাক্রমে ৬.৫ ও ৭.০ শতাংশের ভিত্তি প্রক্ষেপণের বিপরীতে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে প্রায় ৬.১৭ শতাংশ এবং ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ৬.৫৮ শতাংশে নেমে আসে। পুনর্গঠন কার্যক্রম দ্বারা প্রভাবিত চাহিদার প্রেক্ষিতে ২০২৮-২৯ অর্থবছরের মধ্যে ভিত্তি মাত্রার দিকে আংশিক ব্যবধান হ্রাসের প্রবণতা পরিলক্ষিত হলেও মধ্যমেয়াদে সামগ্রিক পুঞ্জীভূত উৎপাদন ক্ষতি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে থাকে।

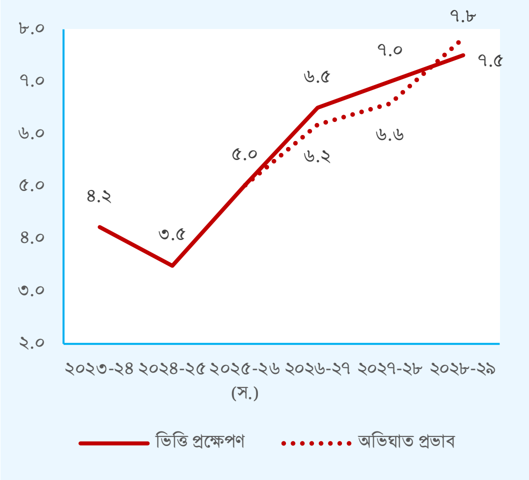

চিত্র ৫.১৫ জিডিপি প্রবৃদ্ধির উপর প্রভাব

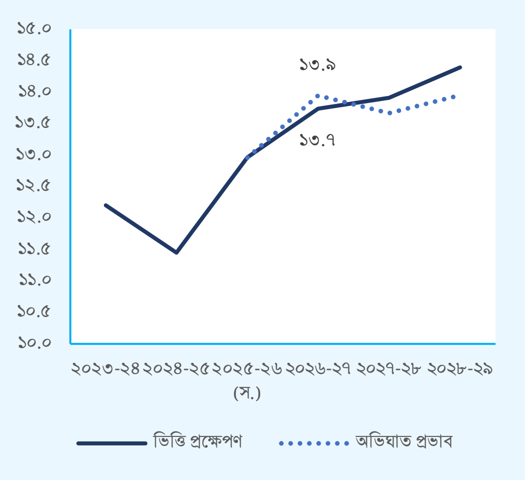

চিত্র ৫.১৬ সরকারি ব্যয়ের উপর প্রভাব

৫.৫.৩.২ সরকারি ব্যয়ের উপর প্রভাব

জরুরি ত্রাণ, পুনর্বাসন এবং পুনর্গঠন কার্যক্রম ভিত্তি প্রক্ষেপণের উপরে উল্লেখযোগ্য অপরিকল্পিত ব্যয়ের চাপ তৈরি করে। জিডিপির অংশ হিসেবে সরকারি ব্যয় ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ভিত্তি প্রক্ষপণের ১৩.৭ শতাংশের বিপরীতে প্রায় ১৩.৯ শতাংশে উন্নীত হয়। মধ্যমেয়াদে সরকারি ব্যয় অনুপাত মোটামুটি ভিত্তি মাত্রার দিকে অগ্রসর হলেও ব্যয়ের প্রকৃতি প্রতিকূলভাবে পরিবর্তিত হয়- ব্যয়ের বড় অংশ দুর্যোগ মোকাবিলায় জরুরি ব্যয়ে খরচ হয়, যা পরিকল্পিত উন্নয়ন ব্যয়কে কমিয়ে দেয়। ব্যয়ের কাঠামোগত এই অবক্ষয় সামগ্রিক ব্যয়ের অনুপাতগুলোর সাধারণ চিত্রের বাইরে একটি বড় ধরণের আর্থিক ক্ষতিকে নির্দেশ করে।

৫.৫.৩.৩ মূল্যস্ফীতির ওপর প্রভাব

এই দুর্যোগজনিত অভিঘাতটি একই সাথে দুটি মাধ্যমে ঊর্ধ্বমুখী মূল্যস্ফীতির চাপ তৈরি করে: প্রথমত, ফসলের ক্ষয়ক্ষতি এবং ক্ষতিগ্রস্ত বিতরণ ব্যবস্থার কারণে সরবরাহ ব্যবস্থায় যে বিপর্যয় ঘটে তা খাদ্যপণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দেয়; এবং দ্বিতীয়ত, জরুরি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তা আমদানিজনিত মূল্যস্ফীতির প্রভাবকে (import price pass-through) আরও বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়ে আনুমানিক ৮.০৪ শতাংশে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে, যেখানে এর ভিত্তি প্রক্ষেপণ লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭.৫ শতাংশ। দুর্যোগ-পরবর্তী পুনরুদ্ধার পর্বে সরবরাহের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার সাথে সাথে ২০২৭-২৮ ও ২০২৮-২৯ অর্থবছর নাগাদ মূল্যস্ফীতি ধীরে ধীরে পুনরায় ভিত্তি লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি নেমে আসে। তবে, স্বল্পমেয়াদের এই মূল্যস্ফীতিজনিত পরিস্থিতি প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতাকে হ্রাস করে, মুদ্রা ব্যবস্থাপনাকে (monetary management) জটিল করে তোলে এবং দুর্যোগের প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি জনকল্যাণের ওপর একটি অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয়।

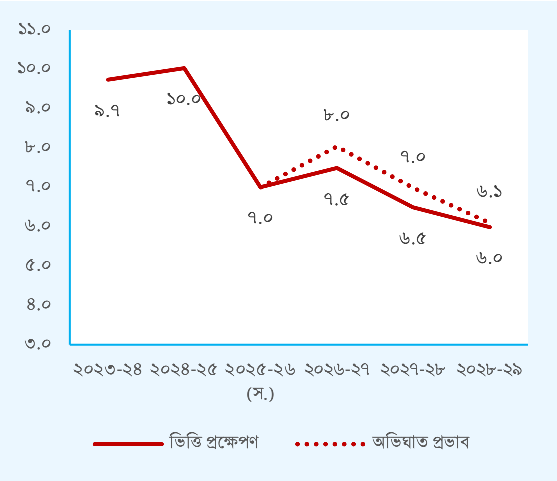

চিত্র ৫.১৭ মূল্যস্ফীতির উপর প্রভাব

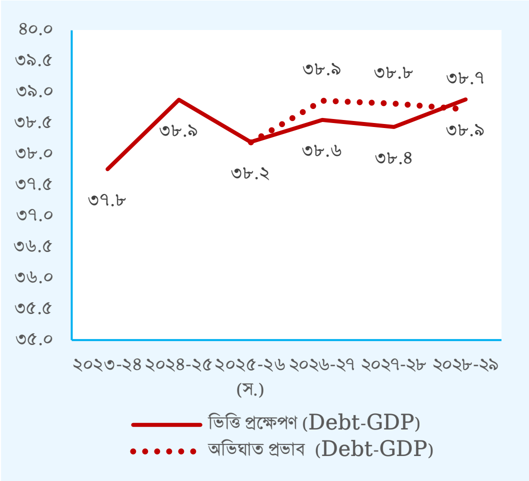

চিত্র ৫.১৮ ঋণ জিডিপি অনুপাতের উপর প্রভাব

৫.৫.৩.৪ আর্থিক ভারসাম্য এবং সরকারি ঋণের ওপর প্রভাব

রাজস্ব সংকোচন এবং জরুরি ব্যয় বৃদ্ধির যৌথ প্রভাবে বাজেট ঘাটতি আরও বৃদ্ধি পায়। অভিঘাতের পরিস্থিতিতে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ঘাটতির পরিমাণ জিডিপির আনুমানিক ৩.৯৮ শতাংশ প্রক্ষেপণ করা হয়েছে, যেখানে এর মূল প্রক্ষেপণ ছিল ৩.৫ শতাংশ। পরবর্তীতে জরুরি পরিস্থিতি কেটে যাওয়ার সাথে সাথে আর্থিক ঘাটতি কমতে থাকে এবং ২০২৭-২৮ ও ২০২৮-২৯ অর্থবছর নাগাদ সার্বিকভাবে ভিত্তি প্রক্ষেপণের কাছাকাছি চলে আসে। সমগ্র প্রক্ষেপণ মেয়াদ জুড়ে অভিঘাতের পরিস্থিতিতে ঋণ ও জিডিপির অনুপাত (debt-to-GDP ratio) ভিত্তি প্রক্ষেপণের কাছাকাছি অবস্থান করে—যা ২০২৬-২৭ অর্থবছরে মূল প্রক্ষপণ ৩৮.৬ শতাংশের বিপরীতে আনুমানিক ৩৮.৮৬ শতাংশে পৌঁছায়; এবং শেষদিকের বছরগুলোতে তা ভিত্তি প্রক্ষেপণের চেয়ে সামান্য নিচে নেমে আসে, কারণ পুনর্নির্মাণ কার্যক্রমের ফলে অভিহিত জিডিপির আকার বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশে সংঘটিত গড় মাত্রার তীব্রতাসম্পন্ন একটি বন্যার অভিঘাত প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ০.৫ থেকে ১.০ শতাংশ পয়েন্ট (percentage points) পর্যন্ত হ্রাস করতে পারে, মূল্যস্ফীতিকে লক্ষ্যমাত্রার ওপরে ঠেলে দিতে পারে এবং স্বল্পমেয়াদে আর্থিক ঘাটতিকে জিডিপির সর্বোচ্চ ০.৫ শতাংশ পয়েন্ট পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারে। তবে, প্রান্তিক ঝুঁকি এর চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক: ১৯৮৮ এবং ১৯৯৮ সালের সমতুল্য বড় ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো জিডিপির ৫ শতাংশেরও বেশি ক্ষতিসাধন করতে পারে, যার আর্থিক পরিণতি হবে সমানভাবে ভয়াবহ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে চরম আবহাওয়াজনিত দুর্যোগের পুনরাবৃত্তি ও তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে, ঐতিহাসিক গড়ের ভিত্তিতে তৈরি এই পরিমাপ প্রকৃত ঝুঁকির মাত্রাকে পুরোপুরি পরিমাপ নাও করতে পারে। ফলে, ভবিষ্যতে ঘটে যাওয়া দুর্যোগগুলোর আর্থিক ক্ষতি সীমিত রাখতে এবং মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (MTMF) অক্ষুণ্ণ রাখতে- পর্যাপ্ত বাজেট বাফার, পূর্ব-নির্ধারিত দুর্যোগ ঝুঁকি অর্থায়ন ব্যবস্থা এবং জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামোতে টেকসই বিনিয়োগের মাধ্যমে আর্থিক সক্ষমতা শক্তিশালী করা অত্যন্ত অপরিহার্য।

৫.৬ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ঝুঁকি

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত আর্থিক ঝুঁকির (contingent fiscal risk) একটি উল্লেখযোগ্য উৎস হিসেবে রয়ে গেছে, যা ব্যাংকিং ব্যবস্থার কিছু অংশের সম্পদের গুণগত মান, মূলধনের পর্যাপ্ততা, তারল্য পরিস্থিতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসনের গুরুতর দুর্বলতাকে প্রতিফলিত করে। ব্যাংকিং খাতের বর্তমান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো: মূলধন পর্যাপ্ততার অনুপাত (CAR) -২.৬৪ শতাংশ, খেলাপি ঋণ (NPLs) প্রায় ৩০ শতাংশ, সম্পদের বিপরীতে আয় (RoA) -৪.৮১ শতাংশ, এবং ইক্যুইটির বিপরীতে আয় (RoE) -২৪৩.৯ শতাংশ; এর পাশাপাশি আয়-ব্যয়ের অনুপাত (expenditure-to-income ratio) ৯১ শতাংশ। এই সূচকগুলো তীব্র ব্যালেন্স শিট চাপ, দুর্বল মুনাফা এবং সীমিত পরিচালন দক্ষতাকে নির্দেশ করে, যার ফলে ভবিষ্যতে যেকোনো অভিঘাত সহ্য করার সক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। যদিও সামগ্রিক স্তরে লিকুইডিটি কাভারেজ রেশিও (LCR) এবং নেট স্টেবল ফান্ডিং রেশিও (NSFR) ১০০ শতাংশের ওপরে রয়েছে—যা একটি সামগ্রিক প র্যাপ্ত তারল্য পরিস্থিতি নির্দেশ করে—তথাপি বেশ কয়েকটি একক ব্যাংকে তারল্য সংকট বা চাপ বজায় রয়েছে, যা খাত-ভিত্তিক গড় চিত্রে পুরোপুরি প্রকাশ পায় না।

এই দুর্বলতাগুলো আর্থিক মধ্যস্থতাকে বাধাগ্রস্ত করে, মুদ্রানীতির সঞ্চালনকে দুর্বল করে এবং সরকারি খাতের আকস্মিক সহায়তার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিয়ে বৃহত্তর সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও আর্থিক ঝুঁকি তৈরি করে। উচ্চ খেলাপি ঋণ, দুর্বল মূলধন ভিত্তি, ক্রমাগত লোকসান এবং অসম তারল্য পরিস্থিতির কারণে ব্যাংকগুলো সাধারণত নতুন ঋণ প্রদানে কড়াকড়ি আরোপ করে, উচ্চ ঋণ মার্জিন বা স্প্রেড বজায় রাখে এবং উৎপাদনশীল খাতগুলোতে ঋণের প্রবাহ কমিয়ে দেয়। টেকসই সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে, এই কাঠামোগত দুর্বলতাগুলো মধ্যমেয়াদে বেসরকারি বিনিয়োগ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং আর্থিক স্থিতিশীলতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

অতএব, এই ঝুঁকিগুলো মোকাবিলার জন্য তদারকি ব্যবস্থা ধারাবাহিক জোরদারকরণ, খেলাপি বা সংকটাপন্ন সম্পদের দ্রুত নিষ্পত্তি, দুর্বল প্রতিষ্ঠানগুলোর পুনঃমূলধনকরণ (recapitalisation) ও পুনর্গঠন এবং পুরো ব্যাংকিং খাত জুড়ে সুশাসন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যয় দক্ষতার উন্নয়ন প্রয়োজন হবে।

৫.৭ নীতিগত সুপারিশমালা

এই অধ্যায়ে চিহ্নিত আর্থিক ঝুঁকিগুলো—যার মধ্যে সামষ্টিক অর্থনৈতিক অভিঘাত, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের (SOE) সম্ভাব্য দেনা, ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ অন্তর্ভুক্ত— নিরসনে একটি সামগ্রিক নীতিগত পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই আর্থিক ঝুঁকিগুলো মোকাবিলার জন্য সরকারের উচিত অন্যান্য নীতির সাথে নিচে উল্লিখিত নীতিগত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা:

- আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পাশাপাশি বাহ্যিক অভিঘাত, অর্থনৈতিক মন্দা এবং অন্যান্য অপ্রত্যাশিত জরুরি পরিস্থিতিতে সময়োপযোগী নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে মধ্যমেয়াদে পর্যাপ্ত আর্থিক সক্ষমতা (Fiscal Space) বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ।
- নিম্ন-আয়ের পরিবার, ক্ষুদ্র চাষী এবং অন্যান্য অর্থনৈতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর উপায়সমূহ- বিশেষ করে 'ফ্যামিলি কার্ড' এবং 'ফার্মার্স কার্ড' কর্মসূচিগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে এবং ক্রমান্বয়ে এর পরিধি সম্প্রসারণ করতে হবে।
- নিম্ন-আয়ের পরিবার, ক্ষুদ্র চাষী এবং অর্থনৈতিকভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষার

জন্য সুনির্দিষ্ট সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীসমূহ—বিশেষ করে 'ফ্যামিলি কার্ড' এবং 'ফার্মার্স কার্ড' কর্মসূচিগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে এবং এর পরিধি সম্প্রসারণ করতে হবে।

- 'SABRE+' মনিটরিং কাঠামোর ব্যবহার বৃদ্ধি, সুনির্দিষ্ট আর্থিক লক্ষ্যমাত্রাসহ কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন এবং ক্রমাগত খারাপ পারফর্ম করা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সময়াবদ্ধ পুনর্গঠন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। একই সাথে, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্ভাব্য দায়-দেনাকে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ করতে হবে এবং টেকসই ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্রমান্বয়ে বাণিজ্যিক অর্থায়নের দিকে পরিচালিত করতে হবে।

- মূল্যস্ফীতি হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট আর্থিক ঝুঁকি কমাতে অভ্যন্তরীণ জ্বালানি তেলের মূল্যকে ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক বাজারের মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে এবং নবায়নযোগ্য শক্তিতে বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করতে হবে।

- মূল্যস্ফীতির প্রত্যাশাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং মূল্যস্ফীতিকে তার লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিম্নমুখী ধারায় বজায় রাখার জন্য আর্থিক (Fiscal) ও মুদ্রানীতি (Monetary) কর্তৃপক্ষের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় অপরিহার্য।

- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত আর্থিক ঝুঁকির বিরুদ্ধে স্থিতিশীলতা শক্তিশালী করার জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, নিষ্কাশন অবকাঠামো, আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা এবং জলবায়ু-সহনশীল কৃষি প্রযুক্তিতে টেকসই বিনিয়োগকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে।

- সর্বোপরি, একটি নিয়মিত এবং নিয়মতান্ত্রিক আর্থিক ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ কাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা উচিত, যেখানে প্রতি বছর অভিঘাত পরিস্থিতির হালনাগাদ তথ্য থাকবে এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও তথ্য-প্রমাণভিত্তিক আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তার জন্য বাজেটের পাশাপাশি আর্থিক ঝুঁকির বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা হবে।

৫.৮ সীমাবদ্ধতাসমূহ

এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই অধ্যায়ে উপস্থাপিত একক অভিঘাতের পরিস্থিতিগুলো (Individual Shock Scenarios) বিশ্লেষণের সুবিধার্থে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। তবে বাস্তবে, প্রতিকূল অভিঘাতগুলো প্রায়শই একইসাথে বা খুব কাছাকাছি সময়ে ঘটে থাকে, এবং বিভিন্ন খাতের পারস্পরিক প্রভাব তাদের সামগ্রিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও আর্থিক ঝুঁকিকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে, আলাদাভাবে ঝুঁকি মূল্যায়নের চেয়ে একাধিক অভিঘাতের ঘটনাকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি সম্মিলিত অভিঘাত পরিস্থিতি (Composite Shock Scenario) নিম্নমুখী ঝুঁকির আরও বাস্তবসম্মত চিত্র প্রদান করতে পারে। 'আর্থিক ঝুঁকি বিবৃতি'র ভবিষ্যৎ সংস্করণগুলোতে সক্ষমতা এবং তথ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে আরও সমন্বিত অভিঘাত মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হবে।

তাছাড়া, ব্যাংকিং খাতের পদ্ধতিগত গুরুত্ব এবং বাংলাদেশের ব্যাংকিং ও আর্থিক ব্যবস্থার বিদ্যমান দুর্বলতা বিবেচনা করে, আর্থিক খাতের জন্য কোনো ডেডিকেটেড বা সুনির্দিষ্ট অভিঘাত পরিস্থিতি (Stress Scenario) না থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণাত্মক সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করে। উচ্চ খেলাপি ঋণ, মূলধন পর্যাপ্ততার চাপ এবং ব্যাহত ঋণ প্রদান কার্যক্রম আর্থিক খাতের সংকটের প্রভাবগুলো মূল্যায়ন করে একটি

দৃশ্যপট বা পরিস্থিতি অন্তর্ভুক্ত করা হলে তা মধ্যমেয়াদি আর্থিক ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক ঝুঁকির আরও ব্যাপক মূল্যায়ন প্রদান করতে পারত। তাই ডেডিকেটেড ব্যাংকিং খাতের স্ট্রেস-টেস্টিং কাঠামো উন্নয়ন এবং বৃহত্তর সামষ্টিক-আর্থিক ঝুঁকি বিশ্লেষণকে ভবিষ্যৎ আর্থিক ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য একটি অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

৫.৯ উপসংহার

এই আর্থিক ঝুঁকি বিবৃতিটি নির্বাচিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক এবং কাঠামোগত অভিঘাত পরিস্থিতি (যেমন: তেলের মূল্যের ওঠানামা, মূল্যস্ফীতির চাপ এবং রাজস্ব ঘাটতি) থেকে মধ্যমেয়াদে আর্থিক কাঠামোর প্রধান ঝুঁকিগুলো মূল্যায়ন করে। বিশ্লেষণটি দেখায় যে, একক চাপের পরিস্থিতিতে বেজলাইন প্রক্ষেপণ সামগ্রিকভাবে

উল্লেখযোগ্য সম্ভাব্য দায় (Contingent Liabilities), এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাতের প্রতি বাংলাদেশের উচ্চ ঝুঁকিকে বিশেষভাবে তুলে ধরে। এই ঝুঁকিগুলো মূল আর্থিক সূচকগুলোতে পুরোপুরি প্রতিফলিত হয় না, তবে এগুলো বাস্তবায়িত হলে আর্থিক ফলাফলের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলার সম্ভাবনা রাখে, যা নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং সক্রিয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার গুরুত্বকে পুনর্ব্যক্ত করে।

স্থিতিশীল থাকলেও, এই ঝুঁকিগুলো যদি সম্মিলিতভাবে বা খুব কাছাকাছি সময়ে বাস্তব রূপ নেয়, তবে তা প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি, আর্থিক ভারসাম্য এবং সরকারি ঋণের গতিশীলতার ওপর উল্লেখযোগ্য চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক অভিঘাতগুলো মধ্যমেয়াদে মূলত উচ্চ ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা, দুর্বল রাজস্ব কর্মক্ষমতা এবং বর্ধিত অর্থায়নের চাহিদার মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়। যদিও আর্থিক এবং ঋণের সূচকগুলো অধিকাংশ পরিস্থিতিতে সামগ্রিকভাবে সহনীয় সীমার মধ্যে থাকে, তবে এই স্থিতিশীলতা ধারাবাহিক নীতিগত শৃঙ্খলা এবং সময়োপযোগী সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর নির্ভরশীল।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক ঝুঁকির বাইরে, এই স্টেটমেন্টটি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো থেকে উদ্ভূত

ভবিষ্যতে আর্থিক স্থিতিশীলতা শক্তিশালী করার জন্য আর্থিক ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও তা প্রকাশের ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতি, রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর সুশাসন ও তদারকি জোরদার করা, পর্যাপ্ত আর্থিক বাফার সংরক্ষণ এবং মধ্যমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনায় দুর্যোগ-সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলোর কার্যকর সমন্বয় প্রয়োজন হবে। একই সাথে, দুর্বলতাগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং নীতিগত ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার জন্য আর্থিক, মুদ্রা এবং ঋণ ব্যবস্থাপনা কাঠামোর মধ্যে কার্যকর সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।

তথ্যসূত্র

Asian Development Bank (2026) *Asian Development Outlook, April 2026*. Manila: Asian Development Bank. Available at: https://www.adb.org/publications/series/asian-development-outlook (Accessed: 5 June 2026).

Bangladesh Bank (2026) *Monetary Policy Statement (MPS)*, Fiscal Year 2025-2026. Dhaka: Bangladesh Bank. Available at: https://www.bb.org.bd (Accessed: 5 June 2026).

Bank for International Settlements (2026) *Effective exchange rate (EER) indices data*. Available at: https://data.bis.org/topics/EER/data (Accessed: 5 June 2026).

Bündnis Entwicklung Hilft and IFHV (2024) *World Risk Report 2024: Focus on multi-risks*. Berlin/Bochum: Bündnis Entwicklung Hilft / Institute for International Law of Peace and Armed Conflict. Available at: https://weltrisikobericht.de/en/ (Accessed: 5 June 2026).

Federal Reserve Bank of New York (2026) *Secured Overnight Financing Rate (SOFR) data*. Available at: https://www.newyorkfed.org/markets/reference-rates/sofr (Accessed: 5 June 2026).

Germanwatch (2025) *Global Climate Risk Index 2025: Who suffers most from extreme weather events?*. Bonn: Germanwatch e.V. Available at: https://www.germanwatch.org/en/cri (Accessed: 5 June 2026).

International Labour Organization (2025) *Bangladesh: Job creation and economic diversification remains top priority for government, employers and workers in 2025*. Geneva: International Labour Organization. Available at: https://www.ilo.org/dhaka (Accessed: 5 June 2026).

International Monetary Fund (2025) *Bangladesh: Third and fourth reviews under the Extended Credit Facility arrangement and the arrangement under Extended Fund Facility — IMF Country Report No. 2025/150*. Washington, D.C.: International Monetary Fund. Available at: https://www.imf.org/en/Publications/CR (Accessed: 5 June 2026).

International Monetary Fund (2026) *World Economic Outlook, April 2026: Global Economy in the Shadow of War*. Washington, D.C.: International Monetary Fund. Available at: https://doi.org/10.5089/9798229042758.081 (Accessed: 5 June 2026).

National Board of Revenue, Bangladesh (2025) *Tax expenditure policy and management framework*. Dhaka: National Board of Revenue. Available at: https://nbr.gov.bd (Accessed: 5 June 2026).

OECD/ADB (2025) *Revenue statistics in Asia and the Pacific 2025: Bangladesh country note*. Paris/Manila: Organisation for Economic Co-operation and Development / Asian Development Bank. Available at: https://www.oecd.org/en/publications/revenue-statistics-in-asia-and-the-pacific-2025_48c772be-en.html (Accessed: 5 June 2026).

Pesme, J. (2025) 'How can Bangladesh increase domestic revenues for development?', *World Bank Blogs: End Poverty in South Asia*, 10 December. Available at: https://blogs.worldbank.org/en/endpovertyinsouthasia (Accessed: 5 June 2026).

The Global Economy (2026) *China: Policy rate data*. Available at: https://www.theglobaleconomy.com/China/policy_rate/ (Accessed: 5 June 2026).

U.S. Department of State (2025) *2025 Investment climate statement: Bangladesh*. Washington, D.C.: U.S. Department of State. Available at: : Bangladesh - United States Department of State (Accessed: 5 June 2026).

World Bank (2025) Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE): Additional Financing Environmental and Social Commitment Plan (ESCP). Project Document, 8 December. Washington, DC: World Bank. Available at: https://documents.worldbank.org/en/publication/ documents-reports/documentdetail/ 099120825062097124 (Accessed: 6 June 2026).

World Bank (2026a) *Bangladesh development update, April 2026 — Special focus: a business environment that delivers jobs*. Washington, D.C.: World Bank. Available at: https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports (Accessed: 5 June 2026).

World Bank (2026b) *World Bank commodities price data (The Pink Sheet)*. Available at: http://www.worldbank.org/commodities (Accessed: 5 June 2026).

বিজি প্রেস:-২০২৫-২৬-৭৩২২-এ—৪,০০০ বই, ২০২৬। মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।